বিজ্ঞান-বিচিত্রা

(সাধারণ বিজ্ঞান—হাইস্কুল ও হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য)

শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী

এম. এস-সি., বি. টি.

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ ও ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বর্ধমান বিভাগের প্রাক্তন স্কুলপরিদর্শক এবং পশ্চিম বঙ্গের প্রাক্তন সহশিক্ষাঅধিকর্তা

নিউ বুক এজেন্সী

১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক : শ্রীহেমচন্দ্র বিশ্বাস
নিউ বুক এজেন্সী,
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট ও অন্যান্য চিত্র-পরিকল্পনা : গ্রন্থকার
চিত্রশিল্পী : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

২য় মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ১৩৬৬

মুদ্রাকর : শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক
বাণী প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মুখপত্র

শিক্ষার একটি মূল উদ্দেশ্য হইল শিক্ষার্থীকে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো। ইহা একটি জৈবিক প্রয়োজনও বটে। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে শিক্ষার প্রধান উপাদানগুলি পরিবেশে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। পূর্বে এই উপাদানগুলি জল, বায়ু, মাটি, জীবজন্তু, গাছপালা এবং তাহাদের স্বাভাবিক উপজাত বস্তুসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। নানা যুগান্তকর আবিষ্কার এবং তাহার সাহায্যে ক্রমবর্ধমান শিল্পোন্নতির ফলে পরিবেশে নূতন নূতন চমকপ্রদ শিক্ষার উপাদানের আবির্ভাব ঘটিতেছে। পরিবেশের স্বাভাবিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট নিত্যনতুন রূপ সম্বন্ধে যাহারা উদাসীন বা অজ্ঞ তাহাদেব নিকট বহির্জগতের বেশির ভাগই আজ অন্ধকারে। সাধারণ বিজ্ঞান সেই অন্ধকার দূর করিয়া চোখের সামনে এক নতুন জগতের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিবে এবং অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষায়ও নতুন আলোকপাত করিয়া শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিবে। আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষার গুরুতর অসম্পূর্ণতা দূর করিবার জন্যই কিছুকাল যাবৎ সাধারণ বিজ্ঞান আবশ্যিক ভাবে পড়িবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা শুধু সময়োচিত নয়, ইহাকে সময়াতীতই বলা চলে।

এই বিজ্ঞানশিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চাই কুশলী ও দরদী শিক্ষক, বিষয়বস্তুর আনন্দদায়ক পরিবেশন এবং সর্বোপরি শিক্ষার্থীর নবীন বিস্ময় এবং নবীন আকাঙ্ক্ষাময় কৈশোরের জাগ্রত চেতনা। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠের উপাদান পরিবেশনে পাঠ্যপুস্তক এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সাধারণ বিজ্ঞানের নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে বিজ্ঞানের প্রায় সব বিষয়েরই সমাবেশ রহিয়াছে, যেমন বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ধাতুবিদ্যা, জীববিদ্যা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ইত্যাদি। বিজ্ঞান-বিচিত্রাতে বিবিধ বস্তুর এই বিচিত্র সমাবেশ কিশোর মনের উপযোগী করিয়া সহজ ও সরল ভাবে পরিবেশনের চেষ্টা করা হইয়াছে। বিজ্ঞানশিক্ষা সহজ ও আনন্দদায়ক করার জন্য পুস্তকে এই সব প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে :

(১) পুস্তকখানা চিত্রবহুল করিয়া এবং বিষয়বস্তুগুলি ছোট ছোট অধ্যায়ে ভাগ করিয়া উপস্থাপিত করা হইয়াছে যাহাতে ছেলে মেয়েরা সহজেই

তথ্যগুলি আয়ত্ত করিতে পারে। এই স্তরে শিক্ষা তত্ত্বমূলক হইতে পারে না; তথ্য ও ঘটনামূলক হওয়াই বাঞ্ছনীয়; তবে তথ্য ও ঘটনার পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বের দিকে অঙ্গুলী-সঙ্কেতের সুযোগ পাইলেই তাহাও নির্দেশ করা হইয়াছে।

(২) বিজ্ঞানশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে চিন্তাশক্তি ও অভ্যাসের অনুশীলন হয় সেজন্য প্রত্যেক বিষয়ের শেষে রচনাগত ও বিষয়গত প্রশ্ন (Objective Tests) ছাড়া এমন প্রশ্নও দেওয়া হইয়াছে যাহাতে নূতন সমস্যার অবতারণা করা হইয়াছে।

(৩) সাধারণ বিজ্ঞান একটি পরীক্ষামূলক বিষয়। ইহার সূত্র ও ঘটনাবলী অনেক ক্ষেত্রেই পরীক্ষা করিয়া যাচাই করিয়া নিতে হয়। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সহিত আলোচনার মাধ্যমে বিজ্ঞানের সেমিনার পরিচালনার সময় জানিতে পারি যে বর্তমানে অধিকাংশ স্কুলেই সাধারণ বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা নাই; শিক্ষক মহাশয় ক্লাসে কোন কোন বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখান। সেমিনার এই মত প্রকাশ করেন যে সাধারণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থিগণ পরীক্ষা করিবার সুযোগ না পাইলে এ বিষয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে এবং সাধারণ বিজ্ঞান অপ-বিজ্ঞানের স্তরে নামিয়া পড়িবে। কোন কোন স্কুলে যে সাধারণ বিজ্ঞানের ভিন্ন বিজ্ঞানাগার রহিয়াছে তাহা খুবই আনন্দের সহিত লক্ষ্য করা হইয়াছিল।

'সাধারণ বিজ্ঞানের কতকগুলি পরীক্ষা শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় ক্লাসে করিতে পারেন; আর অধিকাংশ ছেলেমেয়েরাই দামী জিনিসপত্র ব্যবহার না করিয়া পরিবেশের সাধারণ জিনিস সংগ্রহ করিয়া তাহার সাহায্যেই নানা পরীক্ষা করিতে পারিবে। পুস্তকে এই শ্রেণীর পরীক্ষা করার জন্য ছেলেমেয়েদিগকে উৎসাহিত করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর পরীক্ষার বহুল প্রচলন দ্বারাই বিজ্ঞানকে গবেষণাগারের সমুচ্চ বেদী হইতে আমাদের গৃহস্থালীতে আনিয়া নিতান্ত ঘরের জিনিস করিয়া নেওয়া যাইবে।

(৪) পরিবেশে আজকাল বিজ্ঞানের বিস্ময়কর প্রয়োগ দেখা যাইতেছে, যেমন রকেট ও আকাশ-যানের ব্যবহার, স্টীল উৎপাদন, জলের স্থৈতিক শক্তি হইতে তড়িৎ-উৎপাদন, পরমাণু হইতে বিদ্যুতের উপাদান সংগ্রহ, মুক্ত

নাইট্রোজেনের বন্ধনের ফলে সার-উৎপাদন। এই বিষয় গুলিকে একটু বিস্তৃত ভাবে চিত্রের সাহায্যে আলোচনা করা হইয়াছে। কেন না ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইহার কতকগুলি বিষয়ের রূপায়ণ এখন আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষামূলক দর্শনীয় বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এজন্য ইহাদের কয়েকটি বিষয় পুস্তকের প্রচ্ছদপটে স্থান পাইয়াছে।

এই পুস্তক পাঠ করিয়া যদি শিক্ষার্থীরা পরিবেশের ঘটনাবলী বুঝিতে সচেষ্ট হয় এবং তাহাদের মধ্যে উন্নত চিন্তাধারা ও সৃজনীশক্তির বিকাশ হয় তবেই আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাইব। এই পুস্তক প্রণয়নে বন্ধুবর ডাঃ. পি. কে. দে মহাশয় (সরকারী কৃষিকলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ) আমাকে প্রাণ-রসায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সাহায্য করিয়া বাধিত করিয়াছেন। পরিশেষে ব্যক্তব্য, পুস্তকের প্রকাশক শ্রীহেমচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টা ব্যতীত এই পুস্তক যথা সময়ে মুদ্রিত হইত কি না সন্দেহ।

সূচীপত্র

নবম শ্রেণী

দশম শ্রেণী

SYLLABUS IN GENERAL SCIENCE

Class–IX

Objective : To provide an elementary scientific classification and interpretation of some every day phenomena

COURSE CONTENTS	DEMONSTRATION AND EXPERIMENTS
A. MECHANICS	
1. What makes work hard ; Weight, friction, inertia.	
2. General notion of gravitation. Newton's Law of attraction. Simple explanation of movement of moon and of artificial Satellites. Simple explanation of tides.	
3. Simple machine to make work easier : inclined plane, pulleys (Simple pulleys).	Demonstration and experiments with inclined plane and pulleys.
B. LIGHT	
1. Light travels in a straight line ; shadows ; eclipses.	Construction of a pinhole camera.
2. Light travels with finite velocity (Simple statement) ; Light from the sun takes 8 mins. to reach us. Light travels faster than sound. Lightning is seen before thunder is heard.	
3. Reflection of light at plane and spherical mirrors ; convex and concave ;	Construction of a periscope. Formation of images by mirrors.

	(Focus and focal length). Real and virtual images (no mathematical formulae)	
4.	Refraction ; convex lens. Focus and focal length (no mathematical formulae).	Experiments on refraction through glass and water. Formation of images by lenses.
5.	The eye as a lens (simple explanation).	Demonstration of principal parts of telescope and of simple and compound microscope. Demonstration of model of an eye.
6.	The Prism, dispersion of colours.	Use of prism to show formation of spectrum.

C. HEAT

1	Main sources of heat ; Sun, mechanical action (friction), chemical reactions (burning of fuels), electricity.	
2.	Effects of heat : Expansion of solids, liquids, gases (examples and applications), land and sea breezes.	Ball and ring experiment. Expansion of different metals, of liquid and gases.
3.	Heat and Temperature ; Thermometers : fixed points and scale ; maximum and minimum thermometer ; clinical thermometer.	
4.	Change of state : Melting, freezing ; evaporation, boiling, condensation ; heat is required for melting and evaporation.	Melting and boiling points of different substances ; preparation of ice by rapid evaporation of ether.

5. How heat travels ; conduction (clothing and body covering), convection (heating and ventilation), Radiation.	Conduction experiments ; convection of liquids and gases.
D. CHEMICAL REACTIONS	
1. Acids, bases and salts (To be treated mainly by examples).	Hydrochloric, sulphuric, nitric and carbonic acids ; caustic potash, caustic soda and barium hydroxide ; common salt.
2. Chemical composition and principal uses of common salt, sodium carbonate, caustic soda, Hydrochloric acid.	
3. Nitrogen Cycle and Nitrogen compounds in agriculture : Fertilisers—Ammouium sulphate and Nitrates : Bacterial action-nodules of leguminous plants : crop-rotation.	
4. Lime and its products ; Chalk ; Lime-burning ; quick lime and slaked lime.	Action of water on quick-lime, action of carbondioxide on lime water.
5. Hard water and soft water—methods of soften ing water.	Use of soaps in differet kinds of water (before and after boiling).
E. LIVING BEINGS	
1. Outline of internal and external structure of toad or frog and of common fish.	Demonstration of principal structure by dissection.

F. THE HUMAN BODY

1. Human blood ; the blood circulation, pumping action of the heart ; arteries ; capillaries ; veins ; feeling of pulse ; red and white corpuscles.	Charts on blood circulation. Demonstration of first-aid in case of bleeding including use of tourniquet.
2. Digestive system of man ; mouth ; teeth ; tongue : gullet ; stomach ; small intestine ; pancreas ; liver. Action of enzymes in aiding digestion.	Charts on digestive system.
3. Food ; source of energy for Man ; our food needs balanced diet (protein, fat, carbohydrate, salt, water, vitamin, roughage).	

Class X

Objective : *Same as in Class IX*

A. SOUND

1. Producation by a vibrating body.	Vibrating tuning fork ; sonometer ; working of sound box of gramophone.
2. Meterial medium necessary for transmission of sound.	Demonstration with vacum pump and bell.
3. Reflection, echoes.	
4. How we hear : the human ear.	Demonstration of model of the car.

B. ELECTRICITY

1. Electric current and voltaic cell : idea of electric potential (compare with waterfall).	Working of simple voltaic cell.

2. Effects of electric current : magnetic, heating, chemical ; Electric bell.	Construction of electro-magnet, assembling an electric bell ; electrolysis.
3. Idea of intensity (like flow of water per unit ime : some thing pushed). Idea of resistance (compare flow of water through pipe ; pipe offers resistance to flow).	
4. Interaction of electricity and magnetism.	Simple experiments to show action of magnet on current and current on magnet.
5. Electromagnetic induction (Faraday).	Experiments on electro-magnetic induction.
6. Daniel Cell, Leclanche Cell and Lead accumulators ; (No explanation of chemical reaction required).	Handling of Daniel cell and Leclanche cell (dry and wet) and lead accumulator.
7. Electricity as energy ; Motors, Heating and lighting ; Electric lamps.	Working models ; handling an electric iron, stove and heater ; study of a fan regulator.
8. Electricity for communication : telegraph, telephone.	Model of telegraph.

C. METALS

1. Study of the natural occurrence and properties and uses of the following metals and alloys : iron, copper, aluminium, zinc, steel, brass, bell-metal. (Details of methods of extraction not required).	

D. LIVING BEINGS Elementary idea about structure and life history of amoeba, spirogyra (algae), yeast and fern.	Demonstration by charts and specimens.
E. GENERAL IDEAS ABOUT : (a) Evolution, (b) Heredity, (c) Adaptation.	Demonstration by charts.
F. COMMON DISEASES AND EPIDEMICS Brief and elementary statement of main symptoms, causes, treatment and prevention in each case. (i) Air-borne diseases : common cold, influenza. (ii) Water-borne diseases : cholera, typhoid, dysentery. (iii) Insect-borne diseases : Malaria, plague. (iv) Diseases by contact : Ring worm, scabies.	Demonstration by charts.

বিজ্ঞান-বিচিত্রা

(নবম শ্রেণী)

বলবিদ্যা (Mechanics)

১

পূর্বপাঠ

বলবিদ্যার আলোচ্য বিষয় স্থিতি ও গতি। এই বিষয় পাঠ করিতে হইলে স্থিতি, গতি, বল ও সংশ্লিষ্ট কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে পূর্বে মোটামুটি ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই সবই প্রথম আলোচনা করা হইবে।

স্থিতি ও গতি (Rest and Motion)—যখন কোন বস্তু একই স্থানে থাকিয়া কোন নির্দিষ্ট বিন্দুর সহিত যে কোন সময়ে অবস্থানের কোন পরিবর্তন করে না তখন বস্তুর ঐ অবস্থাকে **স্থিতি** বলে। যখন বস্তুটি কোন নির্দিষ্ট বিন্দুর সহিত সময়ের সাথে সাথে নিজ অবস্থানের পরিবর্তন করে তখন তাহার ঐ অবস্থাকে **গতি** বলা হয়। তুমি ঘরে বসিয়া আছ। তোমার নিকট তোমাদের বাড়ি, গাছপালা ও গাছের নীচে বসা একটি লোক স্থির। আর একটি লোক যদি রাস্তা দিয়া যাইতে থাকে তবে তোমার সঙ্গে তুলনায় তাহার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিতেছে। এজন্য তাহার গতি রহিয়াছে এবং তাহাকে গতিশীল বলিব।

দ্রুতি (Speed)—গতিশীল বস্তুর যে-হারে অবস্থানের পরিবর্তন হয় তাহাকে **দ্রুতি** বলে। একক সময়ে (এক সেকেণ্ডে) যতটা পথ অতিক্রম করা হয় তাহা হইল দ্রুতির মাপ।

বেগ (Velocity)—কোন নির্দিষ্ট দিকে গতিশীল বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের হারকে **বেগ** বলে। একক সময়ে (এক সেকেণ্ডে) একটি গতিশীল বস্তু কোন নির্দিষ্ট দিকে যতটা পথ অতিক্রম করে তাহাই হইল বেগের মাপ। কোন নির্দিষ্ট অভিমুখে দ্রুতির নামই হইল বেগ। বেগ নির্দেশের জন্য তাহার পরিমাণ ও অভিমুখ উভয়ই বিবেচ্য। মনে কর, একটি ট্রেন এক স্টেশন হইতে একই অভিমুখে অন্য স্টেশনে যাইতেছে, কিন্তু যেহেতু তাহার বেগের পরিমাণ স্টেশন হইতে ছাড়িবার পর বৃদ্ধি পাইয়াছে সেজন্য

রাস্তার প্রথম দিকে তাহার বেগ **অসম (Variable)**। রাস্তার মধ্যভাগে যদি ট্রেনটি প্রতি একক সময়ে একই পথ অতিক্রম করে তবে তাহার সেই বেগকে **সম (Uniform)** বলা যায়। বেগ সাধারণতঃ v অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

ত্বরণ (Acceleration)—ক্রমবর্ধমান বেগের পরিবর্তনের হারকে **ত্বরণ** বলে। বেগের স্থায় ত্বরণেরও পরিমাণ ও অভিমুখ আছে। সমবেগের কোন ত্বরণ নাই। বেগের স্থায় ত্বরণও সম বা অসম হইতে পারে।

মনে কর স্টেশন হইতে ছাড়িবার পর ৩৩ সেকেণ্ডে একটি ট্রেনের বেগ বাড়িয়া ঘণ্টায় ৩০ মাইল হইয়াছে।

ট্রেনের বেগ ঘণ্টায় ৩০ মাইল হইলে প্রতি সেকেণ্ডে $\frac{৩০ \times ৫২৮০}{৬০ \times ৬০}$ ফুট $=$ ৪৪ ফুট। গাড়ি যখন স্টেশনে ছিল তখন তাহার বেগ ছিল ০ ফুট। ৩৩ সেকেণ্ডে বেগ ০ ফুট হইতে বাড়িয়া প্রতি সেকেণ্ডে ৪৪ ফুট হইল।

কাজেই ত্বরণ $=$ বেগের পরিবর্তনের হার $= \frac{\text{৪৪ফুট/সেকেণ্ড}}{\text{৩৩ সেকেণ্ড}} = \frac{৪}{৩}$ ফুট/সেকেণ্ড/সেকেণ্ড।

ত্বরণ সাধারণতঃ f অক্ষর দ্বারা প্রকাশিত হয়।

নিউটনের গতিসূত্র (Newton's Laws of Motion)—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বৃটিশ বৈজ্ঞানিক স্যার আইজ্যাক নিউটন গতিবিদ্যার তিনটি মূল্যবান সূত্র বাহির করেন। এগুলি হইতে বস্তু, গতি ও বলের সম্পর্ক সম্বন্ধে নির্দেশ পাওয়া যায়। এজন্য এই সূত্রগুলি গতিবিদ্যার ভিত্তি স্বরূপ।

প্রথম গতিসূত্র (First Law of Motion)—তোমরা জান কোন বস্তু আপনা হইতে নড়াচড়া বা এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাইতে পারে না। খেলার মাঠে ফুটবল রহিয়াছে। কোনও কারণে খেলা আরম্ভ হইতে দেরি হইতেছে। বল পড়িয়াই আছে। আবার খেলা আরম্ভ হইলে লাথির চোটে বল ছুটিয়া বা গড়াইয়া চলিবে, যতক্ষণ না একজন খেলোয়াড় উহাকে পা দিয়া আটকাইবে বা উহার গতিপথ ঘুরাইয়া দিবে। বস্তুর এই যে একই অবস্থায় থাকার প্রবণতা অর্থাৎ অন্যে না সরাইলে অচল অবস্থায়ই থাকা, আর অন্যে না থামাইলে চলিতেই থাকা ইহাকে **জাড্য বা জড়তা (Inertia)** বলে। **বাহির হইতে কোন প্রযুক্ত বল দ্বারা অবস্থার পরিবর্তন**

ঘটাইতে বাধ্য না করিলে, অচল বস্তু চিরকাল অচল অবস্থায়ই থাকিবে এবং স্থির বেগে সচল বস্তু চিরকাল সম বেগে একই সরল রেখায় চলিতে থাকিবে, ইহাই হইল প্রথম গতিসূত্র।

বল (Force)—নিউটনের এই সূত্র হইতে বলের এইরূপ সংজ্ঞা পাওয়া যায়: বাহির হইতে যাহা প্রয়োগ করিয়া বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন করা হয় বা করিবার চেষ্টা করা হয় তাহাকে **বল** বলে। দৈনন্দিন জীবনে আমরা বলের অসংখ্য উদাহরণ পাই।

দ্বিতীয় গতিসূত্র (Second Law of Motion)—**কোন বস্তুর ভরবেগের (Momentum) পরিবর্তনের হার উহার উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যে দিকে ক্রিয়া করে ভরবেগের পরিবর্তন সেই দিকে ঘটে।**

ভরবেগ কথাটি এখানে নূতন। ইহা হইল বস্তুর ভর (mass) m ও বস্তুর বেগ v-এর গুণফল। কোনও বস্তুর **ভর** বলিলে উহার মধ্যে মোট যে পরিমাণ **পদার্থ** (matter) আছে তাহাই বুঝায়। আমরা পদার্থ ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব করিতে পারি, ইহার আয়তন আছে অর্থাৎ পদার্থ স্থান অধিকার করিয়া থাকে। আর পদার্থ থাকার জন্যই যখন বস্তুর ভর তখন পদার্থের তো ভর থাকিবেই।

এখন ভরবেগ কথাটির অর্থ কি দেখা যাউক। তুমি দেওয়ালে একটি পেরেক মারিবে। সেইজন্য দরকার একটি ভারি হাতুড়ি বা ইটের। আর সেইটা দিয়া জোরে পেরেকের মাথায় ঘা দিতে হইবে। জোরে ঘা দিলে বেগ v-এর পরিমাণ বেশি হইবে, ফলে mv-এর পরিমাণ পেরেক বসাইবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। একটা হাল্কা বস্তু দিয়া বেশি জোরে ঘা দিলেও পেরেক বসিবে না; কারণ ভর m খুব কম বলিয়া mv-এর পরিমাণ যথেষ্ট হইবে না। ধাক্কা বা ঘা দিয়া ফল পাইতে হইলে ভরবেগ mv-এর পরিমাণ যথেষ্ট হওয়া দরকার।

যদি কোন বলপ্রয়োগের ফলে ২০ পাউণ্ড ভরের বস্তুতে প্রতি সেকেণ্ডে ১ ফুট বেগ উৎপন্ন হয়, তবে ঐ বস্তুর ভরবেগ হইল ২০ পাউণ্ড-ফুট-সেকেণ্ড। এবার ভরবেগের পরিমাণ দ্বিগুণ করিতে হইলে নিউটনের সূত্রমতে প্রযুক্ত বলের পরিমাণও দ্বিগুণ করিতে হইবে। ঐ বস্তুকে তিনগুণ ভরবেগ-সম্পন্ন করিতে হইলে বলের পরিমাণও তিনগুণ করিতে হইবে।

মনে কর কোন বস্তুর ভরবেগ mv এবং তাহার উপর P বল প্রযুক্ত হইয়াছে। mv-এর পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বল P-র সমানুপাতিক। কাজেই $P \propto mv$র পরিবর্তনের হার। বস্তুর m অপরিবর্তিত।

সুতরাং $P \propto m \times v$র পরিবর্তনের হার।

v-র পরিবর্তনের হার হইল ত্বরণ f

সুতরাং $P \propto mf$

অথবা $P = kmf$ [এখানে k একটি ধ্রুবক (constant)]

এই ধ্রুবকের মান বলের এককের উপর নির্ভর করে। একক ভরের উপর প্রযুক্ত হইয়া যে বল একক ত্বরণ সৃষ্টি করে, তাহাকে যদি বলের একক ধরিয়া নেই তবে উপরের সমীকরণে

$P = 1, m = 1, f = 1$

এক্ষেত্রে $k = 1$

এবং $P = mf$

নিউটনের প্রথম সূত্র হইতে আমরা বলের সংজ্ঞা পাই। দ্বিতীয় সূত্র হইতে বলের পরিমাপ ও বলের সঙ্গে ত্বরণের সম্বন্ধ পাওয়া গেল।

তৃতীয় গতিসূত্র (Third Law of Motion)—প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে। একটি বস্তু অন্য একটি বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করিলে উপরিউক্ত সূত্র অনুসারে দ্বিতীয় বস্তুও প্রথম বস্তুটির উপর বিপরীত বল প্রয়োগ করিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তুমি কি ভাবে হাঁট দেখা যাউক। তুমি পা দিয়া ভূমিকে পিছনের দিকে ঠেলিয়া দাও; আর ভূমি এই সূত্রমতে সামনের দিকে তোমাকে ঠেলিয়া দেয়। এই পরবর্তী বাহিরের প্রযুক্ত বলই তোমাকে চালাইয়া থাকে। আর একটি দৃষ্টান্ত: দুইটি নৌকা জলের উপর পাশাপাশি রহিয়াছে। এক নৌকার আরোহী অপর নৌকায় ধাক্কা দিলে উহা সরিয়া যাইবে; কিন্তু এই দ্বিতীয় নৌকাটির প্রতিক্রিয়া বা উল্টা ধাক্কার ফলে প্রথম নৌকাটিও উল্টাদিকে সরিয়া যাইবে। নৌকা দুইটির ভর যদি m_1 ও m_2 হয় এবং তাহাদের বেগ যদি যথাক্রমে v_1 ও v_2 হয় তবে $m_1v_1 = m_2v_2$। প্রথম নৌকাটি যদি দ্বিতীয় নৌকাটি হইতে তিনগুণ ভারি হয়, তবে দ্বিতীয় নৌকার বেগের পরিমাণ প্রথম নৌকার বেগের তিনগুণ হইবে।

২

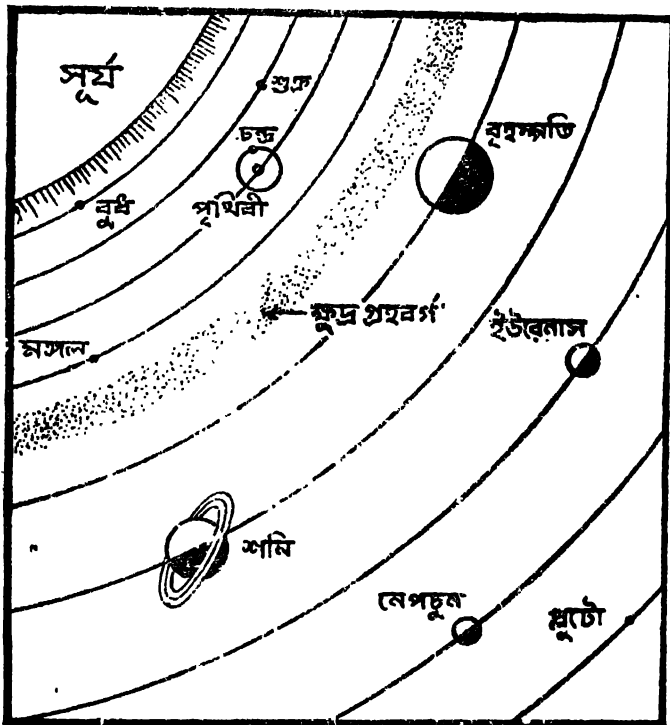
মহাকর্ষ (Gravitation)

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পৃথিবী, সূর্য ও গ্রহাদির ঘূর্ণন ব্যাপারে আলেকজান্দ্রিয়াবাসী গ্রীক জ্যোতির্বিদ টলেমির মতে বিশ্বাসী ছিলেন। টলেমি ছিলেন দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক। তাঁহার মতে আপাতত যেরূপ দেখা যায়, সূর্য ও গ্রহাদি পৃথিবীর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে। প্রায় তের শত বৎসর পরে কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) নামক এক পোল্যাণ্ডবাসী জ্যোতির্বিদ পর্যবেক্ষণ ও গণনার সাহায্যে টলেমির মতবাদ ভুল বলিয়া প্রমাণ করেন। তিনি তাঁহার দৃঢ় মত প্রচার করিলেন যে, পৃথিবী এবং গ্রহগণই সূর্যের চারিদিক প্রদক্ষিণ করে। তাঁহার পর কেপলার নামক একজন জার্মান জ্যোতির্বিদ বহু গবেষণার পর সূর্যের চারিদিকে গ্রহগণের পথ সঠিক ভাবে স্থির করেন। সে যুগে প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে ভিন্ন মত প্রচার করা খুবই সাহসিকতার পরিচায়ক ছিল। বর্তমান কাল পর্যন্ত আমরা কোপর্নিকাসের মতেই বিশ্বাসী। তাঁহার সময় হইতেই নব বিজ্ঞানের যুগ আরম্ভ হয়।

গ্রহাদির সূর্যের চারিদিকে নিয়মিত ভাবে প্রদক্ষিণ করার ব্যাপার হইতে মনে হয় তাহাদের মধ্যে এক যোগসূত্র রহিয়াছে এবং এক নির্দিষ্ট নিয়মের বশেই তাহারা অনন্ত কাল যাবত নিজেদের মধ্যে একই দূরত্ব বজায় রাখিয়া নিজ নিজ পথে পরিক্রমা করিয়া আসিতেছে। এরূপ সুনিয়ন্ত্রিত গতির কারণ কি বুঝিতে হইলে সৌরজগৎ ও সৌরজগতের বাহিরে বিস্তৃত যে অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার।

সৌরজগৎ—সূর্যের চারিদিকে কি কি গ্রহ ঘুরিতেছে ছবিতে লক্ষ্য কর। সূর্যের সব চেয়ে কাছের গ্রহ হইল **বুধ**, তাহার পর **শুক্র**, তাহার পর **পৃথিবী**, তাহার পর **মঙ্গল**, মঙ্গলের পর অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ বা **ক্ষুদ্র গ্রহবর্গ**, ইহাদের পর **বৃহস্পতি**। বৃহস্পতি হইতে পর পর আরও চারিটি গ্রহ রহিয়াছে—**শনি, ইউরেনাস, নেপচুন** ও **প্লটো**। ছবিতে সূর্য ও গ্রহগুলির আকার এবং তাহারা পর পর যেমন থাকে দেখান হইয়াছে;

কিন্তু পৃথিবীর পরে ইহাদের মধ্যে দূরত্ব এত বেশি যে, তাহা আর ছবিতে ঠিক মত দেখান যাইতে পারে নাই। গ্রহদের মধ্যে আয়তনে বুধ সবচেয়ে ছোট, আর বৃহস্পতি সব চেয়ে বড়। সূর্য আয়তনে বৃহস্পতির চেয়েও এক হাজার গুণ বড়। সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরিতে বুধের লাগে ৮৮ দিন, শুক্রের সাড়ে সাত মাস, পৃথিবীর এক বৎসর, মঙ্গলের ৬৮৭ দিন, বৃহস্পতির প্রায় ১২ বৎসর ও শনির ৩০ বৎসর। পরবর্তী গ্রহদের ঘুরিবার সময় বাড়িতে বাড়িতে প্লুটোর বেলায় হইয়াছে ২৪৮ বৎসর।



১নং চিত্র—সৌরজগৎ

সূর্য হইতে গ্রহদিগের দূরত্ব কত জানিবার উৎসুক্য থাকিলে জ্যোতিবিদ্যার (Astronomy) ভাল বই হইতে জানিতে পারিবে। সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। পর পর গ্রহদের দূরত্ব বাড়িয়া প্লুটোর বেলায় হইয়াছে তাহা ৩৬৭ কোটি মাইল।

কতকগুলি গ্রহের আবার উপগ্রহ রহিয়াছে; তাহারা নিজ নিজ গ্রহের চারিদিকে ঘুরিতেছে। আমাদের পৃথিবীর একটি উপগ্রহ আছে, সেটি হইল চন্দ্র। মঙ্গলের দুইটি, বৃহস্পতির বারটি, শনির নয়টি, ইউরেনাসের পাঁচটি ও নেপচুনের দুইটি উপগ্রহ আছে। এই সব গ্রহ ও উপগ্রহ লইয়া সূর্যের পরিবার বা সংসার। ইহাকে **সৌরজগৎ** বলে। এসব ছাড়া সৌরজগতে **ধূমকেতু** ও **উল্কা** রহিয়াছে। ইহারাও সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ধূমকেতু গ্যাসীয় পদার্থে গঠিত; দেখিলে মনে হয় যেন মাথা ও লম্বা লেজ রহিয়াছে। খালি চোখে খুব কম ধূমকেতুই দেখা যায়। উল্কাগুলি ক্ষুদ্র দানার মত হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় আকারেরও হইয়া থাকে। উল্কা বায়ুমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করিলে ঘর্ষণে উত্তপ্ত হইয়া পুড়িয়া নীচে পড়িয়া যায়, তখন রাত্রির অন্ধকারে আকাশে হাউই বাজির ফুলকির মত দেখায়।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড (Universe)—গ্রহ-উপগ্রহ ছাড়া আকাশে যে অগণিত জ্যোতিষ্ক রহিয়াছে তাহারা নক্ষত্র। সূর্যের নিজস্ব আলো আছে; গ্রহদের তাহা নাই, সূর্যের ধারকরা আলোতেই তাহারা উজ্জ্বল। নক্ষত্রগুলিও সূর্যের মত নিজেরাই আলো দেয়। নক্ষত্রগুলি মিটমিট করিয়া আলো দেয়, কিন্তু গ্রহদের আলো স্থির। সূর্যও একটি নক্ষত্র, আর পৃথিবী হইতে সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র হইল এই সূর্য। তোমরা বলিবে, একি কথা, যে-সূর্য পৃথিবী হইতে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে সেই সব কাছের? ঠিক তাই। অন্য নক্ষত্রদের দূরত্বের কথা শুনিলে তোমরা স্তম্ভিত হইয়া যাইবে। ইহাদের দূরত্ব লক্ষ কোটিতে থাই পাইবে না। সে সব প্রকাশ করিবার জন্য একটা নূতন মাপক ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা হইল **আলোক-বৎসর**।

আলোকের বেগ হইল সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার তিনশত ছাব্বিশ মাইল। এক জায়গায় একটি আলো জ্বলিল, এক সেকেণ্ডের মধ্যেই আলো গিয়া পৌঁছিবে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার তিন শত ছাব্বিশ মাইল দূরে। যদি বলি একটা জিনিস এক আলোক-সেকেণ্ড দূরে আছে তবে আমরা বুঝিব যে, জিনিসটা আমাদের নিকট হইতে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার তিন শত ছাব্বিশ মাইল দূরে রহিয়াছে। চাঁদ পৃথিবী হইতে দুই লক্ষ উনচল্লিশ হাজার মাইল দূরে। আলোর বেগে চলিলে চাঁদে পৌঁছিতে প্রায় দেড় সেকেণ্ড লাগিবে।

সেজন্য বলা যায় চাঁদ পৃথিবী হইতে দেড় আলোক-সেকেণ্ড দূরে রহিয়াছে। তেমনি সূর্যের দূরত্ব হইল আট আলোক-মিনিট।

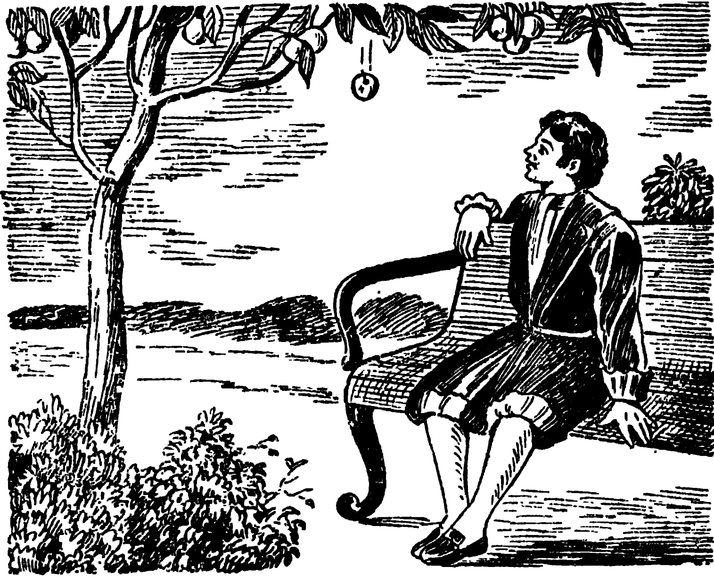
এবার কয়েকটি নক্ষত্রের দূরত্ব মাপা যাউক। সূর্যের পরে আমাদের সব চেয়ে কাছে যে নক্ষত্রটি রহিয়াছে তাহার দূরত্ব হইল সাড়েচার আলোক-বৎসর। সাড়েচার বৎসর আগে যে-আলো ঐ নক্ষত্র হইতে বাহির হইয়া ছিল আজ তাহা আমাদের চোখে আসিয়া পড়িল, আমরা নক্ষত্রটিকে দেখিলাম। আকাশে উত্তর দিকে একই জায়গায় যে ধ্রুবনক্ষত্র দেখা যায় সেটি আমাদের নিকট হইতে প্রায় সাতচল্লিশ আলোক-বৎসর দূরে। ধ্রুব-নক্ষত্রের পর এমন সব নক্ষত্র রহিয়াছে যাহাদের দূরত্ব হাজার, লক্ষ ও কোটি-কোটি আলোক-বৎসর।

আবার দেখা যায়, আকাশের কোন কোন জায়গা যেন আলোতে লেপিয়া গিয়াছে, দেখিতে তুষারপুঞ্জের মত। এজন্য ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে নীহারিকা। এক একটা নীহারিকাতে বহু কোটি নক্ষত্র রহিয়াছে। আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কত যে নীহারিকা আছে তাহারও ঠিক নাই! আমাদের সূর্য এই রকমের একটা নীহারিকার মধ্যে আছে। কিন্তু সূর্য এক জায়গায় স্থির নহে, প্রচণ্ড বেগে ছুটিতেছে। আমাদের পৃথিবী, চন্দ্র, অন্যান্য গ্রহ, তাহাদের চাঁদ, এই সকলকে নিয়া সূর্য সেকেণ্ডে বার মাইল বেগে চক্কর দিতেছে; আর একটা চক্কর দিতে লাগে বহু কোটি বৎসর। কি বিশাল এই ব্রহ্মাণ্ড! ইহার কোন কূল-কিনারাও নাই; অথচ ইহার অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র নিজ নিজ পথে সুনির্দিষ্ট প্রণালীতে চলিয়াই যাইতেছে।

মহাকর্ষ—কোপার্নিকাসের সময়ও গ্রহগণ কেন সূর্যের চারিদিকে এবং চন্দ্র কেন পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে এই প্রশ্নের উত্তর কেহই দিতে পারেন নাই। ইহার উত্তর মিলিল সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক নিউটনের নিকট হইতে, যখন তাঁহার বয়স মাত্র ২৪ বৎসর। কোন জিনিস উপরে ছুড়িলে নীচে নামিয়া আসে। ইহা এবং আরও বহু দৃষ্টান্ত হইতে নিউটন পূর্বেই জানিতেন যে, পৃথিবীর একটা আকর্ষণ বল আছে, যাহাকে পরে **অভিকর্ষ** (Gravity) নাম দেওয়া হয়।

শোনা যায়, একদিন তিনি তাঁহার বাড়ীর বাগানে বসিয়া কিসের বল চন্দ্রকে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরাইয়া থাকে তাহা ভাবিতে ছিলেন। এমন সময় গাছ হইতে একটা আপেল মাটিতে পড়িল। তখনই তিনি মনে মনে

ভাবিতে লাগিলেন, "পৃথিবীর যে-আকর্ষণবলদ্বারা এই আপেলটি মাটির দিকে আকৃষ্ট হইল সেই আকর্ষণ বল তো চন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া সর্বক্ষণ চন্দ্রের উপর ক্রিয়া করিতে পারে এবং চন্দ্রকে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে বাধ্য করিতে পারে"। এরূপ যুক্তি ও গবেষণামূলক গণনার সাহায্যে তিনি পরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, পৃথিবী ও পার্থিব পদার্থের মধ্যে যে আকর্ষণ দেখা যায় তাহা কেবল ইহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই বিশ্বের

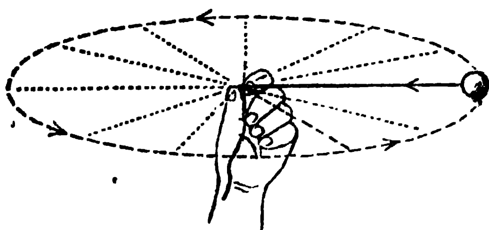


২নং চিত্র—নিউটন ও আপেলের পতন

যে-কোন দুইটি বস্তুর ভিতরেও ইহা আছে। সেই সর্বব্যাপী আকর্ষণের নাম দিলেন **মহাকর্ষ**। সুতরাং অভিকর্ষ মহাকর্ষেরই স্থানীয় অর্থাৎ পৃথিবীর উপরকার একটি রূপমাত্র।

পরীক্ষা—গতিশীল পদার্থকে বৃত্তাকার পথে ঘুরাইতে হইলে উহার উপর বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে যে বল প্রয়োগ করিতে হয় তাহা একটি পরীক্ষা-দ্বারা দেখানো হইবে। একটি ছোট ভারি বল সুতা দিয়া বাঁধিয়া আঙুল দিয়া বৃত্তাকার পথে জোরে ঘুরাও। বলটিকে বৃত্তাকার পথে রাখিতে হইলে উহার উপর সর্বদা বল প্রয়োগ করিতে হইবে, ফলে বলের উপর কেন্দ্রের দিকে যে টান পড়িবে তাহার নাম **অভিকেন্দ্র বল (Centripetal Force)**। নিউটনের

তৃতীয় গতিসূত্রমতে ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে এবং এই দুই বলের মান সমান। কাজেই অভিকেন্দ্র বল যে প্রয়োগ করে তাহার উপর বিপরীত দিকে **অপকেন্দ্র বল** (Centrifugal Force) প্রযুক্ত হয়। এই অপকেন্দ্র



৩নং চিত্র—সুতায় ধরিয়া বল ঘুরানো

বলের জন্যই আঙ্গুলের উপর টান পড়ে এবং ইহা সুতাটিকেও টান করিয়া রাখে। যখনই সুতা ছিড়িয়া যায় অর্থাৎ অভিকেন্দ্র বল কার্য করে না, তখন বলটি আর বৃত্তাকার পথে না ঘুরিয়া বৃত্তের স্পর্শক বরাবর ছুটিয়া যায়। নিউটনের প্রথম গতিসূত্রমতে বাহ্যিক বল দ্বারা অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে বাধ্য না হওয়ায় সচল বলটি সরল রেখায় ধাবিত হইবে। গ্রহগণের উপর সূর্যের আকর্ষণ বল অভিকেন্দ্র বলের ন্যায় ক্রিয়া করে। গ্রহের চতুর্দিকে উপগ্রহগুলির প্রদক্ষিণের কারণ একই। উপগ্রহগুলি নিজ নিজ গ্রহের নিকটবর্তী বলিয়া গ্রহ ও উপগ্রহগুলির মধ্যে প্রচণ্ড মহাকর্ষীয় বল ক্রিয়া করে, ফলে উপগ্রহগুলি গ্রহের চতুর্দিকে ঘুরিয়া থাকে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, সূর্যের চতুর্দিকে গ্রহের এবং গ্রহের চতুর্দিকে উপগ্রহের প্রদক্ষিণের পথ সম্পূর্ণ বৃত্তাকার নহে, ঈষৎ লম্বাটে, যাহাকে বলে উপবৃত্তাকার (elliptical)। পৃথিবীর চারিদিকে চন্দ্রের আবর্তনের কারণ বুঝিতে পারিলে। পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব ২,৩৯,০০০ মাইল। ইহার ভর পৃথিবীর ভরের একাশি ভাগের এক ভাগ, ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের চারিভাগের এক ভাগ। ২৭·৩ দিনে চন্দ্র পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে।

নিউটন মহাকর্ষের ক্রিয়াকে একটি সূত্রের (Law) আকারে প্রকাশ করিলেন। সূত্রটি এই :

এই বিশ্বের যে-কোন দুইটি বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণের মান বস্তু দুইটির ভরের গুণফলের

সমানুপাতিক এবং ইহাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত-অনুপাতিক (inversely proportional)। ইহাই নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র। যদি দুইটি বস্তুর ভর m_1 ও m_2 হয় এবং তাহাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব d হয় এবং F যদি পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ বল হয় তবে

$F = G\frac{m_1 m_2}{d_2}$. এখানে G একটি ধ্রুবক। এই সূত্র হইতে আমরা বুঝিতে পারি বস্তু দুইটির মধ্যের দূরত্ব ঠিক রাখিয়া উহাদের প্রত্যেকের ভর দ্বিগুণ করিলে আকর্ষণের মান চার গুণ বাড়িয়া যাইবে; প্রত্যেকের ভর তিন গুণ করিলে আকর্ষণের মান নয় গুণ বাড়িবে। আবার ভর ঠিক রাখিয়া দূরত্ব দ্বিগুণ করিলে আকর্ষণের মান চারি ভাগের এক ভাগ হইবে। দূরত্ব তিন গুণ করিলে আকর্ষণের মান নয় ভাগের এক ভাগ হইয়া যাইবে।

মহাকর্ষ বস্তু মাত্রেরই একটি সাধারণ ধর্ম। ইহার ফলে একটি তারা অপর একটি তারাকে আকর্ষণ করে। ইহার জন্য সূর্য ও গ্রহের মধ্যে, গ্রহ ও উপগ্রহের মধ্যে আকর্ষণ রহিয়াছে, যাহার ফলে গ্রহ ও উপগ্রহগুলি কক্ষ হইতে ছুটিয়া চলিয়া যাইতে পারে না। ইহারই ফলে পৃথিবীর সঙ্গে মানুষ, পশুপক্ষী, ইট-পাথর, জল প্রভৃতি আটকা থাকে, ছুটিয়া অন্য দিকে চলিয়া যায় না; আর কোন বস্তু উপরে ছুড়িয়া মারিলে তাহাও আবার পৃথিবীতেই ফিরিয়া আসে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পর্যন্ত মহাকর্ষকে একটা বিশেষ রকমের বল বলিয়া মনে করা হইয়াছে। তাহার পর জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন মহাকর্ষের নূতন ব্যাখ্যা দিলেন। তাহার মতে মহাকর্ষ বস্তুর কোনও বল নয়, ইহা দেশকাল-পরিব্যাপ্তির ধর্মবিশেষ। উচ্চস্তরের বিজ্ঞান পড়ার সময় তোমরা বিষয়টি বুঝিতে পারিবে।

অভিকর্ষ (Gravity) ও অভিকর্ষজ ত্বরণ (Acceleration due to Gravity)—পার্থিব বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণকে অভিকর্ষ বলে। ইহা এক প্রকার বল। সুতরাং পৃথিবী যে-বস্তুকে আকর্ষণ করিবে তাহারই ত্বরণ হইবে। কোন বস্তুকে উচ্চস্থান হইতে ছাড়িয়া দিলে অভিকর্ষের জন্য উহা নীচে নামিতে থাকে এবং ইহা যতই নীচের দিকে যাইতে থাকে ততই ইহার বেগ বাড়িতে থাকে। অভিকর্ষের জন্য বেগের পরিবর্তনের হারকে **অভিকর্ষজ ত্বরণ বলে।** ইহা g অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়। কোন

বস্তুর উপর অভিকর্ষের ক্রিয়া বাহির করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুসারে পৃথিবীর সমস্ত ভর ইহার কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়া ধরা হয়।

মনে কর একটি বস্তুর উপর অভিকর্ষ বল F প্রযুক্ত হইতেছে, বস্তুটির ভর m, পৃথিবীর ভর M এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে বস্তুটির দূরত্ব d;

পৃথিবীর ব্যাসার্ধ R ৪০০০ মাইল ধরিয়া নিলে

$$F = G\frac{Mm}{(R+d)^2}$$

যেহেতু R এর তুলনায় d খুব সামান্য,

কাজেই $F = G\dfrac{Mm}{R^2}$ ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে।

নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র হইতে আমরা জানি

বল = ভর × ত্বরণ

সুতরাং অভিকর্ষজ ত্বরণ = $\dfrac{\text{অভিকর্ষ বল}}{\text{ভর}}$

অথবা $g = G\dfrac{M}{R^2}$

পৃথিবীর ভর M এবং G উভয়ই ধ্রুবক (constant)। কাজেই অভিকর্ষজ ত্বরণ পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে বস্তুটির দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত-অনুপাতিক হইবে। পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে বস্তুটির দূরত্ব যত বাড়িবে, উহার উপর অভিকর্ষজ ত্বরণ তত কম হইবে, কিন্তু পৃথিবীর ভিতরে কোন বস্তু কেন্দ্রের দিকে গেলে এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না। পৃথিবী ভেদ করিয়া কোন বস্তু যতই কেন্দ্রের দিকে যাইবে, অভিকর্ষজ ত্বরণ ততই কমিবে এবং পরিশেষে পৃথিবীর কেন্দ্রে ঐ ত্বরণ শূন্য হইবে। কাজেই কোন জিনিস পৃথিবীর কেন্দ্রে থাকিলে তাহার ওজন কিছুই হইবে না।

পূর্বের সমীকরণ হইতে দেখা যায় যে, কোনও স্থানে যে-কোন পতনশীল বস্তুর উপর অভিকর্ষজ ত্বরণ এক। পশ্চিম বাংলায় ইহা ৩২·১ ফুট/সেকেণ্ড/সেকেণ্ড অথবা ৯৭৮·৪ সেণ্টিমিটার/সেকেণ্ড/সেকেণ্ড।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অ্যারিস্টটল এই মত প্রকাশ করেন যে, বিভিন্ন বস্তু যে পরিমাণে ভারি তাহারা সেই পরিমাণ দ্রুততার সহিত ভূমিতে পতিত হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী 'বিভিন্ন

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ বিনা দ্বিধায় ইহা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিলেন। সে যুগে কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্য হাতে-কলমে পরীক্ষা করিয়া যাচাই করিয়া নেওয়ার রীতি প্রায় প্রচলিতই ছিলনা।

কোপার্নিকাস ও কেপলারের পরে ইউরোপে যে সব বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হয় তাহাদের মধ্যে ইটালী দেশীয় বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২) এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে তিনি ঐ দেশের পিজা নামক স্থানে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি অ্যারিস্টটলের মতে সন্দিহান হইয়া পিজাস্থিত প্রসিদ্ধ হেলানো মিনার হইতে বিভিন্ন ওজনের ভারি বল এক সঙ্গে নীচে ফেলিয়া দেখাইলেন যে, সবগুলি বলই একই সময়ে মাটিতে পড়ে অর্থাৎ **পতনশীল সব বস্তুর উপরই অভিকর্ষজ ত্বরণ এক**। অ্যারিস্টটলের মত ভুল প্রতিপন্ন হইল; বৈজ্ঞানিকদের গণ্ডীর মধ্যে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের জয়-জয়কার ঘোষিত হইল। সেই যুগে প্রচলিত ধর্মীয়, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মতের বিরুদ্ধে মত পোষণ করা ধর্মযাজকদের মতে গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। গ্যালিলিও কোপার্নিকাসের মতবাদ অর্থাৎ পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ যে সূর্যের চারিদিকে ঘুরে এই মত দুঃসাহসের সঙ্গে প্রচার করিতে থাকেন এবং সর্বপ্রথম টেলিস্কোপ তৈয়ারি করিয়া বৃহস্পতির উপগ্রহসমূহ আবিষ্কার করেন। এইসব নূতন নূতন মতবাদ ও আবিষ্কারের জন্য দেশের যাজক-সম্প্রদায় তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিয়া তাঁহাকে 'বিজ্ঞান-বিরোধী' মত পোষণের জন্য বিচারালয়ে অভিযুক্ত করিলেন। বহু নির্যাতনের পর বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পরবর্তী যুগে তিনি পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের জনক বলিয়া সম্মান লাভ করেন।

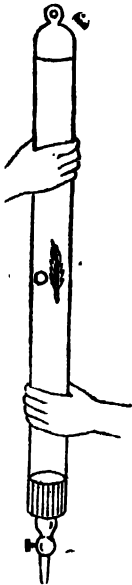


৪নং চিত্র—গ্যালিলিও—
পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের জনক

মুদ্রা ও পালক পরীক্ষা—গ্যালিলিও পরীক্ষা করিয়াছিলেন

সুউচ্চ মিনার হইতে। তোমরাও তিন-চার তলা বাড়ির ছাদ হইতে এরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। গ্যালিলিওর পর বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্র (পাম্প) আবিষ্কৃত হওয়ায় বৈজ্ঞানিক নিউটন গিনি ও পালক নিয়া পরীক্ষা করিয়া গ্যালিলিওর সূত্র নিখুঁত ভাবে বিজ্ঞানাগারের ভিতরেই প্রমাণ করেন।

পরীক্ষা—প্রায় ৪০ ইঞ্চি লম্বা একটি মোটা কাচের নলের একদিক প্যাঁচকাটা ধাতব ঢাকনা দিয়া বন্ধ করা যায়। ইহার অপর দিকে সংলগ্ন নলটির মুখ চাবি ঘুরাইয়া বন্ধ করা হয়। উপরের মুখ খুলিয়া একটি ৫০ পয়সার মুদ্রা ও একটি হালকা ছোট পালক নলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া ঐ মুখ বন্ধ কর। অপর দিক রবারের নল দিয়া একটি বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্রের সহিত যুক্ত কর। পাম্পের সাহায্যে নলের ভিতর হইতে সমস্ত বায়ু বাহির করিয়া চাবিটি বন্ধ করিয়া দাও। এইবার নলটি হঠাৎ উল্টাইয়া ধরিলে দেখা যাইবে যে, মুদ্রা ও পালক একই সময়ে নলের অপর প্রান্ত স্পর্শ করিতেছে। এই ভাবে নল বারে বারে উল্টাইয়া একই রূপ ফল পাওয়া যাইবে। তাহার পর নলের ভিতর বায়ু প্রবেশ করাইয়া দিয়া নলটি উল্টাইলে দেখা যাইবে যে, মুদ্রাটি আগে এবং পালকটি পরে নীচের দিকে নামিয়া আসে। বায়ুর বাধার জন্যই এরূপ হয়।



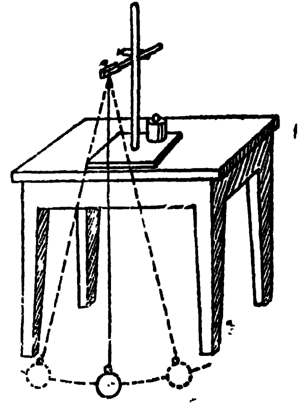
৫ নং চিত্র—মুদ্রা ও পালকের পরীক্ষা

অভিকর্ষের ব্যবহারিক প্রয়োগ—

(১) **সরল দোলক** (Simple Pendulum)—তোমরা দেওয়াল ঘড়িতে দোলক বা পেণ্ডুলাম দুলিতে দেখিয়াছ। ইহাও গ্যালিলিওর আবিষ্কার। একদিন তিনি যখন গির্জাতে প্রার্থনা সভার মধ্যে ছিলেন তখন একটি ঝুলানো প্রদীপ তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রদীপটি এদিক সেদিক দুলিতেছিল। সে অবস্থায় গ্যালিলিওর মনে হইল, প্রথম যখন দোলনের বিস্তার বেশি ছিল তখন দোলনের সময় যাহা ছিল ক্রমে ক্রমে দোলনের বিস্তার কমিয়া আসার পরও দোলনের সময় একই যেন রহিয়া গিয়াছে। গির্জার ভিতর সময় মাপিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতির বলে তিনি অবিলম্বে নিজের হাতের ধমনীতে আঙুল চাপিয়া কয়েক বার দোলনের সময়ের মধ্যে কয় বার

ধমনীর স্পন্দন হয় দেখিয়া লইলেন। পরীক্ষার ফল হইল আশ্চর্য। যাহা মনে করিয়াছিলেন দেখিলেন বেশি ও কম বিস্তারে দোলনের সময় একই। পরে নিজ বাড়িতে একটি সরল দোলক নিয়া পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি নিয়ম বাহির করিলেন। তাহার পর তিনি একটি দোলক ঘড়ি তৈয়ারি করার পরিকল্পনা করেন, কিন্তু বার্ধক্য ও দৃষ্টিহীনতার জন্য সে কাজ আর সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রের নিকট হইতে নকশাটি নিয়া আর একজন বৈজ্ঞানিক দোলক ঘড়ি তৈয়ারি করেন।

পরীক্ষা—একটি শক্ত অথচ হালকা সূতা দিয়া আংটা লাগানো একটি ধাতুর ছোট বল ছবিতে যেমন দেখান হইয়াছে সেই ভাবে ঝুলাও। ইহা হইল একটি **সরল দোলক**। দোলকটি স্থির থাকিলে উহা যে স্থানে অবস্থান করে ঠিক তাহার নীচে মাটিতে চক দিয়া দাগ দাও। এখন বলটি এক পাশে, ধর তোমার বাম দিকে, কিছুদুর টানিয়া নিয়া আস্তে ছাড়িয়া দাও। বলটি যখন প্রথমবার চকের দাগের উপর দিয় বাম দিক হইতে ডান দিকে যাইবে তখন ঘড়িতে সময় লক্ষ্য কর। তাহার পর বলটি যে স্থান হইতে ছাড়া হইয়াছিল, সে স্থানে ফিরিয়া আসার পর আবার যখন চকের দাগের উপর দিয়া বাম দিক হইতে ডান দিকে যাইবে তখন এক বার দোলন হইয়াছে গণনা কর। এইরূপে কয়েকবার, ধর দশবার, দুলিতে মোট কত সময় লাগে ঘড়িতে দেখ। এই মোট সময়কে দশ দিয়া ভাগ করিয়া যে সময় পাওয়া যাইবে তাহাকে **দোলন-সময়** (Period of Oscillation) বলে। তাহার পর দোলনের বিস্তার বাড়াইয়া ও কমাইয়া দশবার দুলিতে কত সময় লাগে দেখ। দেখিতে পাইবে, দোলনের বিস্তার বাড়াইয়া ও কমাইয়া পরীক্ষা করিলে একই দোলন-সময় পাওয়া যায়।



৬নং চিত্র—সরল দোলক

এবার দোলকের দৈর্ঘ্য বাড়াইয়া দোলন-সময় বাহির কর। দেখিবে দৈর্ঘ্য চতুর্গুণ করিলে দোলন-সময় চারগুণ না বাড়িয়া দ্বিগুণ হয়; দৈর্ঘ্য নয়গুণ করিলে দোলন-সময় তিনগুণ হয়। আর দৈর্ঘ্য ঠিক চারগুণ বা নয়গুণ

না বাড়াইয়া অন্য পরিমাণে বাড়াইলেও দোলন-সময় ঐ একই নিয়মে (অর্থাৎ দৈর্ঘ্যের বর্গমূলের সমানুপাতিক ভাবে) বাড়ে; দৈর্ঘ্য কমাইলে ঐ একই নিয়মে দোলন-সময় কমে।

এই পরীক্ষা হইতে দোলকের দোলনকাল সম্বন্ধে এই নিয়ম পাওয়া গেল:

(ক) দোলকের দোলন-সময় উহার দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে; দোলনের বিস্তারের উপর নয়।

(খ) দৈর্ঘ্য বাড়াইলে বা কমাইলে দোলন-সময় দৈর্ঘ্যের বর্গ-মূলের সমানুপাতিক ভাবে বাড়ে বা কমে।

এখানে ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, দোলনের বিস্তার কম গণ্ডীর মধ্যে বাড়াইলে বা কমাইলেই উপরের নিয়ম খাটে দেখা গিয়াছে।

দোলকের পরীক্ষা হইতে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, দোলকের দৈর্ঘ্য ঠিক থাকিলে উহার বলটি যে-কোন পদার্থের বা যে-কোন ভরের হইলেও দোলন-কাল পরিবর্তিত হয় না।

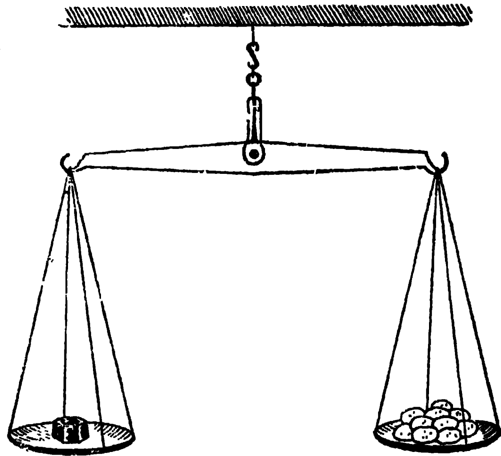
দোলকের দোলন অভিকর্ষের উপর নির্ভর করে। বলটি দোলাইবার জন্য একপাশে যখন সরাইয়া নেওয়া হয় তখন সেইটি একটু উপরে উঠিয়া যায়। সেখান হইতে অভিকর্ষের বলে বেগে নীচে নামিয়া আসে। মধ্যপথে দাগের উপর আসিবার সময় উপর হইতে নীচে পতনের ফলে বলটিতে যে ভরবেগ উৎপন্ন হয় তাহাই আবার বলটিকে অপর দিকে ঠেলিয়া নিয়া যায়। বলটি উপরে উঠার ফলে ভরবেগ নিঃশেষ হইয়া গেলে উহা আবার নামিয়া আসে অর্থাৎ উল্টাপথ দিয়া দুলিতে থাকে এবং এই ক্রিয়া প্রায় বিরামহীন ভাবে চলিতে থাকে।

দোলন-কালের সঙ্গে অভিকর্ষের সম্বন্ধ থাকায় তোমরা ইহাও ধরিয়া নিতে পার যে, কোনও দোলক এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া গেলে যেখানে অভিকর্ষজ ত্বরণ বেশি (যেমন মেরুপ্রদেশে, যাহার দূরত্ব পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে সবচেয়ে কম) সেখানে দোলন বেশি তাড়াতাড়ি হইবে অর্থাৎ দোলন-কাল কমিয়া যাইবে।

দেওয়াল ঘড়ির দোলক ধাতুদণ্ড দ্বারা ঝুলানো থাকে। ঘড়ির স্প্রিংয়ে দম দিয়া অর্থাৎ উহাকে গুটাইয়া ইহার মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করা হয়। স্প্রিংটি সর্বক্ষণ ধীরে ধীরে খুলিয়া ঘড়ির কাঁটা ঘুরাইয়া থাকে। দোলক

নির্দিষ্ট সময় পরে পরে বিস্তারের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে গিয়া স্প্রিংটিকে সামান্য পরিমাণে খুলিয়া দেয়। ফলে প্রতি দোলনের সময়ের মধ্যে ঘড়ির কাঁটা নির্দিষ্ট পরিমাণে ঘুরিতে পারে।

(২) সাধারণ তুলা (Common Balance)—সাধারণ তুলার যে ছবি দেখিতেছ তাহা হাটে, বাজারে, মুদী দোকানে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহাকে দাঁড়িপাল্লা বলে। ইহার দুইটি পাল্লা তুলাদণ্ডের দুইপ্রান্ত হইতে ঝুলানো থাকে। দণ্ডটি ঠিক মধ্যবিন্দুতে ঝুলানো হয়। এখন দুই পাল্লাতে সমান ভরের বস্তু রাখিলে তাহাদের উপর অভিকর্ষ-বল সমান হইবে। দণ্ডটি যে বিন্দুতে ঝুলিতেছে সেখান হইতে সমান দূরে দুই দিকে সমান অভিকর্ষ-বলের ক্রিয়ার ফলে অনুভূমিক অবস্থায় থাকিবে। ইহা একটি লিভার (Lever), ইহার কার্যপ্রণালী পরে বর্ণনা করা হইবে। দণ্ডটি অনুভূমিক হইলে উহার সঙ্গে সংলগ্ন একটি কাঁটা দণ্ডটিকে ঝুলাইবার যে হাতল তাহার মধ্যবর্তী একটি কাঁটার সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া থাকে।

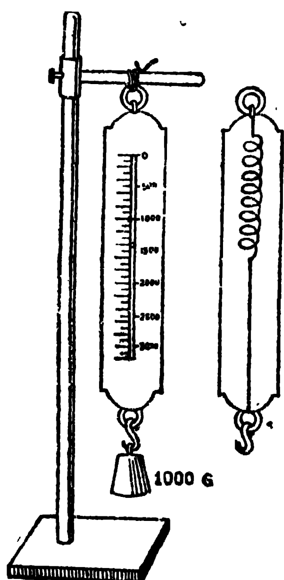


৭নং চিত্র—সাধারণ তুলা

তুমি যদি এক কিলোগ্রাম আলু কিনিতে চাও তাহা হইলে দোকানী বাম দিকের পাল্লায় এক কিলোগ্রাম বাটখারা রাখিয়া ডান দিকের পাল্লায় আলু চাপাইতে থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না দণ্ডের কাঁটা হাতলের কাঁটার ঠিক নীচে আসে। এ অবস্থায় ডান পাল্লার আলুর ভর এক কিলোগ্রাম বাটখারার ভরের সমান। এখানে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সাধারণ তুলা দিয়া ওজন করিবার সময় প্রমাণ বাটখারার ভরের সহিত তুলনামূলক ভাবে বস্তুর ভর বাহির করিতে হয়। বিজ্ঞানাগারে যে সব তুলা ব্যবহার

করা হয় তাহার কার্যপ্রণালী একই রকমের, তবে তাহার গঠন-প্রণালী খুব সূক্ষ্ম ও সঠিক।

(৩) স্প্রিং তুলা (Spring Balance)—চিত্রে স্প্রিং তুলা দেখান হইয়াছে। ইহার ভিতরের ব্যবস্থা ছবির ডান দিকের অংশে দেখ। এই তুলাতে একটি ইস্পাতের স্প্রিংকে একটি ধাতব আবরণের ভিতর এমন ভাবে রাখা হয় যে স্প্রিংটির এক প্রান্ত একটি আংটার সঙ্গে আটকানো থাকে, আর নিম্ন প্রান্তে মাল বহন করিবার একটি হুক লাগানো থাকে। ধাতব আবরণের গায়ে আউন্স অথবা গ্রামে দাগকাটা একটি স্কেল থাকে। স্প্রিংটিতে টান পড়িলে উহা কিরূপ লম্বা হয় নির্দেশ করার জন্য উহার সঙ্গে একটি সরু সূচক লাগানো থাকে। ভাল স্প্রিং-এর এই ধর্ম যে, উহাকে যত বলে টান দেওয়া যাইবে উহার দৈর্ঘ্য সেই অনুপাতে বাড়িবে। প্রথমে কয়েকটি নির্দিষ্ট ওজনের বস্তু হুকে ঝুলাইলে স্প্রিং দৈর্ঘ্যে কতটা বাড়ে এবং তাহার ফলে সূচকটি কোথায় দাঁড়ায় তাহা দেখিয়া সেই মত স্কেলে দাগ কাটিতে হয়। পরে অজানা ওজনের কোন বস্তু হুকে ঝুলাইলে সূচক যে-দাগের পাশে থাকিবে তাহাই হইবে বস্তুর ওজন।



৮নং চিত্র—স্প্রিং তুলা

সাধারণ তুলার দুইদিকে সমান ভরের বস্তু চাপাইলে দুইটি ভরকেই পৃথিবী সমান জোরে আকর্ষণ করিবে। বিষুব অঞ্চল হইতে মেরু অঞ্চলে অভিকর্ষের বল সামান্য বেশি। কাজেই কোন জিনিসের ওজন বিষুব অঞ্চল হইতে মেরু অঞ্চলে সামান্য বেশি হইবে, কিন্তু সাধারণ তুলায় প্রমাণ বাটখারা দিয়া তুলনামূলক ভাবে ওজন করিলে সে পার্থক্য ধরা পড়ে না। স্প্রিং তুলা দিয়া বস্তুর ওজন সরাসরি মাপা যায়। কাজেই ইহাদ্বারা ভরের উপর পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আকর্ষণের তারতম্য বুঝা যায়।

তোমরা পূর্বে জানিয়াছ, ভর বলিলে কোন বস্তুর মধ্যে কতটা পদার্থ

(Matter) আছে তাহা বুঝায়। সাধারণ তুলা দুই দিকের ভর সমান কি না তাহাই নির্দেশ করে। আর স্প্রিং তুলা বস্তুর **ওজন** অর্থাৎ বস্তুটির উপর পৃথিবী মোট কি পরিমাণ অভিকর্ষ-বল প্রয়োগ করে তাহাই নির্দেশ করে।

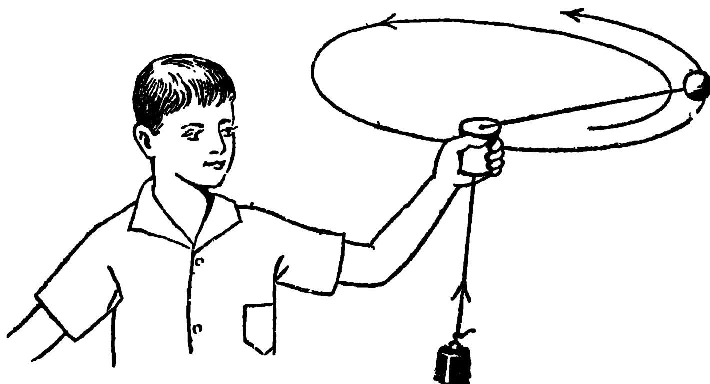
কৃত্রিম উপগ্রহ (Artificial Satellite)—তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়া থাকিবে গত কয়েক বৎসর যাবত রুশিয়া ও আমেরিকা আকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়িয়া আসিতেছেন। ইহা বিজ্ঞানীদের এক চমকপ্রদ কৃতিত্ব বলা যাইতে পারে। ১৯৫৭ সনের ৪ঠা অক্টোবর রুশিয়া সর্বপ্রথম যে কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে ছাড়িয়া ছিলেন তাহার নাম স্পুটনিক। ইহার পর রুশিয়া ও আমেরিকা আরও কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে পাঠাইবার ফলে আকাশের উচ্চ স্তরের আবহাওয়া এবং আরও নানা তথ্য জানা গিয়াছে। কৃত্রিম উপগ্রহের ভিতরে আবহাওয়া ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের যন্ত্রপাতি, ফটোর ক্যামেরা, বেতার যন্ত্র প্রভৃতি থাকে। এক একটি কৃত্রিম উপগ্রহ ওজনে কয়েক মন হইতে কয়েক টন পর্যন্ত হইতে পারে। ঐ উপগ্রহগুলিতে কোন মানুষ ছিল না। ইহারা যন্ত্রপাতি সহ উচ্চ আকাশে উঠিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিবার কালে নানা তথ্য প্রেরণ করিয়াছে।

১৯৬১ সনের ১২ই এপ্রিল আরও বিস্ময়কর এক ব্যাপার ঘটিল। গ্যাগরিন (Gagarin) নামক একজন রুশ আকাশচারী বিশেষ রকমের যন্ত্রপাতি সজ্জিত একটি উপগ্রহে উঠিয়া এক ঘণ্টা আটচল্লিশ মিনিটে ১১০ হইতে ১৮৮ মাইল উপর দিয়া একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন। যে সব কৃত্রিম উপগ্রহে মানুষ থাকে তাহাদিগকে আকাশযান বলা যাইতে পারে। ইহার পর রুশ আকাশচারী টিটভ (Titov) সতর বার এবং মার্কিন আকাশচারী গ্লেন (Glenn) তিন বার পৃথিবী পরিক্রমা করিয়াছেন। ১৯৬২ সনের আগস্ট মাসে রুশিয়ার তৃতীয় ও চতুর্থ আকাশচারিদ্বয় যথাক্রমে ৯৫ ও ৭১ ঘণ্টা সময় দুইটি আকাশযানে থাকিয়া প্রায় একই সময়ে পৃথিবী বহুবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়াছেন। বহুকাল যাবত মানুষ চন্দ্রলোকে যাওয়ার কথা ভাবিতেছিল। আকাশযাত্রীদের আধুনিক সাফল্য চন্দ্রলোকে যাওয়ার পথে এক গৌরবময় পদক্ষেপ মনে করিতে হইবে।

কৃত্রিম উপগ্রহকে আকাশে তোলা—চন্দ্র কি ভাবে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে ভাবিয়া দেখ। সৃষ্টির সময়ই চন্দ্র গতিশীল পৃথিবী হইতে এক প্রচণ্ড গতি লাভ করিয়াছিল। ফলে নিউটনের প্রথম গতিসূত্র মতে

চন্দ্র একই দিকে একই বেগে ধাবিত হইত, কিন্তু পৃথিবীর অভিকর্ষ-বল তাহাকে তাহার চারিদিকে ঘুরিতে বাধ্য করে। কৃত্রিম উপগ্রহকে ঠিক এই ভাবে ঘুরাইতে হইলে তাহাকে আকাশে তুলিয়া পৃথিবীর সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে প্রচণ্ড গতি দিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। তাহার পর অভিকর্ষের ক্রিয়ায় উহা ঘুরিতে থাকিবে। কৃত্রিম উপগ্রহ যে পথ দিয়া চলে সেই উচ্চতায় বায়ু না থাকারই মত। এরোপ্লেন আকাশের বায়ুতে পাখা ঘুরাইয়া অভিকর্ষ-বল অতিক্রম করিয়া চলে। কৃত্রিম উপগ্রহকে প্রচণ্ড বেগের সাহায্যে অভিকর্ষ-বল অতিক্রম করিতে হয়। কোনও ঢিল জোরে উপরে ছুড়িলে বেগের সাহায্যে উহা পৃথিবীর টান অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতে পারে।

পরীক্ষা—একটি বল জোরে ঘুরাইলে ইহা যে পৃথিবীর অভিকর্ষ-বল অতিক্রম করিতে পারে পরীক্ষা করিয়া দেখ। বলটি একটি ওজনের



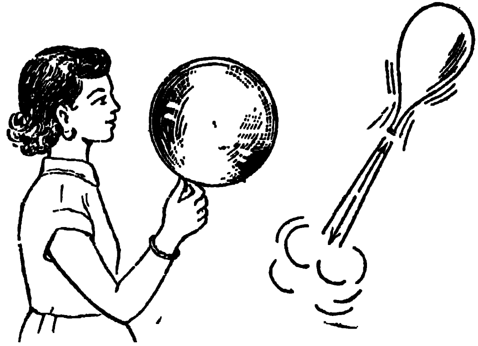
৯নং চিত্র—বলটি অভিকর্ষ-বল অতিক্রম করিতেছে

সঙ্গে সুতা দিয়া বাঁধ। সুতায় হাত দিয়া না ঘুরাইয়া এক কাঠিমের মধ্য দিয়া সুতাটি গলাইয়া কাঠিমে ধরিয়া বলটি জোরে ঘুরাও। বল প্রথমে তাহার চেয়ে ভারি ওজনটাকে তুলিয়া ধরিয়া নিজে ঘুরিবে। অবাক হইয়া যাইবে বলটিকে আরও জোরে ঘুরাইলে। ভারি ওজনটাকে বল আস্তে আস্তে উপরে তুলিতে আরম্ভ করিবে। কৃত্রিম উপগ্রহকে শক্তিশালী রকেটের সাহায্যে উপরে তুলিয়া প্রবল বেগ দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেই বেগের বলেই কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর অভিকর্ষ-বল অতিক্রম করিয়া থাকে।

রকেট (Rocket)—তোমরা আকাশে হাউই ছাড়িতে দেখিয়াছ।

ইহার বারুদে আগুন দিলে হঠাৎ প্রচুর পরিমাণে উত্তপ্ত গ্যাস উৎপন্ন হইয়া প্রবল চাপে নীচ দিকে বাহির হইয়া যায়। প্রতিক্রিয়ার ফলে হাউইটি উপরের দিকে সোঁ করিয়া ছুটিয়া যায়।

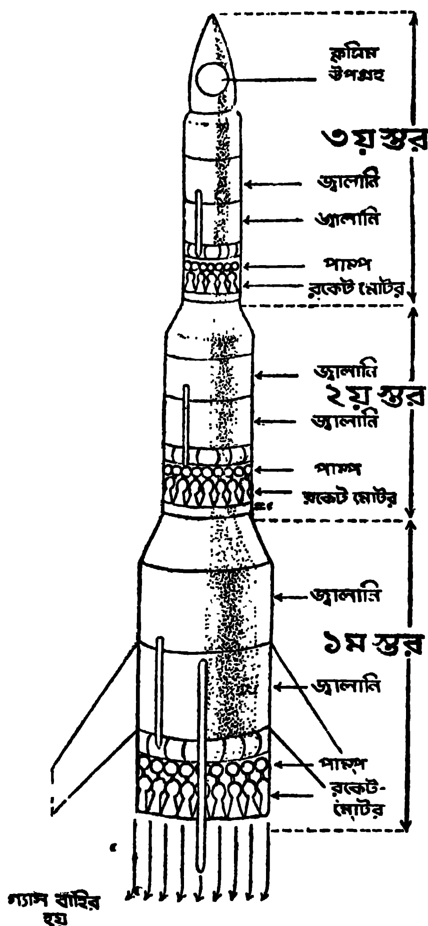
পরীক্ষা—এ বিষয়ে একটা পরীক্ষা করিতে পার। একটা রবারের বেলুন খুব জোরে ফুলাইয়া ইহাকে হঠাৎ ছাড়িয়া দাও। মুখ দিয়া বাতাস বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেলুনটা উল্টা দিকে কিছু দূর ছুটিয়া যাইবে। রকেটও জোরে গ্যাস নির্গমনের প্রতিক্রিয়ার ফলে উপরের দিকে ছুটিয়া যাইবে। ইহাতে দহনের জন্য তরল জ্বালানি (যেমন গ্যাসোলিন, অ্যালকোহল) ও তরল অক্সিজেন ব্যবহার করা হয়। রকেটের আগায় কৃত্রিম উপগ্রহটি বসানো থাকে। পর পৃষ্ঠার চিত্র দেখ। পৃথিবীর উপরকার প্রথম বিশ-পঁচিশ মাইলের ঘন বায়ুস্তরের মধ্যদিয়া কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়া রকেট প্রবল বেগে চলিতে পারিবে না; চলিলে বায়ুর সঙ্গে ঘর্ষণে কৃত্রিম উপগ্রহটি খুব বেশি উত্তপ্ত হইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। এজন্য একটি রকেটের পরিবর্তে অন্তত তিনটি রকেট পর পর সাজাইয়া উপগ্রহটিকে তুলিতে হয়। সেই সম্মিলিত রকেটে নীচের রকেটটি হইল প্রথম স্তরের; তাহার উপর দ্বিতীয় স্তরের রকেট, আর সকলের উপর তৃতীয় স্তরের রকেট উপগ্রহটিকে বহন করে। প্রত্যেকটি রকেটে জ্বালানি ও অক্সিজেন দহনকক্ষে মিশ্রণের জন্য পাম্প ও মোটর রহিয়াছে। সেই মিশ্রণ জ্বলিয়া উঠিলেই অতি-উচ্চ চাপে গ্যাস তৈয়ারি হয় এবং তাহা প্রচণ্ড বেগে রকেটের নীচের দিকের খোলা মুখ দিয়া বাহির হইতে থাকে। ফলে রকেটটি প্রথম সাধারণ বেগে উপরে উঠিতে থাকে। পূর্বোক্ত কারণে বায়ুমণ্ডলে ইহার বেগ খুব বেশি হওয়া অনুচিত।



১০নং চিত্র—রবারের বেলুন হইতে বায়ু-নির্গমন

কৃত্রিম উপগ্রহ উত্তোলনের পূর্বে বিজ্ঞানীরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন

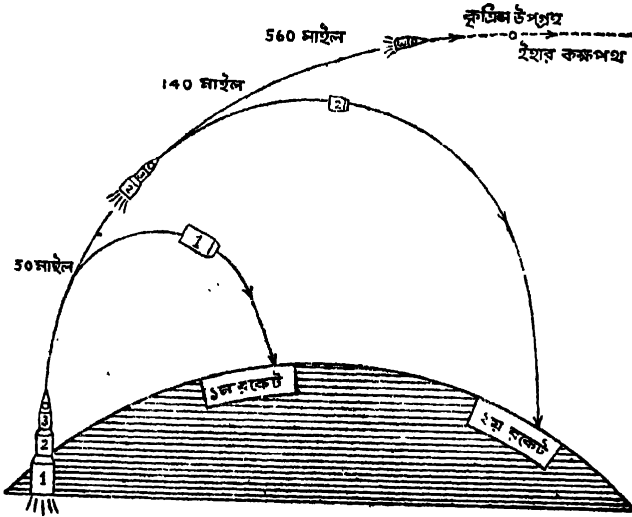
যে, উহাকে উর্ধ্বে তুলিয়া ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল (সেকেণ্ডে ৭ মাইল) বেগ দিতে পারিলে উহা পৃথিবীর অভিকর্ষ বল অতিক্রম করিয়া একেবারে মহাশূন্যে (পৃথিবী হইতে প্রায় ১১০০ মাইল দূরে মহাশূন্য আরম্ভ হইয়াছে) চলিয়া যাইবে। আর বেগ যদি সেকেণ্ডে ৩·৫ মাইল হইতে ৭ মাইলের মধ্যে হয় তবে কোন কোন উচ্চতায় উহা উপবৃত্ত (Ellipse) পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে। পর পৃষ্ঠার ছবিতে দেখ প্রথম স্তরের রকেটটি কৃত্রিম উপগ্রহ ও অন্য দুইটি রকেট সহ প্রায় ৫০ মাইল উপরে উঠার পর উহাদিগকে একটা বেগ দিয়া নীচে খসিয়া পড়িল। তাহার পর দ্বিতীয় স্তরের রকেট তৃতীয় স্তরের রকেট ও উপগ্রহ সহ প্রায় ১৪০ মাইল উপরে উঠার পর উহাদিগের বেগ আরও বাড়াইয়া দিয়া নিজে নীচে খসিয়া পড়িল। সবশেষে তৃতীয় স্তরের রকেট উপগ্রহকে ৫৬০ মাইল উচ্চে লইয়া গিয়া পৃথিবীর সমান্তরাল করিয়া উহার বেগ আরও বাড়াইয়া দিয়া নিজে উপগ্রহটি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। উপগ্রহটি তখন আপন কক্ষপথে ঘণ্টায় প্রায় ১৭,৫০০ মাইল বেগে চলিতে থাকে। পৃথিবীর অভিকর্ষের ফলে আসল চন্দ্রের ন্যায় এই কৃত্রিম চন্দ্রও পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে।



১১নং চিত্র—তিন স্তরের রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ

চন্দ্র ও কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথ—২৪ পৃষ্ঠার ছবিতে ছাব্বিশ বৎসর বয়স্ক রুশ আকাশচারী টিটভ যে আকাশযানে চড়িয়া ২৫ ঘণ্টায়

পৃথিবী ১৭ বার প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন তাহার কক্ষপথ দেখান হইয়াছে। আকাশ-যানটির ওজন ছিল প্রায় সাড়ে চার টন। ইহার ভিতরে কি কি ছিল ১৪নং ছবিতে দেখ। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, উত্তাপরোধক ব্যবস্থা, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, পৃথিবীর সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ছাড়া ইহার ছোট ছোট রকেটও ছিল। ঘণ্টায় ১৭,৪০০ মাইল বেগে আকাশযানটি পৃথিবী পরিক্রমা করিয়াছিল। পরিক্রমার কাজ শেষ হইয়া গেলে উল্টাদিকে রকেট ছাড়িয়া আকাশযানের গতি কমাইয়া দেওয়া হয়, ফলে ইহা আস্তে আস্তে পৃথিবীর

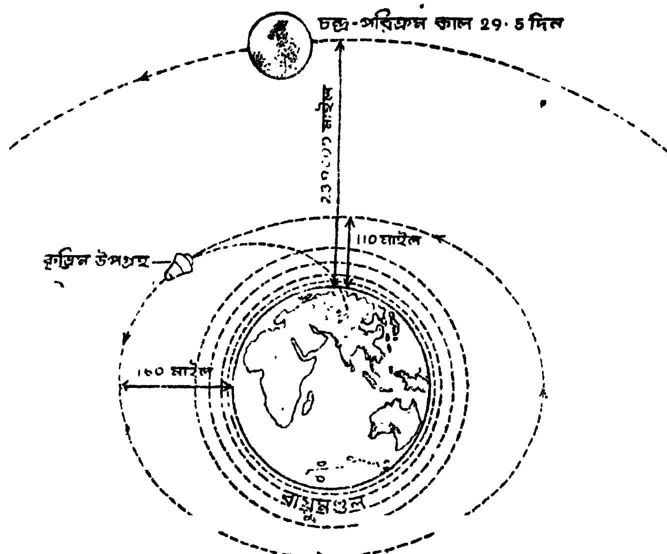


১২নং চিত্র—রকেটগুলির গতিপথ ও কৃত্রিম উপগ্রহকে উত্তোলন

দিকে নামিয়া আসিতে থাকে। এরোপ্লেন হইতে নামিয়া আসার যেরূপ প্যারাস্যুট ও জলে ভাসিবার ব্যাগ থাকে আকাশযানেও তাহা থাকে।

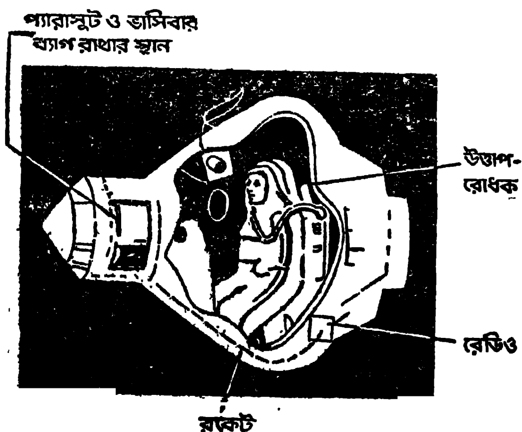
আকাশচারী দেহের উপর দুইটি ক্রিয়া বিশেষ ভাবে অনুভব করেন। একটি হইল প্রবল বেগে রকেটে করিয়া উপরে উঠার সময়। তখন অতিক্রুত ত্বরণ বৃদ্ধির ফলে তাঁহার দেহের ওজন বহুগুণে বাড়িয়া যায়। এই ওজন বৃদ্ধির অবস্থা যাহাতে তিনি সহ্য করিতে পারেন, সেজন্য পূর্বে তাঁহাকে প্রশিক্ষণ নিতে হয়। বিশেষ রকমের যন্ত্রে তাঁহাকে বসাইয়া অতিক্রুত ত্বরণ বৃদ্ধির সহিত উহা ঘুরানো হয়। তাহার পর আকাশচারী যখন কক্ষপথে

ঘুরিতে থাকে তখন তিনি ভারশূন্যতা অনুভব করেন। ভারশূন্যতা কি



১৩নং চিত্র—চন্দ্র ও কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথ

তাহা বুঝা যায়, কিন্তু ইহার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা আমাদের নাই। আকাশযান যখন শূন্যে প্রবল বেগে ঘুরিতে থাকে তখন তাহার কোন ওজন

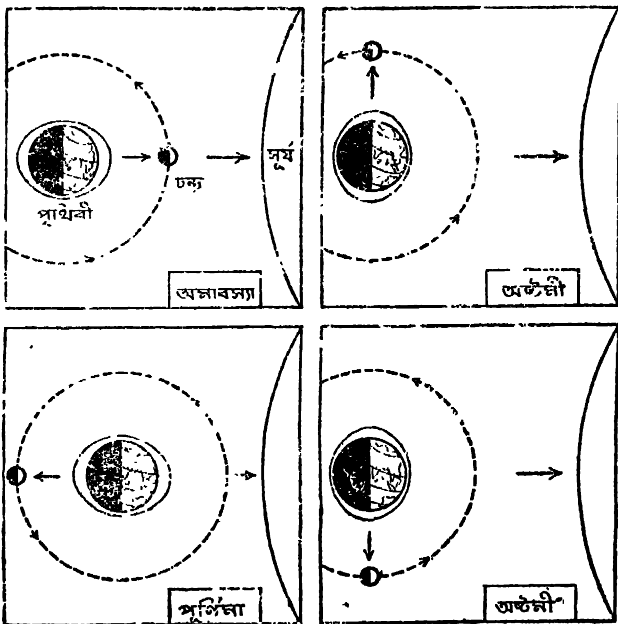


১৪নং চিত্র—আকাশযান

থাকে না, কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ-বলকে গতিশীল উপগ্রহ হইতে উদ্ভূত

বলদ্বারা প্রশমিত করা হয়। ভারশূন্য অবস্থায় কোন বস্তু হাত হইতে ছাড়িয়া দিলে উহা সেখানেই থাকিবে। কোন খাদ্যই গলার নালী দিয়া ওজনের অভাবে নীচ দিকে যাইবে না। আকাশচারীরা বিশেষ ব্যবস্থা দ্বারা এসব অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে নিয়া আসেন। আকাশযানের বেশি কাজই স্বয়ংক্রিয় ভাবে হয়; তবে ইহাতে হস্তচালিত কাজেরও স্থান রহিয়াছে।

জোয়ার-ভাটা (Tides)—চন্দ্র ও সূর্যের মহাকর্ষ-বলের জন্য জোয়ার-ভাটা হইয়া থাকে। চন্দ্র অপেক্ষা সূর্যের ভর অনেক বেশি হইলেও পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব অপেক্ষা সূর্যের দূরত্ব অনেক বেশি বলিয়া চন্দ্রের মহাকর্ষ বলই অধিক প্রবল। পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্রের ঠিক সম্মুখে আসে



১৫ নং চিত্র—জোয়ার-ভাটা

সেই অংশের উপর চন্দ্রের আকর্ষণ বেশি হয়। চিত্রে উপরের দিকে বাম পার্শ্বে পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য যে অবস্থানে আছে তাহা অমবস্যার। চন্দ্র হইতে পৃথিবীর ভূভাগের দূরত্ব অপেক্ষা জলভাগের দূরত্ব কম। আর

ভূভাগ অপেক্ষা জলভাগ বেশি শিথিল ও সচল বলিয়া চন্দ্রের আকর্ষণে তাহার সম্মুখের জলভাগ ফুলিয়া উঠিবে এবং অন্যান্য দিকের সমুদ্র হইতে জলরাশি সেই দিকে প্রবাহিত হইবে। ফলে ঐ অংশে জোয়ার হইবে। ইহা হইল চন্দ্রের **মুখ্য জোয়ার**। চন্দ্রের এই আকর্ষণ-স্থলের ঠিক বিপরীত দিকে মহাকর্ষজনিত বল স্থলভাগের উপর যতটা প্রযুক্ত হইবে জলভাগের উপর ততটা হইবে না, কারণ বিপরীত প্রান্তে স্থলভাগ জলভাগ অপেক্ষা চন্দ্রের নিকটে। এই কারণে স্থলভাগ চন্দ্রের দিকে কতকটা সরিয়া যাওয়ায় ঐ স্থানের জলও স্ফীত হইয়া থাকিবে। ঐ স্থানে যে জোয়ার হইবে তাহাকে বলে **গৌণ জোয়ার**। যে সময়ে পৃথিবীর কোন নির্দিষ্ট অংশে মুখ্য জোয়ার ও উহার বিপরীত অংশে গৌণ জোয়ার হয তখন ঐ দুই অংশের মধ্যবর্তী দুই স্থানের জলতল কিছু নামিয়া যায়। সেজন্য সে অংশে ভাটার সৃষ্টি হয়। পৃথিবী তাহার অক্ষের উপর ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরিয়া আসে বলিয়া যে-কোন স্থানে প্রতিদিন একবার মুখ্য জোয়ার, একবার গৌণ জোয়ার ও দুইবার ভাটা হইবে অর্থাৎ প্রত্যেক স্থানে দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাটা হইবে।

অমাবস্যায় চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর একই দিকে অবস্থান করে। সেইজন্য পৃথিবীর উপর ইহাদের মিলিত আকর্ষণ খুব প্রবল হয়। ফলে যে স্থানে মুখ্য চান্দ্র জোয়ার ঠিক সেইখানে মুখ্য সৌরজোয়ারও হইয়া থাকে এবং ঠিক বিপরীত দিকে গৌণ চান্দ্র ও গৌণ সৌর জোয়ার হইয়া থাকে। এইভাবে দুই দিকেই চন্দ্র ও সূর্যের এককালীন আকর্ষণের ফলে জলরাশি খুব উঁচু হইয়া উঠে। ইহাকে **ভরা কটাল** বা **ভরা জোয়ার** (Spring Tide) বলে। পূর্ণিমা তিথিতে (ছবির নীচে বাম দিকে) চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর দুই দিকে থাকে। সেদিন চন্দ্রের ঠিক সম্মুখবর্তী স্থানে মুখ্য চান্দ্র জোয়ার ও গৌণ সৌর জোয়ার হয় এবং তাহার বিপরীত স্থানে গৌণ চান্দ্র ও মুখ্য সৌর জোয়ার হয়। জোয়ারের প্রাবল্যের জন্য ইহাকেও ভরা কটাল বলে। অষ্টমী তিথিতে সূর্য ও পৃথিবীকে যোগ করিলে যে রেখা পাওয়া যায়, চন্দ্র ও পৃথিবীর সংযোগ-রেখা তাহার সহিত সমকোণে অবস্থিত থাকে। সেজন্য চন্দ্রের আকর্ষণে যে স্থানে জোয়ার, সূর্যের আকর্ষণে সেই স্থানে ভাটা হয়। এজন্য জোয়ারের জল বেশি উঁচু হইয়া উঠিতে পারে না। ইহাকে **মরা কটাল** বা **মরা জোয়ার** (Neap Tide) বলে।

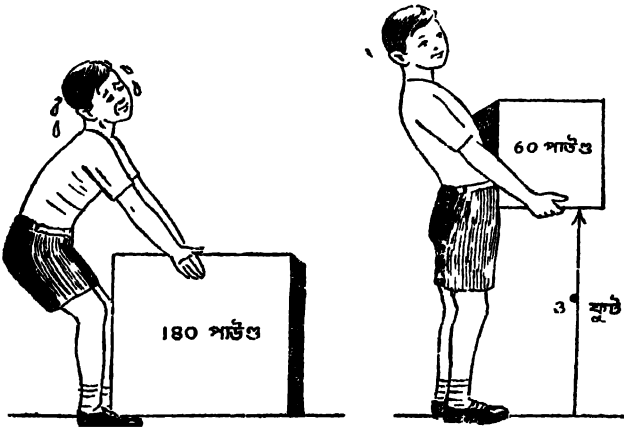
৩

কি কি কারণে কাজ করা কঠিন হয়

কি কি কারণে কাজ করা কঠিন হয় বুঝিবার পূর্বে কাজ ও তাহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে ধারণা থাকা আবশ্যক।

কাজ (Work)—দৈনন্দিন জীবনে কাজের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মানুষ ও জীবজন্তু সর্বদাই কোন না কোন কাজ করিতেছে। অধিকাংশ কাজই খাদ্যসংগ্রহ ও জীবনযাত্রা নির্বাহের অন্যান্য ব্যাপার নিয়া। প্রত্যেক কাজ হইতেই কিছু না কিছু ফল আশা করা যায়। আবার অনেক সময় গুরুতর পরিশ্রম করিয়াও কিছুই করা যায় না। যেমন একজন লোক একটা বড়, ভারি পাথর ঠেলিয়া সরাইবার জন্য দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়া বিশেষ পরিশ্রান্ত হইল, কিন্তু উহা নড়াইতেও পারিল না। সাধারণ কথায় যে ক্রিয়ায় লিপ্ত থাকার ফলে দৈহিক ক্লান্তি ঘটে তাহাকেই কাজ বলা হয়। কিন্তু বলবিদ্যায় কাজের সংজ্ঞা এইরূপ :

কোন বস্তুর উপর বল প্রয়োগের ফলে যখন বস্তুটি স্থানান্তরিত হয় তখন আমরা বলি ঐ বল কাজ করিতেছে।



১৬নং চিত্র—কাজ হইতেছে না

১৭নং চিত্র—কাজ হইতেছে

ছবিতে একটি ছেলে ১৮০ পাউণ্ড ওজনের একটা জিনিস তুলিবার চেষ্টা করিয়া গলদ্‌ঘর্ম হইতেছে, কিন্তু জিনিসটি নড়াইতেও পারিতেছে না। এক্ষেত্রে কোন কাজই হইতেছে না। আর একটি ছেলে ৬০ পাউণ্ড ওজনের জিনিসটি ৩ ফুট ওপরে তুলিয়া ফেলিয়াছে। সে কাজ করিয়াছে বলা যায়।

কাজের মাপ—যে ছেলেটি কাজ করিল তাহার কাজের পরিমাপ করিতে গেলে দুইটি কথা মনে রাখিতে হইবে—যে বস্তুটি তোলা হইয়াছে তাহার ওজনকে প্রশমিত করিতে কত বল প্রয়োগ করিতে হইয়াছে এবং যতদূর তোলা হইয়াছে সেই দূরত্ব। প্রকৃতপক্ষে যে-কোন কাজের পরিমাপ হইল—প্রযুক্ত বল এবং বলের প্রয়োগবিন্দু বল যেদিকে কাজ করে সেদিকে যতটা দূরত্ব সরিয়াছে, এই দুইয়ের গুণফল অর্থাৎ

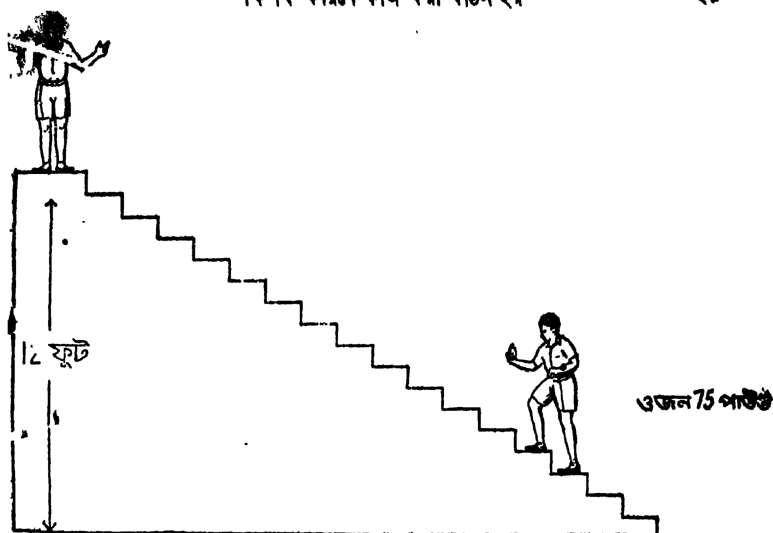
কাজ = প্রযুক্ত বল × বলের প্রয়োগ বিন্দুর অপসরণ

যখন ফুট ও পাউণ্ডে দূরত্ব ও ওজন মাপা হয় তখন এক পাউণ্ড ভরকে লম্বভাবে একফুট উপরে তুলিতে যে কাজ হয় তাহাই কাজের একক এবং তাহাকে এক **ফুট-পাউণ্ড** (Foot-Pound) বলে।

এই হিসাবে যে ছেলেটি ৬০ পাউণ্ড ওজন ৩ ফুট উপরে তুলিয়াছে তাহার কাজের পরিমাণ হইয়াছে ৬০ পাউণ্ড × ৩ ফুট = ১৮০ ফুট-পাউণ্ড।

শক্তি (Energy)—**কাজ করিবার ক্ষমতার নাম শক্তি।** কাজ যে এককে মাপা হয় শক্তিও সেই এককেই মাপা হইয়া থাকে। ছেলেটি ওজন তুলিতে গিয়া ১৮০ ফুট-পাউণ্ড কাজ করিয়াছে। সেই কাজ করিবার জন্য তাহার ১৮০ ফুট-পাউণ্ড শক্তি ব্যয় হইয়াছে।

ক্ষমতা (Power)—**কাজ করিবার হারকে ক্ষমতা বলে।** পর পৃষ্ঠার ছবিতে দেখ একটি ছেলে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছে। সিঁড়িটার উচ্চতা ১২ ফুট। তাহার নিজের ওজন ৭৫ পাউণ্ড। উপরে উঠিয়া গেলে সে ৭৫ পাউণ্ড × ১২ ফুট বা ৯০০ ফুট-পাউণ্ড কাজ করিবে। সে ও আর একটি ছেলে ঘড়ি ধরিয়া কত সময়ে সে উপরে উঠিল দেখিতেছে। মনে কর তাহার উপরে ছুটিয়া উঠিতে ৫ সেকেণ্ড সময় লাগিল। তাহা হইলে এক্ষেত্রে তাহার ক্ষমতা বা কাজ করিবার হার হইল ৯০০ ফুট-পাউণ্ড ÷ ৫ সেকেণ্ড বা ১৮০ ফুট-পাউণ্ড/সেকেণ্ড। ছেলেটি যদি ১০ সেকেণ্ডে ঐ সিঁড়ি দিয়া ধীরে ধীরে উঠে তবে তাহাকে ৯০০ ফুট-পাউণ্ড ÷ ১০ সেকেণ্ড বা ৯০ ফুট-পাউণ্ড/সেকেণ্ড ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হইবে। কাজ দুইবারে



১৮নং চিত্র—সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠা

একই হইল, অথচ প্রথম বার দ্বিগুণ ক্ষমতা প্রয়োগ করায় অর্ধেক সময়ে কাজ শেষ হইয়া গেল।

ক্ষমতার ইংরেজী একককে **অশ্ব-ক্ষমতা** (Horse Power) বলে। ইহার পরিমাপ স্থির করার সময় ধরিয়া নেওয়া হইয়া ছিল যে, একটা ঘোড়া ৩৩,০০০ পাউণ্ড ওজন ১ মিনিটে ১ ফুট উপরে তুলিতে পারে। তাহা হইলে অশ্ব-ক্ষমতা বলিলে প্রতি সেকেণ্ডে ৩৩,০০০ ÷ ৬০ = ৫৫০ ফুট-পাউণ্ড কাজ করা বুঝায়। ছেলেটি প্রথম বার সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় প্রতি সেকেণ্ডে ১৮০ ফুট-পাউণ্ড ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছিল। তাহা হইল $\frac{১৮০}{৫৫০}$ বা প্রায় '৩৩ অশ্ব-ক্ষমতা। খুব শক্তিশালী মানুষের ২'২৫ অশ্ব-ক্ষমতা প্রয়োগ করার নিদর্শন রহিয়াছে; তবে এরূপ ক্ষমতা অল্প সময়ই প্রয়োগ করা যায়। '২৫ অশ্ব-ক্ষমতায় বাইসাইকেল চালানো, বৈঠা বাওয়া প্রভৃতি কাজ করা যায়।

শক্তির বিভিন্ন রূপ (Different kinds of Energy)—নানাপ্রকারে শক্তির প্রকাশ হয়। শক্তির মোটামুটি এই কয়টি রূপ : (১) যান্ত্রিক শক্তি (Mechanical Energy), (২) তাপ-শক্তি (Heat Energy), (৩) আলোক-শক্তি (Light Energy), (৪) শব্দ-শক্তি (Sound Energy), (৫) চৌম্বক-শক্তি (Magnetic Energy), (৬) তড়িৎ-শক্তি (Electrical Energy) ও (৭) রাসায়নিক শক্তি (Chemical Energy)।

(১) **যান্ত্রিক শক্তি**—ইহা দুই প্রকারের, গতিশক্তি (Kinetic Energy) ও স্থিতিশক্তি (Potential Energy)। ধনুকের ছিলা জোরে টানিয়া ধরিলে তাহার অবস্থার পরিবর্তনের ফলে তাহার মধ্যে যে শক্তি সঞ্চিত হয় তাহাকে স্থিতিশক্তি বলা যায়। ছিলা ছাড়িয়া দিলে ঐ স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে পরিবর্তিত হইয়া তীরটিকে দূরে ছুটাইয়া দেয়। যদি বাড়ীর ছাদের উপর একটি ইট তুলিয়া রাখা যায়, তবে ঐ অবস্থানের দরুন ইটটি স্থিতিশক্তি লাভ করে। ইটটি নীচে ছাড়িয়া দিলে ঐ সঞ্চিত শক্তির বলে উহা নীচে পড়িয়া কোন জিনিস ভাঙ্গিয়া দিতে পারে।

(২) **তাপ-শক্তি**—তাপে জল হইতে বাষ্প হয়। বাষ্পের জোরে ইঞ্জিনের চাকা ঘুরে, ফলে ইঞ্জিন রেলগাড়ি চালায়। এই গতিশক্তি আসে তাপ হইতে। ইহা হইতে বুঝা যায় তাপ এক প্রকার শক্তি।

(৩) **আলোক-শক্তি**—সূর্যের আলোক বা অন্য আলোক আমাদিগকে কোন বস্তু দেখিতে সাহায্য করে। আলোকের শক্তি আছে বলিয়াই ইহা সম্ভবপর। ইলেকট্রিক বাল্বে তড়িৎ-শক্তির রূপান্তরে আমরা আলোক-শক্তি পাই। প্রদীপের মধ্যে তেল পুড়াইলে রাসায়নিক শক্তি হইতে আলোক-শক্তির উদ্ভব হয়।

(৪) **শব্দ-শক্তি**—বাজ পড়িবার সময় বায়ুতে যে কড়্ কড়্ শব্দ হয় তাহার ঢেউ আসিয়া জানালার কাচে লাগিলে উহার কম্পনের শব্দ শোনা যায়।

(৫) **চৌম্বক-শক্তি**—চুম্বক নিজ শক্তি বলে লোহাকে টানিয়া নিতে পারে। কারখানায় বড় বড় বিদ্যুৎ-চুম্বক দিয়া লোহা ও ইস্পাতের ভারি মাল স্থানান্তরিত করা হয়।

(৬) **তড়িৎ-শক্তি**—তড়িতের সাহায্যে বাতি জ্বলে, পাখা ঘুরে, ট্রামগাড়ি ও ইলেকট্রিক ট্রেন চলে। বাড়ি-ঘরে ও কারখানাতে বহু কাজে তড়িৎ-শক্তির ব্যবহার হইয়া থাকে।

(৭) **রাসায়নিক শক্তি**—কাঠ, কয়লা, তৈল প্রভৃতি পুড়াইলে তাহাদের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া চলিতে থাকে। সেই রাসায়নিক শক্তি হইতে আমরা তাপ ও আলোক পাইয়া থাকি।

তোমরা পরে বুঝিতে পারিবে যে শক্তির বিনাশ নাই; এক প্রকারের শক্তি অন্য প্রকারের শক্তিতে রূপান্তরিত হয় মাত্র। পূর্বে

বিভিন্ন প্রকরের শক্তির যে সব দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেও তোমরা একথা বুঝিতে পার।

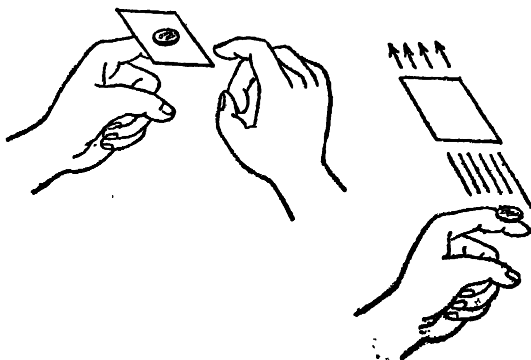
কি কি কারণে কাজ করা কঠিন হয়—আমরা যে সব কাজ করি তাহাতে কম-বেশি বাধা অতিক্রম করিতে হয়। কাজের সংজ্ঞা হইতে তোমরা জান যে, বল ব্যতিরেকে কাজ করা যায় না। বল প্রয়োগের জন্য আমাদের মাংসপেশিকে কাজ করিতে হয়। মাংসপেশি অনবরত কাজ করিলে আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়ি। আমরা যাহাতে কাজের বাধাগুলি সহজে অতিক্রম করিতে পারি সে জন্য আমাদের পূর্বে জানা দরকার বাধাগুলি কি, কি রকমের এবং কি ভাবে তাহাদের উৎপত্তি হয়। বাধা প্রধানত তিন রকমের হইতে পারে: (১) **পৃথিবীর অভিকর্ষ** (Gravity) **জনিত বাধা,** (২) **জাড্য** (Inertia) **জনিত বাধা ও** (৩) **ঘর্ষণ** (Friction) **জনিত বাধা।**

(১) অভিকর্ষ-জনিত বাধা—আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক কাজ অভিকর্ষের বল অতিক্রম করিয়া করিতে হয়। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠা অনেকের পক্ষেই একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কোন জিনিস উপরে তুলিতে বা একস্থান হইতে অন্য স্থানে নিয়া যাইতে হইলে তাহার ওজন বহন করিতে হয় অর্থাৎ অভিকর্ষের বলের উল্টাদিকে বল প্রয়োগ করিতে হয়। জিনিসটার ভর বেশি হইলে আমরা কষ্ট অনুভব করি। কূয়া হইতে বালতি দিয়া জল তোলার সময় একই কারণে আমাদের অসুবিধা হয়।

(২) জাড্য জনিত বাধা—জাড্য বা জড়তা বস্তুর একটি সাধারণ ধর্ম। তোমরা জান নিউটনের প্রথম গতিসূত্র মতে বস্তু আপনা হইতে নিজের অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারে না। যে বস্তুটি স্থির আছে তাহা চিরকালই স্থির থাকিতে চেষ্টা করিবে, আর যে বস্তুটি গতিশীল তাহা চিরকালই সমবেগে একই দিকে চলিতে চেষ্টা করিবে, যতক্ষণ না বাহির হইতে কোন প্রযুক্ত বল ঐ অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়।

পরীক্ষা—বাম হাতের তর্জনীর উপর একটি ছোট ও পালিশ, মোটা কাগজ রাখ। পোস্টকার্ড হইতে টুকরা কাটিয়া নিলে চলিবে। তাহার উপর একটি ছোট মুদ্রা বসাও। এখন তর্জনী বা মধ্যমা দ্বারা কার্ডের টুকরার কিনারায় হঠাৎ জোরে টোকা দাও। কার্ডটি ছুটিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু মুদ্রাটি নড়িল না; কেবল কার্ডটি চলিয়া যাওয়ায় উহার উপর হইতে মুদ্রাটি তোমার

আঙুলের উপর বসিয়া রহিল। এখানে মুহূর্তের জন্য কার্ডের উপর বলপ্রয়োগ করা হইল এবং কার্ড সরিয়া গেল। সেই মুহূর্তের জন্য প্রযুক্ত বল অপেক্ষা মুদ্রার জাড্যধর্মই বেশি প্রবল হইল। ফলে মুদ্রাটি নড়িল না। অবশ্য কার্ডের



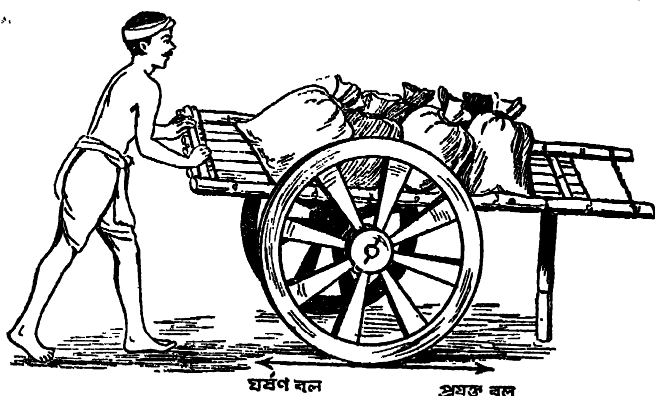
১১নং চিত্র—জাড্য পরীক্ষা

গায়ে ধীরে ধীরে টোকা দিলে কার্ড ও মুদ্রা দুই-ই সরিয়া যাইবে, কারণ কিছুকালব্যাপী বল জাড্যকে অতিক্রম করিয়া ফেলিবে।

দৈনন্দিন জীবনে জাড্যের নানা উদাহরণ রহিয়াছে। জমি সমান করার রোলার বা ভারি পিপা গড়াইয়া নিতে হইলে স্থির অবস্থা হইতে প্রথম উহা সরাইতে বেশ জোর দিতে হয়, কিন্তু উহা একবার চলিতে আরম্ভ করিলে সহজেই উহাকে ঠেলিয়া নেওয়া যায়। তাহার পর একবার জোরে চলিতে থাকিলে উহাকে থামাইতেও উল্টাদিক হইতে বলপ্রয়োগ করিতে হয়। কখনও কখনও শহরের পার্কে বা মেলাতে ছেলেমেয়েদের নাগর-দোলায় করিয়া চক্রাকারে উপরে-নীচে ঘুরাইবার ব্যবস্থা থাকে। নাগর-দোলা ঘুরাইতে আরম্ভ করিবার সময় বেশ জোর দিতে হয়; কিন্তু উহা একবার চলিতে আরম্ভ করিলে সামান্য জোর দিলেই ঘূর্ণন বজায় থাকে। উচ্চ গতিতে ঘুরিবার সময় ইহাকে যখন থামানো হয় তখন লক্ষ্য করিবে প্রায়ই একাধিক লোক দোলনাগুলিকে উল্টাদিক হইতে ঠেলিয়া থামাইয়া থাকে।

(৩) **ঘর্ষণ-জনিত বাধা**—একটি বস্তুর তলের (Surface) উপর আর একটি বস্তুর তল রাখিয়া উপরের বস্তুটিকে একদিকে টানিয়া নিলে তাহাদের স্পর্শতলে (Surface of Contact) একটি গতিরোধক বলের উদ্ভব হয়। ইহাকে ঘর্ষণ বলে। তলের অমসৃণতার জন্য গতির বিপরীত দিকে ঘর্ষণ বলের সৃষ্টি হয়।

ছবিতে দেখ, একটি লোক ঠেলা গাড়ি চালাইয়া নিতেছে। রাস্তাটা যদি সম্পূর্ণ রূপে পালিশ হইত তাহা হইলে ইহাতে কোন ঘর্ষণের সৃষ্টি হইত না। গাড়িতে একবার বলপ্রয়োগ করিলে, না থামানো পর্যন্ত উহা আপনা হইতেই

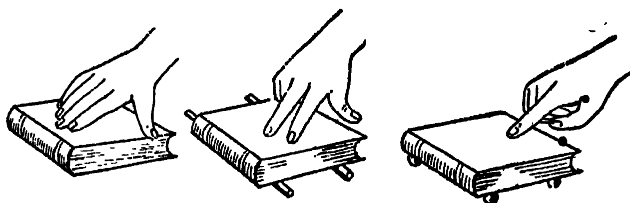


২০নং চিত্র—ঠেলা গাড়িতে ঘর্ষণের বাধা

চলিতে থাকিত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে রাস্তামাত্রেরই ঘর্ষণ রহিয়াছে। সেজন্য ঘর্ষণবলের বাধা অতিক্রম করিয়া গাড়ি চালাইতে হয় বলিয়া অনবরতই বলপ্রয়োগ করিতে হয়।

সেলাইর কল, বাইসাইকেল এবং অন্যান্য ছোট-বড় কল-কব্জায় যেখানেই একটি অংশ আর একটি অংশের গায়ে লাগিয়া ঘুরে সেখানে ঘর্ষণ কমাইবার জন্য বিশেষ রকমের তৈল দেওয়া হয়। ঘর্ষণ কমাইবার আরও স্থায়ী ব্যবস্থা আছে।

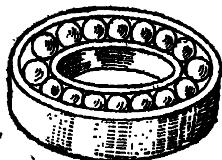
পরীক্ষা—টেবিলের উপর একটি মোটা ভারি বই রাখিয়া উহা হাত দিয়া ঠেলিয়া নিতে চেষ্টা কর; কতটা জোর লাগে মনে রাখিও। তাহার



২১নং চিত্র—ঘর্ষণের বাধা অতিক্রম

পর বইখানা দুইটি পেনসিলের উপর রাখিয়া দেখ ঠেলিতে কিরূপ জোর লাগে। এবার খুব সহজেই আঙুল দিয়া বই ঠেলিয়া নেওয়া যায়। সর্বশেষে

বইটি ৪টি মার্বেলের গুলির উপর রাখ। এবার আঙ্গুল দিয়া সামান্য জোরে ঠেলিলেই বইটি সরিতে আরম্ভ করিবে। এই পরীক্ষাগুলি হইতে বুঝা যায় যে, দুইটি বস্তুর স্পর্শতলের পরিমাণ যতই কম হইবে তাহাদের মধ্যে উৎপন্ন ঘর্ষণও সেই পরিমাণে কম হইবে। এই কারণেই একটা গাড়ির আসন সমেত উপরের অংশটা রাস্তার উপর দিয়া টানিয়া না নিয়া তাহার নীচে গোল চাকা লাগানো হয়, যাহাতে স্পর্শতলের পরিমাণ কম হয়।



২২নং চিত্র—বল-বেয়ারিং

বাইসাইকেলের চাকার অক্ষদণ্ডের (axle) চারিধারে স্টীলের বল সারি সারি করিয়া লাগানো হয়; ইহাকে বল-বেয়ারিং (Ball-bearing) বলে। বল-বেয়ারিং লাগাইয়া ও তৈল দিয়া ঘর্ষণ কমানো হয়। বল-বেয়ারিং ছোট-বড় অনেক যন্ত্রেই ব্যবহার করা হয়।

৪

সাধারণ যন্ত্রের সাহায্যে কাজ সহজ করিবার উপায়

কাজ করিতে কি কি বাধার সৃষ্টি হয় পূর্বে বলা হইয়াছে। ঘর্ষণজনিত বাধা কি ভাবে কমান যায় তাহাও জানিয়াছ। কোন বস্তুর জাড্য এবং ওজন কমাইবার কোন উপায় নাই। কোন বস্তুকে উপরে তুলিতে যে কাজ করিতে হয় তাহা কমানো যায় না। যন্ত্রের সাহায্যে আমরা মোট যে কাজ করিতে হইবে তাহার জন্য কম বল প্রয়োগ করিয়া কাজটি সহজে করিতে পারি; কিন্তু মোট কাজের পরিমাণ কমাইতে পারি না। মনে কর একজন লোক ১০০ পাউণ্ডের ওজন পর্যন্ত বল প্রয়োগ করিতে পারে; কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে সে এক টন (২২৪০ পাউণ্ড) ওজনও তুলিয়া ফেলিতে পারিবে। যন্ত্রের সাহায্যে সাধারণত কম বল প্রয়োগ করিয়া বেশি ভারি জিনিস উপরে তোলা যায় বা অন্য রকমের বেশি বাধা অতিক্রম করা যায়। যন্ত্রদ্বারা আমরা যে সুবিধা পাই তাহাকে যান্ত্রিক সুবিধা (Mechanical Advantage) বলে। তাহা এই ভাবে প্রকাশ করা হয়:

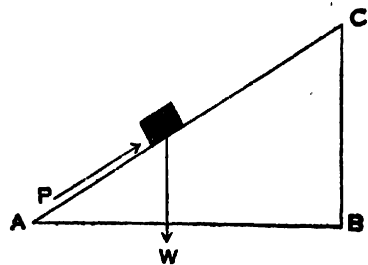
$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{অতিক্রান্ত বাধা (Resistance)}}{\text{প্রযুক্তবল (Effort)}} = \frac{R}{E}$$

$\frac{R}{E}$র পরিমাণ ১ অপেক্ষা বেশি হইলেই যান্ত্রিক সুবিধা হইবে, আর ১ অপেক্ষা কম হইলে যান্ত্রিক অসুবিধা ঘটিবে। এখন কয়েকটি যন্ত্রের কাজ দেখা যাইবে।

নত সমতল (Inclined Plane)—তোমরা যদি পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়া থাক তবে দেখিয়া থাকিবে যে, পাহাড়ের উপর খাড়া ভাবে উঠার চাইতে ঢালু পথে উঠা অনেক সহজ। সেজন্য পাহাড়ের গাত্র দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ঢালু ভাবে রাস্তা তৈয়ারি করা হয়। বাড়ির একতলা হইতে



২৩নং চিত্র—পাহাড়ের উপর উঠা



২৪নং চিত্র—নত সমতল

দোতলায় সিঁড়ি দিয়া উঠিতে হয়। বিশেষ কারণে খাড়া মই দিয়াও উঠার প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু খাড়াভাবে উঠা কষ্টকর। আমরা পাহাড়ে উঠার রাস্তা এবং বাড়ির সিঁড়িকে যন্ত্র বলিতে পারি। কাঠের খুব মসৃণ একটি তক্তা বা একটি কাচের মোটা পাত অনুভূমিক না রাখিয়া কোনও কোণে নত রাখিলে তাহাকে নত সমতল বলা যায়। ছবিতে AC নত সমতল AB অনুভূমিক সমতলের সহিত CAB কোণ উৎপন্ন করিয়াছে। এখন যদি W ওজনের কোন বস্তুকে নত সমতলের সমান্তরাল ভাবে P বল প্রয়োগ করিয়া A বিন্দু হইতে C বিন্দু পর্যন্ত তোলা যায় তবে যে কাজ হইবে তাহার পরিমাণ হইবে—

$$\text{বল} \times \text{দূরত্ব} = P \times AC$$

এই কাজের ফলে W ওজনকে CB উচ্চতায় তোলা হইল। W ওজনকে খাড়াভাবে B বিন্দু হইতে C বিন্দুতে তুলিতে যে কাজ করা হইবে তাহার পরিমাণ $= W \times CB$.

যেহেতু এই দুই কাজের পরিমাণ সমান,

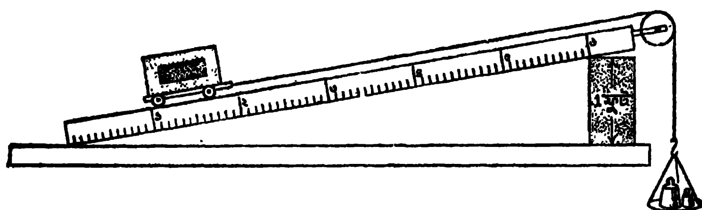
অতএব $P \times AC = W \times CB$

অথবা $\frac{W}{P} = \frac{AC}{CB}$

CB অপেক্ষা AC বড়। সুতরাং P অপেক্ষা W বড়। এজন্য নত সমতল দিয়া কম বল প্রয়োগ করিয়া বেশি ওজন তোলা যায়।

পরীক্ষা—এই নিয়মটি :একটি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা কর।

প্রায় ৭ ফুট লম্বা একটি মসৃণ তক্তার উপর ফুটের দাগ কাটিয়া তাহার এক মাথায় একটি কপি (Pulley) লাগাও। অপর প্রান্ত টেবিলের উপর বসাইয়া ৬ ফুটের দাগের নীচে ১ ফুট উঁচু একটি কাঠের ফলকের উপরের প্রান্ত রাখ। দুইটি বড় কাঠিম দিয়া একটি গাড়ি তৈয়ারি করিয়া তাহার উপর একটি ইট বসাইয়া সব এক সঙ্গে বাঁধ এবং তাহাদের ওজন নেও। মনে কর ইট ও তাহার গাড়ির ওজন ১০ পাউণ্ড। গাড়ির সঙ্গে একটি শক্ত সুতা বাঁধিয়া কপির উপর দিয়া ঘুরাইয়া নিয়া ঐ সুতার সঙ্গে একটি পাল্লা বাঁধ।



২৫নং চিত্র—নত তল নিয়া পরীক্ষা

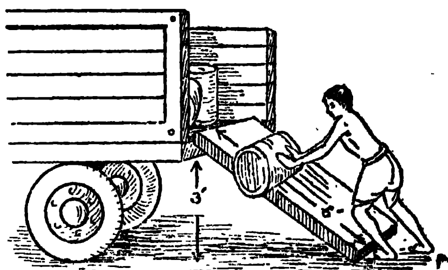
এখন পাল্লাতে কি ওজন দিলে গাড়ি সমেত ইটটি নত সমতলের উপর দিয়া আস্তে আস্তে উঠিতে পারে বাহির কর। নত সমতলের এই অবস্থানে প্রযুক্ত বল P হইল পাল্লার ওজন ও তাহার উপর স্থাপিত ওজনের যোগফল। এই ওজন ৬ ফুট নামিয়া ইটটিকে ১ ফুট উঁচুতে তুলিতে পারে। এবার কাঠের ফলকটি সরাইয়া ৫ ফুটের দাগের নীচে রাখ। নত সমতলটি আর একটু খাড়া হইল। এখন দেখ ওজন কত হইলে ইটটি আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠে। পাল্লাসহ ওজন এবার ৫ ফুট নামিলে ইটটি ১ ফুট উপরে উঠিবে। এভাবে কাঠের ফলকটি ৪ ফুট ও ৩ ফুট দাগের নীচে রাখিয়াও পরীক্ষা কর। প্রতিক্ষেত্রেই ১০ পাউণ্ড ওজনের গাড়িসহ ইটটিকে ১ ফুট

উপরে তোলা হইয়াছে এবং মোট কাজের পরিমাণ হইয়াছে ১০ ফুট-পাউণ্ড। পরীক্ষার ফল অনেকটা এইরূপ হইবে :

পর্যবেক্ষণ	পাল্লার ও তাহার উপরের ওজন (প্রযুক্ত বল)	প্রযুক্ত বলের অপসরণ	যান্ত্রিক সুবিধা ১০ পাউণ্ড / প্রযুক্ত বল
১	১.৭ পাউণ্ড	৬ ফুট	৫.৯
২	২.১ ”	৫ ফুট	৪.৮
৩	২.৬ ”	৪ ফুট	৩.৮
৪	৩.৪ ”	৩ ফুট	২.৯

তক্তাটি সম্পূর্ণরূপে মসৃণ হইলে যান্ত্রিক সুবিধা আর একটু বেশী হইত।

লরিতে মাল উঠানো—মাল গাড়ি বা লরির উপর ভারি পিপা তুলিতে হইলে খাড়াভাবে তোলা বিশেষ কষ্টকর। সেজন্য উহা একখানা কাত করা শক্ত তক্তার উপর দিয়া গড়াইয়া তোলা হয়।



২৬নং চিত্র—মাল উঠানো

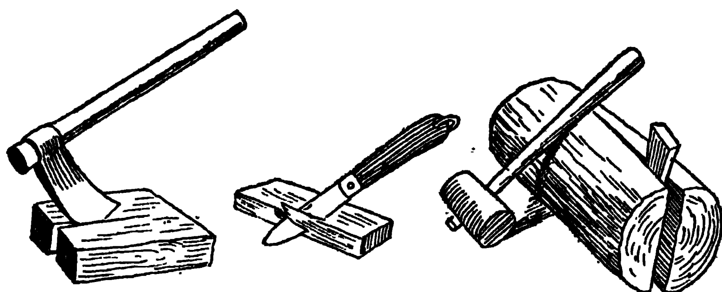
নততল দিয়া নীচে নামা—কোন কোন পার্কে ছেলেমেয়েদের খেলার জন্য লোহার নত তল রাখা হয়। পিছন হইতে সিঁড়ি দিয়া ঐ নততলের উপরে উঠিতে হয়। সেখান হইতে হাত-পা ছাড়িয়া ছেলেমেয়েরা গা ভাসাইয়া নামিয়া আসে।



২৭নং চিত্র—একটি মেয়ে নততল দিয়া নামিতেছে

কুঠার, ছুরি ও গোঁজ—কুঠার, ছুরি ও গোঁজের গোড়ার দিক মোটা এবং গোড়ার দুই দিক হইতে দুইটি সমতল ক্রমেই নত হইয়া সূক্ষ্মাগ্র রেখায় মিলিত হইয়াছে। বস্তুত এগুলি যেন দুইটি নততল পিঠে পিঠে

মিলিয়া যাওয়ার ফলে উৎপন্ন হইয়াছে। তোমরা বুঝিয়াছ নততলের উপর দিয়া কম বল প্রয়োগ করিয়া বাধা অতিক্রম করা যায়। যখন খানিক চেরা কাঠের ভিতর দিয়া গোঁজ ঢুকাইয়া দেওয়া হয়, তখন কাঠের দুই অংশকে দুই দিকের নততলের উপর দিয়া না ঠেলিয়া গোঁজকেই বিপরীত দিকে চালানো হয়; ফল ইহার একই হইয়া থাকে। যতটা বল প্রয়োগে কাঠের দুই অংশকে ফাঁক করা যাইত, তাহার চেয়ে কম বলেই গোঁজের সাহায্যে ফাঁক করা যায়।



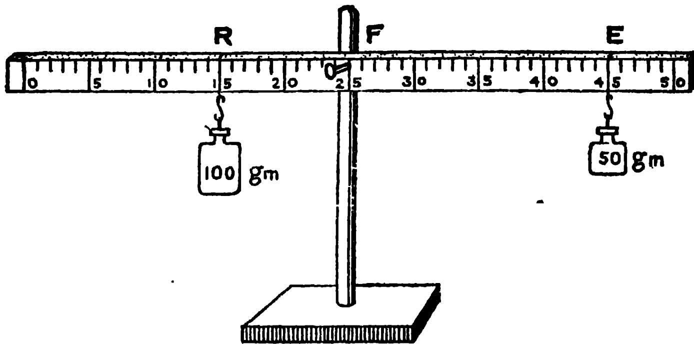
২৮নং চিত্র—কুঠার, ছুরি ও গোঁজ

কুঠার ও ছুরি কাঠের ভিতর এই একই প্রণালীতে সহজে ঢুকানো যায়। নততল ছাড়া কুঠার ও ছুরির আরও সুবিধা রহিয়াছে; তাহা হইল ইস্পাতে নির্মিত ধারাল মুখ।

লিভার (Lever)—ইহা একটি শক্ত দণ্ড। ইহা একটি স্থির বিন্দুকে অবলম্বন করিয়া উহার পাশে ঘুরিতে পারে। ঐ স্থির বিন্দুকে **আলম্ব বা ফালক্রাম (Fulcrum)** বলা হয়। লিভারটি দিয়া যখন কাজ করা হয় তখন তাহার এক বিন্দুতে কোন বস্তুর ওজন বা অন্য কোন প্রকারের বাধা (Resistance) ক্রিয়া করে। ফালক্রামের অন্য দিকে এক বিন্দুতে বল প্রয়োগ করিয়া সেই বাধা অতিক্রম করা হয়। ফালক্রাম, বাধা ও প্রযুক্ত বলের অবস্থান হিসাবে লিভার তিন প্রকার:

প্রথম শ্রেণীর লিভার—পরীক্ষা—আধ মিটার লম্বা একটি স্কেল লইয়া তাহার মধ্যবিন্দুতে ছিদ্র করিয়া পর পৃষ্ঠার চিত্রে প্রদর্শিত প্রণালীতে ইহা ঝুলাও। ইহার ফালক্রাম ২৫ সেন্টিমিটারের ঘরে। এখন ১৫ সে. মি. এর ঘরে ১০০ গ্রাম ওজন ঝুলাও। স্কেলটি সেদিকে হেলিয়া পড়িল। তাহার পর

ডান দিকে ৫০ গ্রাম ওজন এদিক সেদিক সরাইয়া দেখা গেল, ওজনটি যখন ৪৫ সে. মি. এর ঘরে থাকে তখন স্কেলটি ঠিক অনুভূমিক হয়। এখানে R হইল বাধা, আর E হইল প্রযুক্ত বল। ফালক্রাম হইতে বাধা ও প্রযুক্ত বলের দূরত্ব



২৯নং চিত্র—লিভারের পরীক্ষা—১ম শ্রেণী

যথাক্রমে a ও b অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ১০০ গ্রাম ওজনটির ফালক্রাম হইতে বাম দিকে ১০ সে. মি. দূরে থাকিয়া লিভারটিকে ঘুরাইবার যে প্রবণতা রহিয়াছে, ৫০ গ্রাম ওজনটির ডানদিকে ২০ সে. মি. দূরে থাকিয়া লিভারটিকে বিপরীত দিকে ঘুরাইবার সেই পরিমাণ প্রবণতা রহিয়াছে। এই সমান ও বিপরীতমুখী প্রবণতার ফলে লিভারটি না ঘুরিয়া অনুভূমিক থাকিবে। এই পরীক্ষা হইতে দেখিতে পাওয়া গেল—

১০০ গ্রাম × ১০ সে. মি. = ৫০ গ্রাম × ২০ সে. মি.

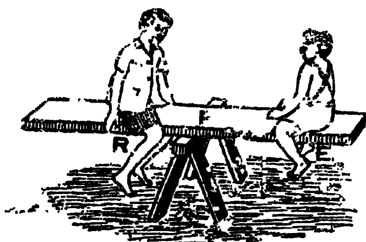
১০০ গ্রাম ওজনটি বিভিন্ন দূরত্বে রাখিয়া পরীক্ষা করিলেও অনুরূপ ফল পাওয়া যাইবে। এসব পরীক্ষার ফল এই ভাবে প্রকাশ করা যায় :—

$$Ra = Eb \quad or \quad \frac{R}{E} = \frac{b}{a}$$

যখন ফালক্রাম হইতে E এর দূরত্ব b, ফালক্রাম হইতে R এর দূরত্ব a অপেক্ষা বড় হয় তখন যান্ত্রিক সুবিধা $\frac{R}{E}$, ১ অপেক্ষা বড় হয়। এক্ষেত্রে কম বল প্রয়োগ করিয়া বেশি বাধা অতিক্রম করা হয়। a ও b সমান হইলে R ও Eর মূল্য একই হয়। ইহা দাঁড়ি-পাল্লার দৃষ্টান্ত। ইহার যান্ত্রিক সুবিধা ১ অর্থাৎ কোন সুবিধাও নয়, অসুবিধাও নয়।

যে লিভারে বাধা ফলিক্রামের এক দিকে এবং প্রযুক্ত বল

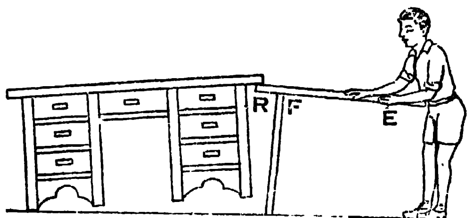
অন্যদিকে থাকে তাহাকে প্রথম শ্রেণীর লিভার বলে। প্রথম শ্রেণীর লিভারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে :



৩০নং চিত্র—খেলার ঢেঁকিকল

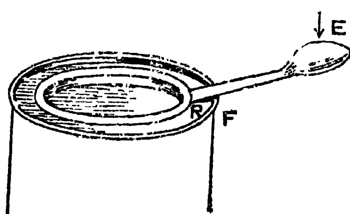
খেলার ঢেঁকিকল—একটি ছোট ছেলে কি করিয়া এই যন্ত্রের সাহায্যে তাহার চেয়ে ভারি আর একটি ছেলেকে অনুভূমিক অবস্থায় রাখিয়াছে বুঝাইয়া বল

টেবিল তোলা—একটা লাঠির এক প্রান্ত টেবিলের কিনারার নীচে রাখিয়া নিকটেই একটি খাড়া লাঠির উপর ইহার ভর রাখ।



৩১নং চিত্র—টেবিল তোলা

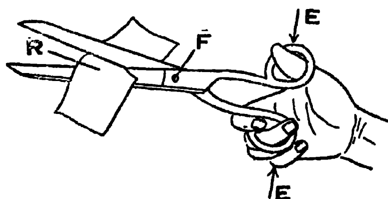
লাঠির অপর প্রান্তে চাপ দিয়া ইহা কেন সহজে উঠান যায় বল।



৩২নং চিত্র—কৌটার মুখ খোলা

কৌটার মুখ খোলা—চামচ দিয়া কৌটার মুখ খোলা একটা দৈনন্দিন ব্যাপার। ইহাও টেবিল তোলার মত।

কাঁচি দিয়া কাগজ কাটা—কাঁচি প্রথম শ্রেণীর ডবল লিভারের দৃষ্টান্ত। দুইটি ধারাল ফলক দুই দিক হইতে আসিয়া এক সঙ্গে বাধা অতিক্রম করে। ফলে সহজেই কাগজ কাটা যায়।

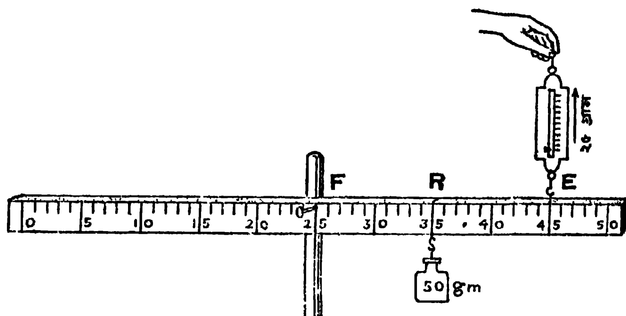


৩৩নং চিত্র—কাঁচি দিয়া কাগজ কাটা

দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার

—পরীক্ষা—৩৪নং চিত্রে প্রদর্শিত প্রণালীতে পরীক্ষা কর। এখানে বাধা ৫০ গ্রাম ১০ সে. মি. দূরে। লিভারটিকে

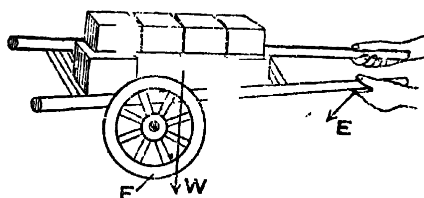
অনুভূমিক রাখার জন্য বল একটি স্প্রিং তুলার ভিতর দিয়া ২০ সে. মি. দূরে প্রযুক্ত হইল। তুলার মধ্যে ওজন বা টানের পরিমাণ ২৫ গ্রাম হইয়াছে।



৩৪নং চিত্র—লিভারের পরীক্ষা—২য় শ্রেণী

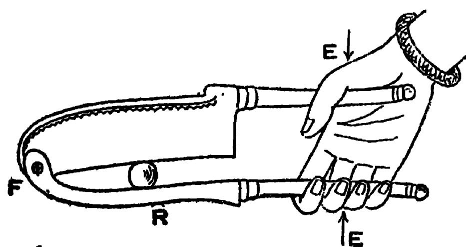
যান্ত্রিক সুবিধা $\frac{R}{E}=\frac{b}{a}$। এই শ্রেণীর লিভারে ফালক্রাম হইতে E, ফালক্রাম হইতে R অপেক্ষা দূরে থাকে অর্থাৎ b, a অপেক্ষা বড়। সেজন্য ইহাতে সর্বদাই যান্ত্রিক সুবিধা রহিয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারে ফালক্রাম এক প্রান্তে থাকে; অপর প্রান্তে বল প্রয়োগ করিতে হয়। বাধা এই দুই প্রান্তের মধ্যে থাকে। ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখ।



৩৫নং চিত্র—ঠেলা গাড়ি

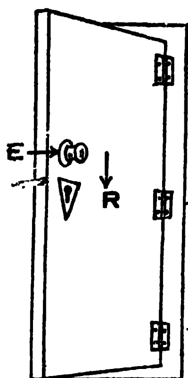
ঠেলা গাড়ি—ইহার ফালক্রাম চাকাতে। ইহা হইতে দূরে গাড়ি ও মালের ওজন W। প্রযুক্ত বল E অপর প্রান্তে আরও দূরে।



৩৬নং চিত্র—জাঁতি

জাঁতি—সুপারি কাটার জাঁতিতে এই ধরনের দুইটি লিভার যুক্ত রহিয়াছে।

দরজা—দরজার এক একটা পাল্লা বেশ ভারি, অথচ দ্বিতীয় লিভার কাজ করিতেছে বলিয়া ইহা সহজেই খোলা বা বন্ধ করা যায়। ফালক্রাম F চৌকাঠের সঙ্গে সংলগ্ন কব্জাতে; সেখানে ঘর্ষণের বাধাও রহিয়াছে। পাল্লার ওজন ইহার মধ্যভাগ দিয়া ক্রিয়া করিতেছে। এ অবস্থায় পাল্লার হাতলটি ফালক্রাম হইতে আরও দূরে থাকায় অল্প আয়াসেই দরজা খোলা ও বন্ধ করা যায়। কব্জার নিকটে পাল্লা ঠেলিয়া দরজা খুলিতে কেন কষ্ট হয়?



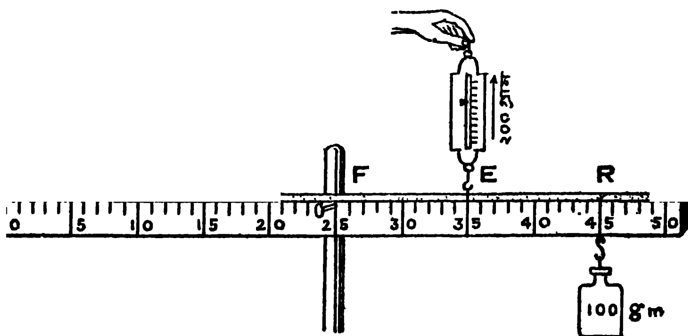
৩৭নং চিত্র—দরজা

তৃতীয় শ্রেণীর লিভার—পরীক্ষা—

এই পরীক্ষায় ২০ সে. মি. দূরে ১০০ গ্রাম ওজন ঝুলানো হইয়াছে। ১০ সে, মি. দূরে স্প্রিং তুলা আটকাইয়া তাহার ভিতর দিয়া বল প্রয়োগ করিয়া লিভারটি অনুভূমিক রাখা হইয়াছে। তুলাতে ওজন বা টান ২০০ গ্রাম হইয়াছে। ইহাতে যে যান্ত্রিক অসুবিধা রহিয়াছে তাহা সুস্পষ্ট।

যান্ত্রিক সুবিধা $\frac{R}{E}=\frac{b}{a}$

এই লিভারে a, b হইতে বড়। সুতরাং E সর্বদাই R হইতে বড় অর্থাৎ বেশি বল প্রয়োগ করিয়া কম বাধা অতিক্রম করিতে হয়।

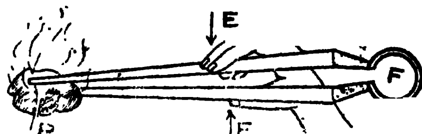


৩৮নং চিত্র—লিভারের পরীক্ষা—৩য় শ্রেণী

তৃতীয় শ্রেণীর লিভারে ফালক্রাম এক প্রান্তে এবং বাধা অপর প্রান্তে থাকে। ইহাদের মধ্যবর্তী স্থানে বল প্রয়োগ করিতে হয়।

এই শ্রেণীর লিভারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখ।

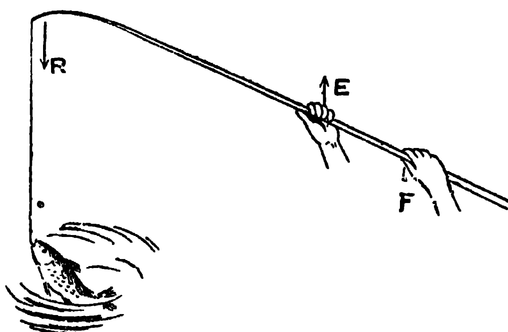
কয়লা তোলার চিমটা—উনান হইতে চিমটা দিয়া কয়লা তোলাতে কি সুবিধা-অসুবিধা ছবি দেখিয়া বল



৩৯নং চিত্র—কয়লা তোলার চিমটা

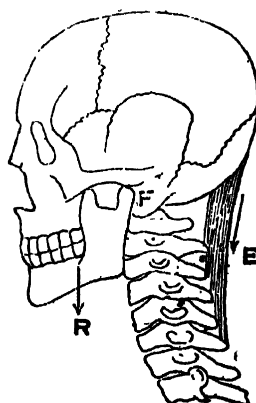
বড়শি দিয়া মাছ ধরার মধ্যে যে তৃতীয় শ্রেণীর লিভারের ক্রিয়া হইতেছে ছবি হইতে বুঝিবার চেষ্টা কর।

মানুষের দেহে লিভার—মানুষ নানা কাজের জন্য যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া থাকে তাহাতে লিভার রহিয়াছে তোমরা জানিলে। ইহা ছাড়া মানুষের নিজের দেহেও লিভার রহিয়াছে। সব সময় বিভিন্ন স্থানে কাজ করিবার জন্য বাহিরের লিভার বহন করা বিশেষ অসুবিধা-জনক।



৪০নং চিত্র—বড়শি দিয়া মাছ ধরা

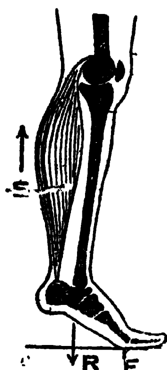
মানুষের মাথায় লিভার—ছবিতে মাথাটি এটলাস (atlas) নামক অস্থির উপরে বসা আছে। সেখানে উহার ফালক্রাম। মাথার ওজন সম্মুখের দিকে। পিছনের দিক হইতে মাংশপেশির নিম্নমুখী টানে মাথাটি ঠিকমত বসা রহিয়াছে। ইহা একটি প্রথম শ্রেণীর লিভার



৪১নং চিত্র—মাথার অবস্থিতি

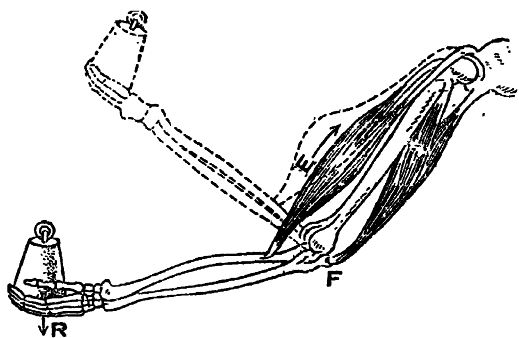
পায়ে লিভার—যখন গোড়ালি উপরে তোলা হয় তখন পায়ের

পাতার হাড়গুলি লিভারের কাজ করে। সম্মুখের দিকের হাড়ে ফালক্রাম রহিয়াছে। পায়ের পাতার মাঝামাঝি স্থান দিয়া দেহের ওজন নীচ দিকে ক্রিয়া করে। আর পায়ের পেছনের দিকের মোটা মাংসপেশিটি গোড়ালির হাড়টিকে উপরের দিকে টানিয়া তুলে। ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার। যান্ত্রিক সুবিধা বেশি বলিয়া ভারি দেহকে আমরা এভাবে সহজেই তুলিতে পারি।



৪২নং চিত্র—গোড়ালি উত্তোলন

হাতে লিভার—হাত দিয়া যখন একটি ওজন তোলা যায় তখন কনুইর সন্ধি (elbow joint) ফালক্রামের কাজ করে এবং মাংসপেশির টানে উপরের দিকে বল প্রযুক্ত হয়। পেশিটি শক্ত বন্ধনীর সাহায্যে কনুইর সন্ধির সম্মুখে হাড়ের সঙ্গে যুক্ত। এজন্য ইহা তৃতীয় শ্রেণীর লিভার। ইহাতে কোন যান্ত্রিক সুবিধা নাই। হাতের অগ্রভাগ দিয়াই জিনিস ধরিয়া তোলার সুবিধা। এই হিসাবে অন্য শ্রেণীর লিভার হাতের পক্ষে উপযোগী হইত না।

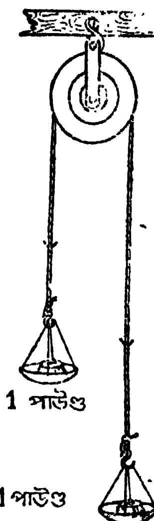


৪৩নং চিত্র—হাত দিয়া ওজন তোলা

কপিকল (Pulley)—পুলি বা কপিকলের সাহায্যে বারান্দার পর্দা উঠানো-নামানো হয়। ইহা কাঠের, লোহার বা পিতলের চাকাবিশেষ; ইহার পরিধিতে খাঁজ কাটা থাকে। এই খাঁজের উপর দিয়া দড়ি বা তার গলাইয়া দেওয়া যায়। এই চাকাটি একটি অক্ষের চারিদিকে ঘুরিতে পারে এবং অক্ষটি ব্লক নামক কাঠামোর সঙ্গে সংযুক্ত।

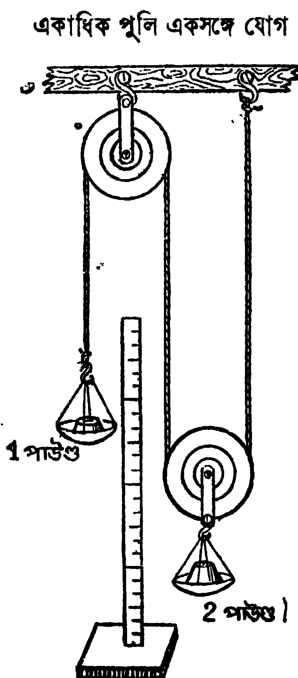
এই ব্লকটিকে কোন স্থানে আটকাইয়া দিলে কপিকল স্থির থাকে। তখন

ইহাকে **স্থির কপিকল** (Fixed Pulley) বলে। ছবিতে দেখ, একটি স্থির কপিকলের দুইদিকে সমান ওজন দেওয়ায় ওজন দুইটি স্থির রহিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় এরূপ কপিকলের এক দিকের ওজন টানিয়া ধরিতে হইলে সম পরিমাণ বলেরই প্রয়োজন। কাজেই ইহাতে যান্ত্রিক সুবিধা কিছুই নাই। কপিকলের সাহায্যে কূপ হইতে জল তোলা হয়। সরাসরি জল টানিয়া তুলিতে গেলে জলভরা বালতি উপরের দিকে টানিতে হয়। ইহা অসুবিধাজনক। পুলির উপর দিয়া দড়ি গলাইয়া আনিলে দড়িতে নীচ দিকে বল প্রয়োগ করিলেই চলে। ইহা সুবিধাজনক ; কারণ এ অবস্থায় হাতের টানের সঙ্গে দেহের ওজনও কিয়ৎ পরিমাণে যোগ করা যায়।



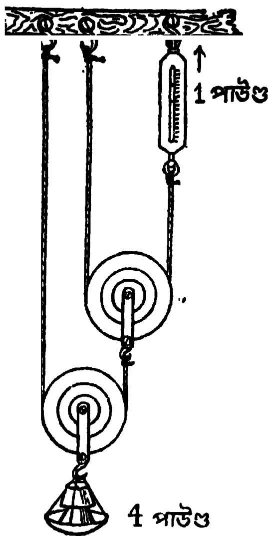
৪৪নং চিত্র—একটি স্থির কপিকল

একাধিক পুলি একসঙ্গে যোগ করিলে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়। পুলির ব্লক যখন আটকা না থাকে তখন তাহাকে **চলনশীল পুলি** (Movable Pulley) বলা হয়। চিত্রে একটি স্থির ও একটি চলনশীল পুলি দেখান হইয়াছে। চলনশীল পুলিতে ২ পাউণ্ড ওজন ঝুলানো আছে, অথচ ১ পাউণ্ড ওজনের সাহায্যেই তাহা উঠানো যাইতে পারে ; কারণ ২ পাউণ্ড ওজনের অর্ধেক ১ পাউণ্ড, রশির যে অংশটি হুকের সঙ্গে বাঁধা সেই অংশটি বহন করিতেছে। বাকী ১ পাউণ্ড রশির অপর অংশ (যাহা স্থির পুলির উপর দিয়া গিয়া বামদিকের পাল্লার সঙ্গে যুক্ত) বহন করে। যদিও এই পুলির সাহায্যে কাজ করার জন্য অর্ধেক বল প্রয়োগ করিতে হয় তথাপি মোট কাজের পরিমাণ একই থাকে। কারণ



৪৫নং চিত্র—একটি স্থির ও একটি চলনশীল পুলি

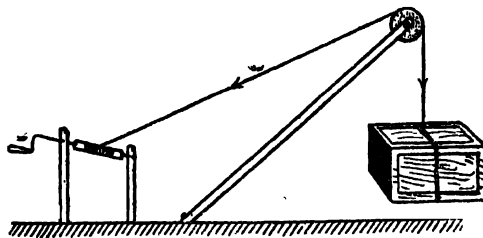
২ পাউণ্ড ওজনটি কিছুদূর তোলার জন্য ১ পাউণ্ড ওজনটি দ্বিগুণ দূরত্ব পর্যন্ত টানিয়া নিতে হয়। ২ পাউণ্ড ও ১ পাউণ্ড উভয় ওজনের দিকেই বল ও দূরত্বের গুণফল সমান।



৪৬নং চিত্র—দুইটি চলনশীল পুলি

এবার দুইটি চলনশীল পুলির ব্যবস্থা দেখ। ইহা দ্বারা ৪ পাউণ্ড ওজন এক পাউণ্ড বলের সাহায্যেই ধরিয়া রাখা হইয়াছে। এই পরীক্ষাগুলি হইতে দেখা গেল, একটি চলনশীল পুলিদ্বারা ওজন বহন করা বা উত্তোলন করার ব্যাপারে প্রযোজ্য বলের পরিমাণ অর্ধেক করা যাইতে পারে। একটি ৮ পাউণ্ড ওজন কিরূপে পুলির সাহায্যে এক পাউণ্ড বলপ্রয়োগ করিয়া তোলা যায় ছবি আঁকিয়া দেখাও। এই নীতি অনুসরণ করিয়া কতকগুলি পুলিকে যুক্ত করিবার বিভিন্ন পদ্ধতি রহিয়াছে।

ক্রেন (Crane)—ভারি মাল উঠানো-নামানোর জন্য ক্রেন নামক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। একটি সরল ক্রেন ছবিতে দেখানো হইল। যান্ত্রিক সুবিধার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির পুলি ক্রেনে ব্যবহার করা হয়।


৪৭নং চিত্র—ক্রেন দিয়া মাল তোলা

প্রশ্ন

১। সম বেগ, অসম বেগ ও ত্বরণ বলিলে কি বুঝায়? বাস্তব জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২। ভরবেগ কাহাকে বলে? কোন বস্তুর ভরবেগ বাড়াইবার ও কমাইবার উপায় কি?

৩। নিউটনের প্রথম গতিসূত্রটি বিবৃত করিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৪। দ্বিতীয় গতিসূত্রটি কি? ইহা হইতে কিরূপে বলের পরিমাণ পাওয়া যায়?

৫। তৃতীয় গতিসূত্রটি বিবৃত কর এবং বাস্তব জীবনে ইহার প্রয়োগের উল্লেখ কর।

৬। মহাকর্ষ কাহাকে বলে? অঙ্ক দ্বারা প্রকাশিত ইহার সূত্রটির ব্যাখ্যা কর।

৭। পৃথিবীর অভিকর্ষজ ত্বরণ সম্বন্ধে পূর্বে কি ভুল ধারণা ছিল? সেই ধারণা কি পরীক্ষা দ্বারা কে দূর করিয়াছিলেন?

৮। ভারি ও হালকা জিনিসের উপর অভিকর্ষজ ত্বরণ এক না ভিন্ন? কি পরীক্ষা দ্বারা ইহা ক্লাসের মধ্যে প্রমাণ করা যায়?

৯। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৌর-জগতের স্থান সংক্ষেপে বর্ণনা কর। গ্রহ ও নক্ষত্রের মধ্যে প্রভেদ কি?

১০। পৃথিবীর অভিকর্ষ না থাকিলে আমাদের জীবনযাত্রায় কি কি সুবিধা ও অসুবিধা হইত?

১১। ব্যবহারিক জীবনে অভিকর্ষের কয়েকটি যান্ত্রিক প্রয়োগের উল্লেখ কর।

১২। দোলকের দোলন-কালের সঙ্গে ইহার দৈর্ঘ্যের কি সম্বন্ধ?

১৩। সাধারণ তুলা ও স্প্রিং-তুলার গঠন বর্ণনা কর। ইহাদের দ্বারা কি ভাবে কি কাজ হয়?

১৪। ভর ও ওজনের মধ্যে তফাৎ কি? এই দুইটি কি ভাবে বাহির করা যায়?

১৫। কৃত্রিম চন্দ্র কিরূপে আকাশে তোলা হয়? কিরূপে ইহা অভিকর্ষ অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে পারে?

১৬। আকাশযানের সাহায্যে কিরূপে উপরে উঠা, পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা ও নামিয়া আসা যায় বল।

১৭। জোয়ার-ভাটা কাহাকে বলে? ইহাদের উৎপত্তির কারণ কি, ছবি আঁকিয়া বুঝাও।

১৮। কাজ কাহাকে বলে? ইহার সংজ্ঞাটি কি ভাবে প্রকাশ করা হয়?

১৯। কাজ ও শক্তির মধ্যে সম্বন্ধ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া বল।

২০। ক্ষমতা বলিলে কি বুঝায়? শক্তি বেশি হইলে ক্ষমতাও কি বেশি হইবে? না হইলে ইহার কারণ কি?

২১। অশ্ব-ক্ষমতা বলিলে কি বুঝ? ইহার পরিমাণ কি?

২২। শক্তির বিভিন্ন রূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণনা কর।

২৩। আমরা যে সব কাজ করি তাহাতে কি কি ভাবে কোন্ কোন্ বাধার সৃষ্টি হয় দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণনা কর।

২৪। কাজ করিবার বিভিন্ন বাধা কয় শ্রেণীর যন্ত্রের সাহায্যে অতিক্রম করা যায় দৃষ্টান্ত দ্বারা উল্লেখ কর।

২৫। যান্ত্রিক সুবিধা কাহাকে বলে? ইহা কি ভাবে প্রকাশ করিতে হয়?

২৬। যে ছবিতে লরিতে মাল উঠানো দেখানো হইয়াছে তাহার নত সমতলের যান্ত্রিক সুবিধা কি? (ছবিতে তক্তার দৈর্ঘ্য ও তাহার উচ্চতার মাপ দেওয়া আছে)।

২৭। লিভার কয় শ্রেণীর ও কি কি? কি হিসাবে তাহাদের শ্রেণিবিভাগ হইয়াছে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২৮। বাস্তব জীবন হইতে প্রত্যেক শ্রেণীর লিভারের অন্ততঃ দুইটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া সরল চিত্রের সাহায্যে তাহাতে আলম্বন, বাধা ও প্রযুক্ত বলের স্থান নির্দেশ কর। প্রত্যেক অবস্থার যান্ত্রিক সুবিধা-অসুবিধার উল্লেখ কর।

২৯। তৃতীয় শ্রেণীর লিভারের যান্ত্রিক অসুবিধা রহিয়াছে; তবে ইহাতে অন্য কোনরূপ সুবিধা আছে কি না দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া বল।

৩০। পুলি দ্বারা কিভাবে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায় চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর। পুলি দ্বারা কাজ করিবার জন্য কি সুবিধা আছে?

বিষয়গত প্রশ্ন (Objective Test)

উপরের প্রশ্নগুলি চলতি ধরনের। ইহাদের উত্তর অধিকাংশ ক্ষেত্রে রচনার সাহায্যে প্রকাশ করিতে হয়। কাজেই ঐ সব উত্তর পরীক্ষা করিবার সময় পরীক্ষক কখনও বা বিষয়বস্তুর জ্ঞানের চেয়ে ভাষাজ্ঞান ও রচনাভঙ্গির প্রতি বেশি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। সেজন্য বিষয়জ্ঞানের মূল্যমান সব সময় ঠিক হয় না। পরীক্ষাকে এইরূপ সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে চলতি ধরনের প্রশ্ন ছাড়া বিষয়গত প্রশ্নও (Objective Test) দেওয়া হইতেছে। এই শ্রেণীর প্রশ্ন দ্বারা বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানের মাত্রা সরাসরি ভাবে চিহ্নদানের ভিতর দিয়া বা দুই একটি শব্দের উল্লেখ দ্বারা জানিবার চেষ্টা করা হয়। বিষয়গত প্রশ্ন বহু ধরনের রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মাত্র তিন রকমের প্রশ্ন এখানে দেওয়া হইতেছে।

১। ঠিক উক্তি নির্বাচন (Selection of Right Statement)

নির্দেশ—নিম্নের প্রশ্নগুলির যেটির উত্তর 'হাঁ' হইবে তাহার পাশে 'হাঁ' এবং যেটির উত্তর 'না' হইবে তাহার পাশে 'না' — চিহ্নিত স্থানে লিখ।

(ক) যাহা প্রয়োগের ফলে কোন বস্তু সরিয়া যায় তাহাকে বল বলে কি? —

(খ) তুমি যখন দৌড়াও তখন তোমার পায়ের মাংসপেশি কি তোমাকে সম্মুখে ঠেলিয়া দেয়? —

(গ) মহাকর্ষের সঙ্গে অভিকর্ষের কোন সম্পর্ক আছে কি? —

(ঘ) শক্তির সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্ক আছে কি? —

(ঙ) নততলের সাহায্যে মোট কাজের পরিমাণ কমান যায় কি? —

(চ) যন্ত্র দ্বারা কাজ করিয়া আমরা শক্তি বাঁচাইতে পারি কি? —

২। শূন্যস্থান পূরণ (Completion of Gap)

নির্দেশ—নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে শূন্যস্থান পূরণ কর। ডান পাশে যে স্থান রহিয়াছে সেই স্থানে শব্দটি বসাও।

(ক) নিউটনের প্রথম গতিসূত্র হইতে আমরা বলের—(১) পাই। —(১)

দ্বিতীয় গতিসূত্র হইতে আমরা বলের — (২) পাই। —(২)

(খ) একটি বস্তুকে আর একটি বস্তুর উপর দিয়া কোনও একদিকে চালিত করিলে — (১) জনিত —(১)

বাধা তাহার—(২) দিকে ক্রিয়া করিয়া —(২)
বস্তুর গতি—(৩) দিবার চেষ্টা করে। —(৩)

(গ) আমাদের কাজ কঠিন হওয়ার কারণ

—(১) —(১)

—(২) —(২)

এবং —(৩) জনিত বাধা। —(৩)

৩। কয়েকটি উত্তরের মধ্যে ঠিক উত্তর নির্বাচন (Multiple choice)

নির্দেশ—নিম্নে যে উক্তিগুলি আছে উহাদের সমর্থনে কয়েকটি কারণ দেওয়া আছে। তুমি ইহাদের যেইটি ঠিক মনে কর তার পাশের শূন্যস্থানে সেই কারণটির অবস্থান-নির্দেশক (১), (২) বা (৩) লিখ।

(ক) ধূলিপূর্ণ ঝাড়ন ঝাড়িলে ধূলি দূর হয়। কারণ

(১) বল-প্রয়োগের ফলে ধূলি সরিয়া যায়।

(২) বল-প্রয়োগের ফলে ঝাড়ন সরিয়া যায়, আর ধূলি নিজ স্থানে থাকে।

(৩) বল-প্রয়োগে ঝাড়ন স্থানচ্যুত হয়, আর জাড্যবশে ধূলি স্বস্থানে থাকিয়া যায়।

(খ) দৌড়ের প্রতিযোগিতায় যে ছেলেটি প্রথম হইয়াছিল তাহার সবচেয়ে বেশি ছিল

(১) শক্তি

(২) ক্ষমতা

(৩) কাজের পরিমাণ

(গ) গ্রীক বৈজ্ঞানিক আর্কিমেডিস বলিয়াছিলেন, "আমাকে পৃথিবীর বাহিরে একটু স্থান দিলে আমি পৃথিবীটাকেই তুলিয়া ফেলিতে পারিব।" ইহার অর্থ—

(১) কিছুই না, বৈজ্ঞানিকের কল্পনা-বিলাস মাত্র।

(২) তিনি বাহিরে ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের সাহায্যে পৃথিবী তুলিয়া ফেলিতেন।

(৩) পৃথিবী হইতে ঐ স্থান পর্যন্ত একটা নীচু নততল বসাইয়া পৃথিবীকে ঠেলিয়া তুলিয়া ফেলিতেন।

আলোক (Light)

১

আলোকের প্রকৃতি

আলোকের সঙ্গে তোমাদের সকলেরই পরিচয় আছে। জন্মের পরই মানুষের মধ্যে আলোকের অনুভূতি জন্মে। পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আলোকের সাহায্যেই। চোখ মেলিলেই আমরা চারিদিকে নানা বস্তু ও ঘটনা দেখিতে পাই। কিন্তু কেবল চোখ থাকিলেই দেখা যায় না। অন্ধকার ঘরে চোখ মেলিয়া রাখিলে কোন জিনিসই দেখা যাইবে না। বস্তুর উপর যখন আলো পড়ে তখনই ঐ বস্তু আমরা দেখিতে পাই। কাজেই কোন জিনিস দেখিতে হইলে চোখ ও আলো উভয়ই দরকার। **যে বাহ্যিক কারণে আমাদের চক্ষুতে দর্শন-অনুভূতি জন্মে তাহাকে আলোক বলা যায়।**

আলোকের স্বরূপ—উপরের সংজ্ঞা হইতে কিন্তু আলোকের স্বরূপ বুঝা গেল না। বর্তমান যুগে নানা প্রকার রশ্মির (Rays) নাম শুনিয়া থাকিবে, যেমন এক্স-রশ্মি (X-Rays), অবলোহিত রশ্মি (Infra-red Rays) বা তাপরশ্মি, বেতার তরঙ্গ (Wireless Waves) প্রভৃতি। আলোকেরও সেইরূপ রশ্মি রহিয়াছে। এই সব বিভিন্ন রশ্মির মধ্যে আলোক রশ্মিকেই আমরা অতি সহজে, কোনরূপ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই অনুভব করিতে পারি। এই রশ্মিগুলির কতকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্য রহিয়াছে। সকলেই ঢেউয়ের আকারে প্রবাহিত হয়। ইহাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বিভিন্ন। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বলিলে একটি ঢেউ-এর উঁচু মাথা হইতে পরবর্তী ঢেউয়ের মাথা পর্যন্ত দূরত্ব বুঝায়। এক্স-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এক সেন্টিমিটারের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র, আলোকরশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এক সেন্টিমিটারের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ, উত্তাপরশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আরও বেশি, যেমন এক সেন্টিমিটারের এক শত ভাগের এক ভাগ। বেতার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য আরও বাড়িয়া ১০০০ মিটার পর্যন্ত হইতে পারে। তরঙ্গ মাত্রেরই একটা বেগ থাকে। তোমরা শুনিয়া বোধ হয় একটু অবাকই হইবে যে, এইসব অতি ক্ষুদ্র হইতে অতি বৃহৎ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তরঙ্গগুলি একই বেগে প্রবাহিত হয়, অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণীর রশ্মিরই গতি এক।

সেই বেগের পরিমাণ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার তিনশত ছাব্বিশ মাইল। এক জায়গায় একটি আলো জ্বলিলে একটি মাত্র সেকেণ্ড পার হইতে যে-সময় লাগে সেই সময় টুকুর মধ্যে আলো এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার তিনশত ছাব্বিশ মাইল দূরে গিয়া পৌছিবে। উত্তাপরশ্মি, বেতার রশ্মি এবং অন্যান্য রশ্মিও এই বেগেই চলিয়া থাকে। এই রশ্মিগুলি যদি তরঙ্গের আকারে চলিয়া থাকে তবে সেই তরঙ্গের মাধ্যম কি, অর্থাৎ কি বস্তুর ভিতর দিয়া তরঙ্গ প্রবাহিত হয় এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। তোমরা জান, পুকুরের জলে ঢিল ছুড়িলে যে ঢেউ উঠে তাহা জলের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। তোমরা পরে জানিবে, কোন জিনিসের দ্রুত কম্পনের ফলে শব্দের উৎপত্তি হয়। সেই শব্দ বায়ুর ভিতর দিয়া তরঙ্গের আকারে চারিদিকে বিস্তৃত হয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে বায়ুশূন্য স্থানে শব্দ-তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে পারে না। আমরা সূর্য হইতে তাপ ও আলোকরশ্মি পাই, যদিও সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যে পৃথিবীর চারিদিকে মাত্র কতকটা দূরত্ব পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল রহিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় তাপ ও আলোকরশ্মি বায়ুশূন্য স্থান দিয়াও চলিতে পারে। বায়ুশূন্য স্থান দিয়া অন্য কোন মাধ্যমের সাহায্য ছাড়া রশ্মির তরঙ্গ কি ভাবে চলিতে পারে বুঝা কঠিন। এজন্য বৈজ্ঞানিকগণ বহুকাল যাবত কল্পনা করিয়া আসিয়াছেন যে, আমরা যাহাকে শূন্য বা মহাশূন্য বলি তাহার মধ্যেও সর্বব্যাপী, স্থিতিস্থাপক এবং ইন্দ্রিয়াতীত ইথার (Aether) রহিয়াছে। এই অনুমানের ভিত্তিতে রশ্মি হইল ইথার তরঙ্গের গতীয় শক্তি।

বৈজ্ঞানিকদিগের মতে এই বিশ্বে যাহা কিছু রহিয়াছে তাহা হয় পদার্থ, না হয় শক্তি। এই বিচিত্র জগতে পদার্থ বা শক্তি ছাড়া অন্য কোনরূপে কিছুই থাকিতে পারে না। আলোকরশ্মি ইথারের তরঙ্গ, এই কথা মানিয়া নিলে আলোক যে শক্তি তাহা সঙ্গে সঙ্গেই প্রমাণিত হইয়া যায়। কিন্তু ইহা ছাড়া একটি নিরপেক্ষ প্রমাণেরও উল্লেখ করা যাইতেছে।

আলোক উৎপাদনের জন্য আমরা শক্তিই ব্যবহার করিয়া থাকি, আর কিছুই না। একটি বদ্ধমুখ বোতলের মধ্যে একটি ইলেকট্রিক টর্চ দীর্ঘকাল জ্বলিতে দেওয়ার পরেও খুব সূক্ষ্ম ভাবে ওজন করিয়া তাহার ভর কমিয়া যাওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহা হইতে বুঝা যায় টর্চের পদার্থ রূপান্তরিত হইয়া আলোতে পরিণত হয় না। টর্চের রাসায়নিক শক্তি

হইতেই আলোক উৎপন্ন হইয়াছে। কাজেই আলোক পদার্থ হইতে পারে না, ইহা শক্তি।

আলোক-শক্তি দিয়া কি কি কাজ হয়—যে কোন রকমের শক্তি হইতে কাজ পাওয়া যায়। আলোক-শক্তি হইতে কি কি কাজ পাওয়া যায় সংক্ষেপে তাহা বলা হইতেছে।

(১) আলোক-শক্তি আমাদিগকে দেখিতে সাহায্য করে।

(২) ফটোগ্রাফির প্লেটের উপর আলোক পড়িলে তাহা দ্বারা রাসায়নিক শক্তি উৎপন্ন হয় এবং রাসায়নিক শক্তি দ্বারা প্লেটের উপরের পদার্থের রূপান্তর ঘটে।

(৩) সূর্যের আলোক-শক্তির সাহায্যে গাছের পাতায় গাছের খাদ্য তৈয়ারি হয়।

(৪) কোন কোন পদার্থের উপর আলোক পড়িলে তাহাতে তড়িৎ উৎপন্ন হয়। টেলিভিসন (Television) যন্ত্র এই ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল।

আলোক-শক্তির পরিমাণ—একটি উজ্জ্বল আলোকের ধারাতে বেশ কিছু শক্তি রহিয়াছে। ১০০ ওয়াটের একটি ইলেকট্রিক ল্যাম্প এক ঘণ্টা জ্বলিলে যে পরিমাণ আলোক উৎপন্ন হয় তাহার শক্তি দ্বারা ১০ মন একটি ওজন ৬ ফুট উপরে তোলা যায়। এখন ভাবিয়া দেখ সূর্যের উজ্জ্বল আলোক হইতে প্রতিনিয়ত সমস্ত পৃথিবীর উপর কিরূপ অপরিমেয় শক্তি বর্ষিত হইতেছে।

আলোক অদৃশ্য—অন্যান্য শক্তি যেমন আমরা দেখিতে পাই না 'আলোক-শক্তিও আমরা দেখিতে পাই না; আলোক দ্বারা উদ্ভাসিত পদার্থ দেখি। অন্ধকার ঘরের দেওয়াল বা জানালার ছিদ্র দিয়া সূর্যের আলো আসিলে আমরা আলোকরশ্মি দেখিতে পাইলাম বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যাহা দেখি তাহা আলোক আসিবার পথ মাত্র। তাহার স্থান নির্দেশ করে আলোকের পথে ভাসমান ধূলিকণাসমূহ। যদি ঘরটিকে সম্পূর্ণরূপে ধূলিশূন্য করা যাইত (যাহা বাস্তব পক্ষে সম্ভবপর নয়) তবে ঘরে সূর্যালোক প্রবেশ করিলেও রশ্মির পথ দেখা যাইত না। মনে রাখিও, আমরা আলোক দেখিতে না পারিলেও কোন বস্তুর উপর আলোক পড়িলে যখন ঐ বস্তু হইতে আলোক আসিয়া আমাদের চোখের উপর পড়ে তখন আমরা ঐ বস্তুটিকে দেখিতে পারি।

আলোকের উৎস—(১) স্বাভাবিক উৎস—সূর্য ও তারকাসমূহ স্বপ্রভ এবং স্বাভাবিক আলোকের উৎস। ইহাদের মধ্যে সূর্যই পৃথিবীর নিকটে বলিয়া সূর্য হইতে আমরা যথেষ্ট আলোক পাইয়া থাকি। সূর্য ও তারকা হইতে আলোক পাইবার কারণ, তাহারা অতিশয় উষ্ণ। সূর্যের উষ্ণতা প্রায় ৬০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। উষ্ণতা সম্বন্ধে তোমরা পরে জানিতে পারিবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাপ-শক্তি হইতেই আলোক-শক্তির উদ্ভব হয়।

(২) কৃত্রিম উৎস—আদিম যুগে মানুষ যখন কাঠ পুড়াইয়া আগুন জ্বালাইতে শিখিল তখন তাহা হইতে তাপ এবং সামান্য আলোরও ব্যবস্থা হইল। আশি বৎসর আগে পর্যন্ত কোন না কোন জ্বালানি, যেমন উদ্ভিজ্জ, জান্তব বা খনিজ তৈল পুড়াইয়াই মানুষ আলোক উৎপাদন করিয়াছে। উদ্ভিজ্জ তৈল বলিলে সরিষা, রেড়ি প্রভৃতির তৈল, জান্তব তৈল বলিলে তিমি. সিল ও বড় বড় মাছের তৈল এবং খনিজ তৈল বলিলে কেরোসিন তৈল বুঝায়। তাপে ঐ সব তৈলের বাষ্প পুড়িলে তাহা হইতে তাপ ও আলোক দুই-ই পাওয়া যায়। কামারশালে লোহা উত্তপ্ত করিলে দেখিবে লোহাটি হইতে প্রচুর তাপ বাহির হইতেছে। ঐ লোহাতে আরও বেশি তাপ দিলে যখন তাহার উষ্ণতা প্রায় ৫০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয় তখন ইহা হইতে লাল আলো আসিতে থাকে। আরও তাপ দিতে থাকিলে ঈষৎ হলদে আলো বাহির হয় এবং সর্বশেষে সাদা আলো আসিতে থাকে। একটি স্টোভ জ্বালাইয়া রাখিলে উহার বার্নারে যে লোহার অংশ রহিয়াছে তাহা হইতে লাল আলো আসিতে দেখিবে। আলোক পাইবার সাধারণ উপায় হইল কোনও পদার্থকে খুব বেশি পরিমাণে উত্তপ্ত করিয়া সাদা করা। তৈল বা মোমবাতির শিখা হইতে আলোক পাওয়ার কারণ এই যে ঐ শিখার উত্তাপে সাদা, দীপ্তিশীল কার্বন কণিকা অসংখ্য পরিমাণে থাকে। এই ভাবে আলোক উৎপাদনে প্রথমে জ্বালানির রাসায়নিক শক্তি তাপ-শক্তিতে পরিবর্তিত হয় এবং পরে ঐ তাপ-শক্তির সামান্য অংশ (মাত্র পাঁচ-শত ভাগের এক ভাগ) আলোক-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

তড়িৎ আবিষ্কারের পর খুব সরু তারের ভিতর দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালাইয়া ঐ তারটিকে খুব বেশি উত্তপ্ত ও দীপ্তিশীল করিবার কৌশল আয়ত্ত করা হয়। একটি বাল্‌বের সরু তারের উষ্ণতা ২৫০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত

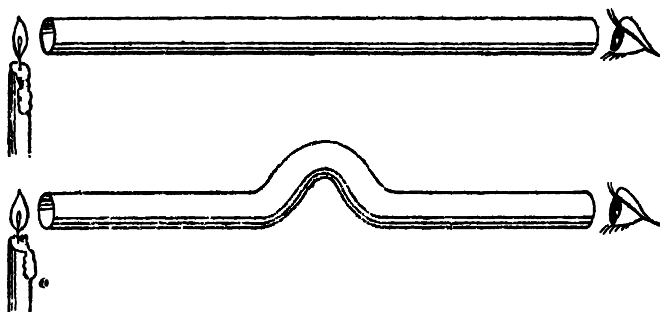
হইতে পারে। ফলে ইহাতে প্রচুর উত্তাপের সৃষ্টি হয়, আর সেই উত্তাপের প্রায় ষাট ভাগের একভাগ আলোক-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

আলোকের স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উৎসসমূহ **স্বপ্রভ** অর্থাৎ নিজেদের আলোতেই দীপ্তিশীল। ইহা ছাড়া **অপ্রভ** আলোক উৎসও রহিয়াছে। ইহারা নিজেরা আলোক উৎপন্ন করে না; অন্য স্বপ্রভ বস্তু হইতে পতিত আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া আলোক উৎসের মত দেখায়। গ্রহসমূহ, চন্দ্র ও পৃথিবীর অনেক বস্তু এই শ্রেণীর।

আলোকের গতি সরল রেখায়—ছায়া ও গ্রহণ

অন্ধকার ঘরের দেওয়াল বা জানালার ছিদ্র দিয়া আলোক আসিবার পথের বিষয় পূর্বে বলা হইয়াছে। তোমরা এই ব্যাপারে ইহাও লক্ষ্য করিবে যে ঐ পথটি সরল। ট্রেন, জাহাজ ও মোটর গাড়ির সম্মুখের সার্চ লাইট হইতে যে আলো বাহির হয় তাহাও সরল রেখায় যায় এরূপ দেখা যায়। এ বিষয়ে এখন দুইটি পরীক্ষা কর।

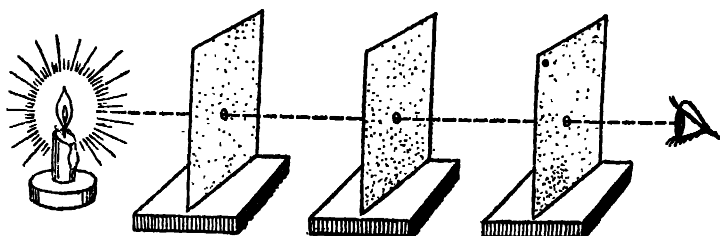
প্রথম পরীক্ষা—এক অংশে বাঁকা একটি নলের ভিতর দিয়া একটি মোম বাতির শিষ দেখিবার চেষ্টা কর; উহা দেখিতে পাইবে না।



৪৮নং চিত্র—আলোকের পথ সরল

বাঁকা নলটিকে সোজা করিয়া নিলে বা আর একটি সোজা নল নিলে উহার ভিতর দিয়া বাতির শিষ দেখা যাইবে। ইহাতে প্রমাণ হয় যে **আলোকের পথ সরল।**

দ্বিতীয় পরীক্ষা—তিনটি কাঠের বা পিস্‌-বোর্ডের পর্দার প্রত্যেকটির মধ্যে ঠিক একই উচ্চতায় একটি করিয়া সূক্ষ্ম ছিদ্র কর। পর্দাগুলিকে পর পর সাজাইয়া ইহাদের একপাশে ছিদ্রগুলির উচ্চতায় একটি মোম বাতি জ্বালাও। অপর পাশে চোখ রাখিয়া পর্দাগুলিকে আস্তে আস্তে এদিক সেদিক সরাও যেন ছিদ্রগুলির ভিতর দিয়া আলো দেখা যায়। এই অবস্থায় তিনটি ছিদ্রের ভিতর দিয়া একটি শক্ত সরু সুতা চালাইয়া দিয়া



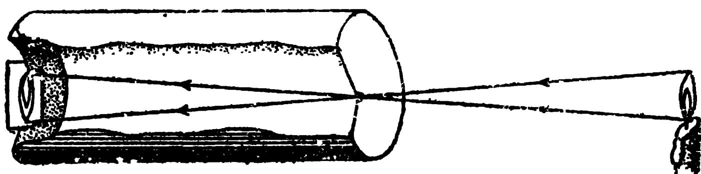
৪১নং চিত্র—আলোক সরল রেখায় চলে

সুতাটিকে টান করিয়া ধরা যাইবে। একটি বোর্ডও একটু সরাইলে ইহাদের ভিতর দিয়া আর আলো দেখা যাইবে না। সুতাও সেই অবস্থায় ছিদ্রের ভিতর দিয়া টান করিয়া ধরা যাইবে না। এই পরীক্ষা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, **আলোক সরল রেখায় গমন করে।**

এখানে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আলোক একই মাধ্যমের ভিতর দিয়া চলে ততক্ষণ পর্যন্তই তাহার গতিপথ সরল রেখা হইয়া থাকে। বায়ু ছাড়া কাচ, জল প্রভৃতির ভিতর দিয়াও আলোক চলিতে পারে। বায়ু হইতে কাচ বা জলে প্রবেশ করিলেই আলোর পথ বাঁকিয়া যায়; তবে ইহার নূতন গতিপথটিও সরল হয়। তোমরা এ বিষয়ে পরে আরও জানিতে পারিবে। আলোকের গতিপথ সম্বন্ধে আমরা এখন এরূপ বলিতে পারি: **কোন নির্দিষ্ট মাধ্যমের মধ্যে আলোক সরল রেখায় গমন করে।**

ছিদ্র-ক্যামেরা (**Pin-hole camera**)—আলোক সরল রেখায় চলে, এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া ছিদ্র বা পিন-হোল ক্যামেরা তৈয়ারি করা হয়। একটি চোঙ্গার এক দিকের মুখ ধাতুর পাতলা পাতে ঢাকা। ইহার মধ্যস্থলে স্টীলের ধারাল সূঁচ দিয়া একটি খুব ছোট ছিদ্র করিতে হয়। বিপরীত দিকের মুখ ঘষা কাচ বা টিস্যু পেপার দিয়া আবৃত। চোঙ্গার

ভিতরের দিকের দেওয়ালে কাল রং লাগাইয়া দিতে হয়। ইহাতে ভিতরে আলোর প্রতিফলন বন্ধ হয়। ছিদ্রের সম্মুখে একটি মোমবাতি থাকিলে ঘষা কাচ বা টিস্থ পেপারের পর্দার উপর তাহার উল্টা ছবি পড়িবে। বাতির শিখের উপরের বিন্দু হইতে আলোকরশ্মি সরল পথে ছিদ্রের ভিতর দিয়া পর্দার নীচ দিকে যাইবে। শিখের নীচ দিকের বিন্দু হইতে আলোক-রশ্মি সরল পথে পর্দার উপরের দিকে গিয়া পড়িবে। শিখের অন্যান্য অংশ হইতে আলোক ঐ দুই রশ্মির ভিতরে পড়িবে। এভাবে পর্দার উপর বাতির শিখের একটি সম্পূর্ণ উল্টা প্রতিবিম্ব পড়িবে। যদি পর্দার স্থানে ফটোগ্রাফির



৫০নং চিত্র—ছিদ্র-ক্যামেরা

প্লেট রাখা যায় তবে ক্যামেরার সম্মুখের বস্তুর ফটোগ্রাফ তোলা যাইবে। এইরূপ ক্যামেরাকে ছিদ্র-ক্যামেরা বা পিন-হোল ক্যামেরা বলে। যদি ক্যামেরার ছিদ্র বড় হয় তবে প্রতিবিম্ব অস্পষ্ট হইবে। কারণ একটি বড় ছিদ্রকে কতকগুলি ছোট ছিদ্রের সমষ্টি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। বিভিন্ন ছোট ছিদ্র হইতে উৎপন্ন স্পষ্ট প্রতিবিম্বগুলি পরস্পরের উপর পড়িয়া সমগ্র প্রতিবিম্বটিকে অস্পষ্ট করিয়া দিবে।

আলোকের বেগ—আলোকের বেগ সম্বন্ধে তোমাদিগকে পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,৩২৬ মাইল। সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব ৯,৩০,০০০০০ মাইল। সূর্য হইতে আলোক আসিয়া পৃথিবীতে পৌছিতে লাগে ৮ মিনিট ১৯ সেকেণ্ড।

শব্দ অপেক্ষা আলোকের বেগ দ্রুততর—তোমরা পরে জানিতে পারিবে শব্দ তরঙ্গের আকারে বায়ুর ভিতর দিয়া চলিয়া থাকে। সেই চলার বেগ সেকেণ্ডে ১,১২৬ ফুট বা ঘণ্টায় ৭৬৮ মাইল। শব্দের বেগ হইতে আলোকের বেগ ২৪৩ গুণ বেশি। ক্রিকেট খেলার সময় দূর হইতে লক্ষ্য করিলে দেখিবে ব্যাট দিয়া বলকে আঘাত করার একটু পরে শব্দ শোনা যায়। কারণ সুস্পষ্ট। বলকে আঘাত করার দৃশ্যের ছবি সেকেণ্ডে ১,৮৬,৩২৬

মাইল বেগে দর্শকের নিকট প্রায় তৎক্ষণাৎ চলিয়া যায়; কিন্তু আঘাতের শব্দটা সেকেণ্ডে ১,১২৬ ফুট বেগে পৌঁছিতে এক সেকেণ্ডের কতকাংশ সময় লাগিবে।

শব্দ ও আলোকের বেগের মধ্যে অত্যধিক মাত্রায় পার্থক্যের ফলে আকাশে বিদ্যুতের ঝলক দেখার কয়েক সেকেণ্ড পরে তাহা হইতে উৎপন্ন মেঘ-গর্জন শোনা যায়। দুইটি মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ-ক্ষরণ হইলে তাহার ঝলকের ছবি সেকেণ্ডে ১,৮৬,৩২৬ মাইল বেগে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে; কিন্তু বিদ্যুৎ-ক্ষরণের ফলে বায়ু অকস্মাৎ উত্তপ্ত ও প্রসারিত হওয়ায় যে প্রচণ্ড শব্দের সৃষ্টি হয় তাহা সেকেণ্ডে ১,১২৬ ফুট বেগে আসিয়া আমাদের কানে পৌঁছিতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগিয়া যায়। মনে কর, একটা বিদ্যুতের ঝলক দেখা যাওয়ার ৪ সেকেণ্ড পরে মেঘের গর্জন শোনা গেল। এস্থলে আলোর আসিতে প্রায় কোন সময়ই লাগে নাই ধরিয়া নিয়া মেঘের দূরত্ব ১,১২৬ ফুট × ৪ বা ৪,৫০৪ ফুট বলা যাইতে পারে।

ছায়া—আলোক সরল রেখায় চলে বলিয়া ইহার সম্মুখে কোন অস্বচ্ছ বস্তু রাখিলে বস্তুটির পশ্চাতে কতকটা স্থানে আলোক পৌঁছতে পারে না বলিয়া সেই স্থান অন্ধকারময় হইয়া থাকে। আলোক যদি বক্র পথে চলিতে পারিত, তবে বস্তুটির পিছনে গিয়া সেই স্থান আলোকিত করিতে পারিত। বস্তুর পশ্চাতের অন্ধকারময় স্থানকে তাহার ছায়া বলে। ছায়ার আয়তন ও প্রকৃতি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে:

(১) আলোক-উৎসের আকার।

(২) অস্বচ্ছ বস্তুর আকার।

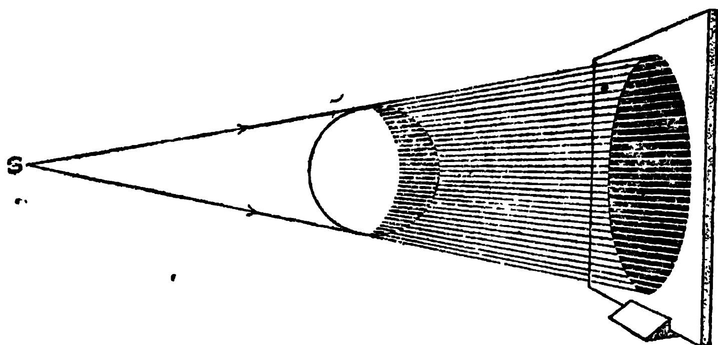
(৩) আলোক-উৎস হইতে অস্বচ্ছ বস্তুর দূরত্ব।

(৪) অস্বচ্ছ বস্তু হইতে যে পর্দায় উহার ছায়া পড়ে সেই পর্দার দূরত্ব।

নিম্নে কয়েক অবস্থায় ছায়া-সৃষ্টির বিষয় আলোচনা করা হইল।

(১) ক্ষুদ্র আলোক-প্রভব ও বিস্তৃত অস্বচ্ছ বস্তু—এখানে আলোক-প্রভব ক্ষুদ্র। একটি বলের ছায়া পর্দার উপর কিরূপ দেখায় লক্ষ্য কর। ইহা আকৃতিতে গোল, আকারে বল হইতে বড়। ছায়ার সব স্থানেই সমান অন্ধকার দেখায়। আলোক-প্রভব হইতে যে রশ্মি-গুলি বলের চারি ধার ঘেঁসিয়া গিয়া পর্দায় পড়িয়াছে ছায়া তাহাদের দ্বারা

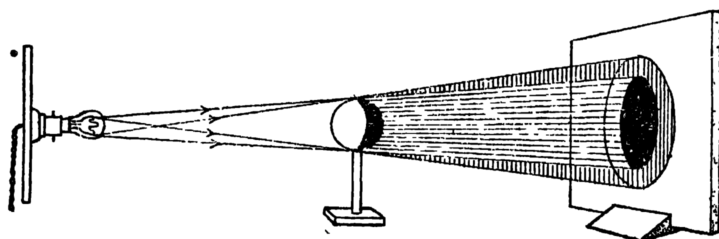
সীমাবদ্ধ। পর্দা দূরে সরাইলে ছায়াও আকারে বড় হয়। অস্বচ্ছ বস্তুটি



৫১নং চিত্র—ক্ষুদ্র আলোক-প্রভব ও বিস্তৃত বৃহত্তর অস্বচ্ছ বস্তু

আলোক-প্রভব হইতে দূরে নিলে ছায়া আকারে ছোট হইবে, আর কাছে নিলে ছায়া বড় হইবে।

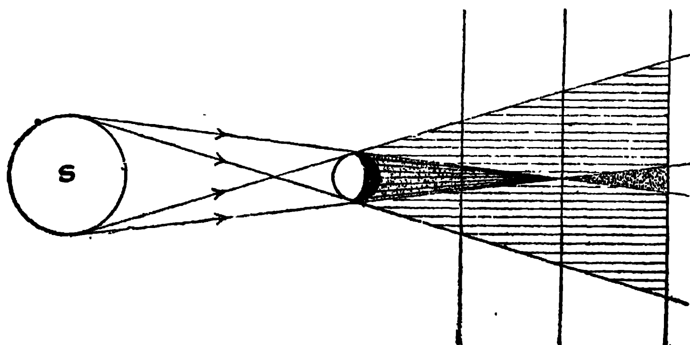
(২) বিস্তৃত আলোক-প্রভব ও বৃহত্তর অস্বচ্ছ বস্তু —মনে কর ইলেকট্রিক ল্যাম্প হইতে আলোক আসিতেছে। সম্মুখে ইহার চেয়ে বড় আকারের একটি অস্বচ্ছ বল। পর্দার উপরের ছায়া বড় ও গোল, কিন্তু ইহাতে দুইটি অংশ রহিয়াছে। মাঝের গোল অংশ ঘন কালো। ইহাকে **প্রচ্ছায়া** (Umbra) বলে। সেখানে আলোক-প্রভব হইতে কোন আলো আসিতে পারে না। **প্রচ্ছায়ার** চারিদিকের বলয়ের অংশে



৫২নং চিত্র—বিস্তৃত আলোক-প্রভব ও বৃহত্তর অস্বচ্ছ বস্তু

পাতলা ছায়া দেখা যায়। উহাকে **উপচ্ছায়া** (Penumbra) বলে। উপচ্ছায়ার মধ্যে ল্যাম্পের কোনো কোনো স্থান হইতে আলো আসিতে পারে বলিয়া সে স্থানের ছায়া হালকা। বল ও পর্দা যথাক্রমে আলোক-প্রভব হইতে দূরে নিলে প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়ার আকার কিরূপ হয় বুঝিতে চেষ্টা কর।

(৩) বিস্তৃত আলোক-প্রভব ও ক্ষুদ্রতর অস্বচ্ছ বস্তু—আলোক-প্রভব আকারে অস্বচ্ছ বস্তু হইতে বড় হইলে কিরূপ প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়ার সৃষ্টি হয় ছবিতে দেখ। এক্ষেত্রে পর্দাখানা অস্বচ্ছ বস্তুর নিকটে থাকিলে প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়ার আকার কিরূপ হয় লক্ষ্য কর। পর্দাখানা যতই দূরে সরান যায় প্রচ্ছায়া ততই আকারে ছোট হইতে থাকে, আর উপচ্ছায়া আকারে বড় হইতে থাকে। পরে পর্দার দ্বিতীয় স্থানে প্রচ্ছায়া আর থাকে না। সমস্ত ছায়াটি তখন উপচ্ছায়া। সেই অবস্থায় প্রচ্ছায়ার একটি শঙ্কু (Cone) গঠিত হয়। পর্দার তৃতীয় অবস্থানে ইহার উপরে যে উল্টা শঙ্কু গঠিত হয় সেখানে উপচ্ছায়া, কারণ সেই জায়গায় আলোক-প্রভবের বাহিরের দিক হইতে আলোক আসে, মধ্যভাগ হইতে আসে না। সেই উপচ্ছায়াতে অবস্থিত কোন ব্যক্তি আলোক-প্রভবের দিকে



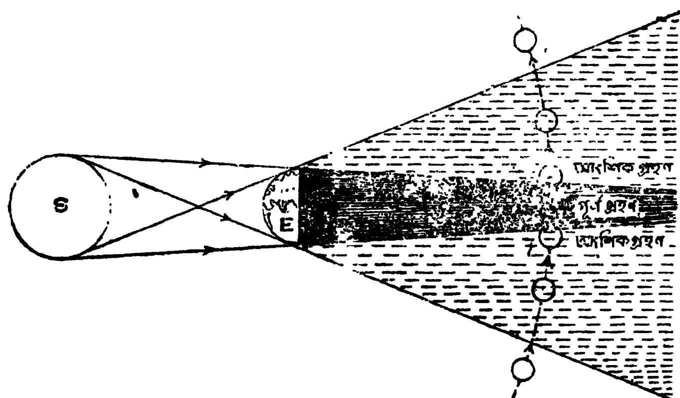
৫৩নং চিত্র—বিস্তৃত আলোক-প্রভব ও ক্ষুদ্রতর অস্বচ্ছ বস্তু

তাকাইলে সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ বস্তুটিকে এবং আলোক-প্রভবের মধ্যভাগের বৃহৎ অংশকে অন্ধকারাবৃত দেখিবে, কিন্তু ইহার চতুর্দিকে বলয়ের মত আলোকিত অংশ দেখিতে পাইবে। পর্দা আরও দূরে সরাইলে উপচ্ছায়ার আয়তন বৃদ্ধির ফলে উহাতে অন্ধকারের মাত্রা কমিতে থাকিবে। বহুদূরে পর্দার উপর আলো ও ছায়ার পার্থক্য বোঝা যাইবে না। এজন্য সূর্যালোকে বহু উপরের পক্ষী বা এরোপ্লেনের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়ে না।

গ্রহণ (Eclipse)—সূর্যই আকাশে সর্বাপেক্ষা দীপ্তিময় জ্যোতিষ্ক। পৃথিবী ও চন্দ্রের নিজস্ব আলোক নাই, তাহারা অস্বচ্ছ বস্তু। এই অস্বচ্ছ বস্তু দুইটি দ্বারা ছায়া-সৃষ্টির ফলে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হইয়া থাকে। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, আর চন্দ্র ঘুরিতেছে পৃথিবীর চারিদিকে। এই

ঘূর্ণনের ফলে যখন পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্রের মাঝে থাকে তখন পূর্ণিমা হয়; তখন পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়িয়া **চন্দ্রগ্রহণ** হইতে পারে। চন্দ্র যখন সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে থাকে তখন হয় অমাবস্যা; আর তখনই চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়িবার ফলে **সূর্যগ্রহণ** হইতে পারে। এই দুই গ্রহণ কি ভাবে ঘটিয়া থাকে নিম্নে তাহার আলোচনা করা হইল।

চন্দ্রগ্রহণ (Lunar Eclipse)—ইহা পূর্ণিমাতে ঘটিয়া থাকে। তখন পৃথিবী সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে থাকে এবং পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়িতে পারে। ছবিতে S দ্বারা সূর্য ও E দ্বারা পৃথিবীকে নির্দেশ করা হইতেছে। যখন চন্দ্র পৃথিবীর প্রচ্ছায়ার মধ্যে থাকিবে তখন



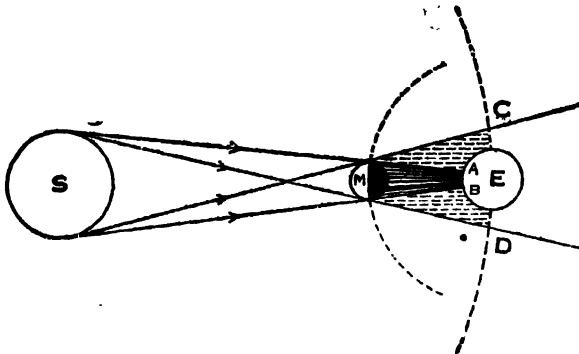
৫৪নং চিত্র—চন্দ্র গ্রহণ

উহাকে আর দেখা যাইবে না। তখন চন্দ্রের **পূর্ণগ্রাস গ্রহণ** (Total Eclipse) হয়। যদি চন্দ্রের কিছু অংশ প্রচ্ছায়া ও কিছু অংশ উপচ্ছায়া দ্বারা আবৃত হয় তবে চন্দ্রের **আংশিক গ্রহণ** বা **খণ্ডগ্রাস গ্রহণ** (Partial Eclipse) হয়। তোমরা বোধ হয় চন্দ্রগ্রহণ দেখিয়াছ। ইহা একই সময়ে পৃথিবীর অর্ধাংশ হইতে দেখা যায়। চন্দ্রগ্রহণের অবস্থান কাল ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট কাল পর্যন্ত হইতে পারে।

সূর্যগ্রহণ (Solar Eclipse)—ইহা অমাবস্যাতে ঘটিয়া থাকে। তখন চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে থাকে। সেজন্য চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়িতে পারে।

সূর্যগ্রহণ তিন রকমের হইতে পারে, যথা—(১) **পূর্ণগ্রাস গ্রহণ**, (২) **আংশিক** বা **খণ্ডগ্রাস গ্রহণ** ও (৩) **বলয়গ্রাস গ্রহণ**।

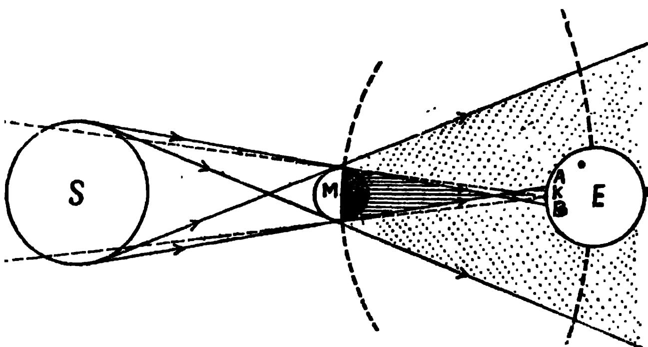
(১) পূর্ণগ্রাস গ্রহণ (Total Eclipse) ও **(২) আংশিক বা খণ্ডগ্রাস গ্রহণ** (Partial Eclipse)—ছবিতে দেখ, পৃথিবীর উপর চন্দ্রের প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া দুইই পড়িয়াছে। পৃথিবীর উপর A ও B স্থান



৫৫নং চিত্র—সূর্যগ্রহণ : পূর্ণ ও আংশিক

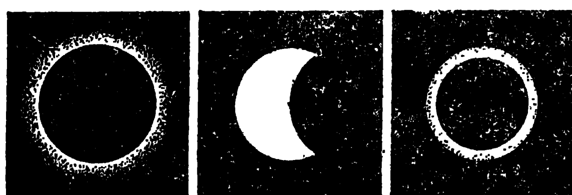
প্রচ্ছায়ার বাহিরের সীমায় রহিয়াছে। উপচ্ছায়া দুইদিকে C ও D পর্যন্ত বিস্তৃত। পৃথিবীর উপর A হইতে B পর্যন্ত বিস্তৃত প্রচ্ছায়া-অংশের লোক সূর্যের কোন অংশই দেখিতে পাইবে না। সেজন্য সেই অংশের লোকের নিকট সূর্যের **পূর্ণগ্রাস গ্রহণ** হইবে। পৃথিবীর উপরের উপচ্ছায়া-অঞ্চল হইতে সূর্যকে আংশিক ঢাকা দেখা যায়। সেজন্য সেখানে **আংশিক** বা **খণ্ডগ্রাস গ্রহণ** হয়। সূর্যের পূর্ণগ্রাস গ্রহণ খুব বেশি লোকে দেখে নাই। কারণ পৃথিবীর উপর চন্দ্রের প্রচ্ছায়ার স্থান খুব অল্পপরিসর। কোনও স্থানে পূর্ণগ্রাস গ্রহণ ১ হইতে ৭ মিনিট সময় পর্যন্ত অবস্থান করে।

(৩) বলয়গ্রাস গ্রহণ (Annular Eclipse)—পৃথিবী নিজ উপবৃত্ত



৫৬নং চিত্র—বলয়গ্রাস গ্রহণ

কক্ষে পরিভ্রমণ করে বলিয়া বৎসরে সব সময় চন্দ্র ও পৃথিবীর ভিতরকার দূরত্ব একরূপ থাকে না। এই দূরত্ব বাড়িয়া গেলে কখনও বা এমন হয় যে চন্দ্রের প্রচ্ছায়া পৃথিবীকে স্পর্শ করিবার পূর্বেই শেষ হইয়া যায়। তৎপরিবর্তে প্রচ্ছায়ার শঙ্কুটি বাড়াইলে উপচ্ছায়ার যে বিপরীত শঙ্কু উৎপন্ন হয় তাহা গিয়া পৃথিবীর উপর পড়ে। চিত্রে A ও B সেই উপচ্ছায়ার দুই দিকের সীমানা নির্দেশ করিতেছে। এই সীমানার মধ্যবর্তী K স্থানের লোক সূর্যের মাঝখানে অন্ধকারময় বৃত্তাকার অংশ ও তাহার চতুর্দিকে জ্যোতির্ময় বলয় দেখিতে পায়। এই ধরনের গ্রহণকে **বলয়গ্রাস গ্রহণ** বলে। এই গ্রহণ সচরাচর দেখা যায় না। পৃথিবীর আকার চন্দ্রের তুলনায় বহুগুণ বৃহৎ বলিয়া পৃথিবীর প্রচ্ছায়ার শীর্ষবিন্দু সর্বদাই চন্দ্রের কক্ষপথ ছাড়াইয়া যায়। এজন্য চন্দ্রের বলয়গ্রাস গ্রহণ সম্ভব নয়।



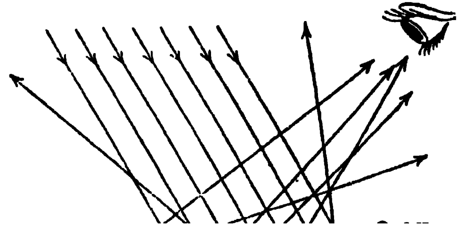
৫৭ নং চিত্র

সকল অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় কেন গ্রহণ হয় না—পৃথিবীর ও চন্দ্রের কক্ষপথ যদি একই তলে থাকিত তাহা হইলে চন্দ্র প্রতি অমাবস্যায় সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে আসিলে তাহার সূর্য ও পৃথিবীর সঙ্গে একই সরল রেখায় থাকিবার সম্ভাবনা হইত। ফলে প্রতি অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ হইত। আর প্রতি পূর্ণিমায়ও সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র এক সরল রেখায় থাকিবার সময় চন্দ্রগ্রহণ হইত। প্রতি মাসে একবার সূর্যগ্রহণ ও একবার চন্দ্রগ্রহণ না হওয়ার কারণ এই যে, পৃথিবীর কক্ষতল ও চন্দ্রের কক্ষতল এক নহে। এই দুই তলের মধ্যে প্রায় ৫ ডিগ্রির কৌণিক ব্যবধান রহিয়াছে। অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় যদি চন্দ্র ঐ দুই তলের ছেদ-রেখায় বা তাহার নিকটে থাকে তবেই গ্রহণ হইতে পারে।

সমতল দর্পণে আলোকের প্রতিফলন

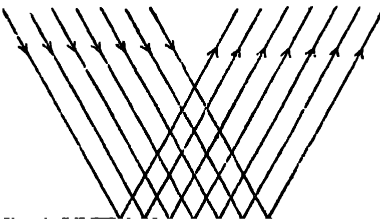
দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব তোমরা সকলেই দেখিয়া থাক। পুকুরের ধারে গাছ থাকিলে জলে উহার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। তোমরা দেখিয়াছ যে, পিন-হোল ক্যামেরার সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়া গিয়া আলোক কোনও বস্তুর উল্টা প্রতিবিম্ব গঠন করিতে পারে। সমতল দর্পণে কি করিয়া প্রতিবিম্বের উৎপত্তি হয় তাহাই এখন জানিতে পারিবে।

পরীক্ষা—(১) টেবিলের উপর তোমার বই রহিয়াছে। ইহার উপর আলো পড়িলে সেই আলো সব দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। ফলে যে-কোনও দিকে থাকিয়াই তুমি বইটি দেখিতে পাও। মনে কর, তুমি বইটি একটি আয়নার সাহায্যে দেখিবে। একটি ছোট আয়নার সম্মুখে তুই ফুট আন্দাজ দূরে বইটিকে রাখ। বই হইতে যে আলোকরশ্মি আয়নার উপর পড়িবে আয়না কি তাহা সব দিকে ছড়াইয়া দিবে? না। আয়না হইতে বিক্ষিপ্ত রশ্মি সব দিকে গেলে যে-কোনও দিক হইতে আয়নায় বইয়ের প্রতিবিম্ব দেখা যাইত। প্রতিবিম্ব মাত্র কোনও নির্দিষ্ট দিক হইতে দেখা যায়। ইহা হইতে বুঝা গেল, আয়না তাহার উপর আপতিত রশ্মির গতিপথকে কোনও নির্দিষ্ট দিকে ঘুরাইয়া দেয়। ইহাকে আলোকের **প্রতিফলন** বলে।



৫৮ নং চিত্র—কাগজের উপর হইতে বিক্ষিপ্ত আলোকরশ্মি



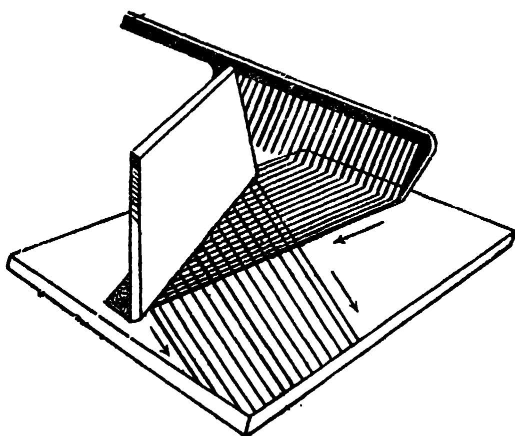


৫৯ নং চিত্র—আয়না হইতে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি

(২) বাহিরে দাঁড়াইয়া এক-খানা আয়নার সাহায্যে সূর্যের আলোক ঘরের ভিতর বিভিন্ন দিকে ফেলিবার চেষ্টা কর। এই-ভাবে আলোকের গতিপথ অন্য দিকে ঘুরাইয়া দেওয়া যায়। ইহাও আয়নার প্রতিফলনের দৃষ্টান্ত।

(৩) অন্ধকার ঘরে দেওয়ালের উপর এক স্থানে টর্চের আলো ফেল। একটি আয়নার সাহায্যে বিভিন্ন দেওয়ালে ইচ্ছামত স্থানে ঐ আলো ঘুরাইয়া ফেলিতে পারিবে। প্রতিফলিত আলোকের দিকে তাকাইলে চোখে ঐ রশ্মির তীব্রতা অনুভব করিবে। একখানা মোটা সাদা কাগজের সাহায্যে দেওয়ালের উপর আলো ফেলিবার চেষ্টা সফল হইবে না। আর কাগজের উপর টর্চের আলো পড়িলে ঐ কাগজ হইতে যে আলো বিক্ষিপ্ত হইবে তাহাতে তোমার চোখ মোটেই ঝলসাইবে না। ইহা হইতে বুঝা যায়, আয়নার মসৃণ তলের সাহায্যে আপতিত প্রায় সমস্ত আলোকরশ্মিকে ঘুরাইয়া একই দিকে চালিত করা যায়। কাগজের উপরিভাগ আলোকের অতিক্ষুদ্র তরঙ্গের তুলনায় অসমতল বলিয়া উহা দ্বারা রশ্মির গতিপথ একই দিকে ঘুরানো যায় না।

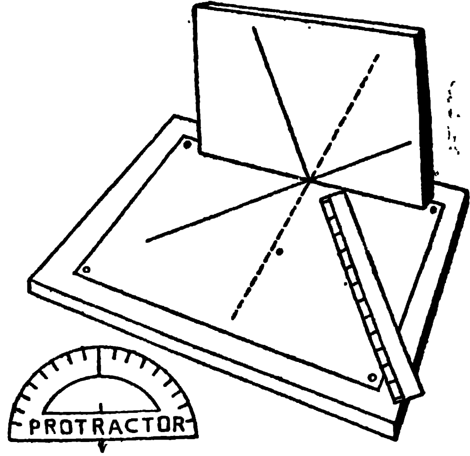
(৪) এবার আপতিত রশ্মি ও প্রতিফলিত রশ্মির দিকের সঙ্গে আয়নার তলের কি সম্পর্ক মোটামুটি জানিবার চেষ্টা কর। ঘরে বা বারান্দায় যেখানে রৌদ্র আছে সেখানে টেবিলের উপর সাদা কাগজ আঁটিয়া একখানা আয়না খাড়াভাবে ইহার উপর বসাও। আয়নার একপাশে একটি চিরুনি খাড়াভাবে রৌদ্রে ধর। ইহার ফাঁকের ভিতর দিয়া সূর্য-কিরণ আসিয়া আয়না হইতে প্রতিফলিত হইবে। কাগজের উপর পেনসিল দিয়া আপতিত ও প্রতিফলিত রশ্মির দিকে দাগ দাও। পরে চাঁদা দিয়া মাপিয়া দেখিবে আপতিত ও প্রতিফলিত রশ্মির দিক আয়নার নীচের কিনারার সঙ্গে বা আয়নার সমতলের সঙ্গে মোটামুটি একই কোণ গঠন করে।



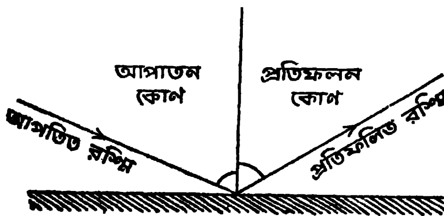
৬০ নং চিত্র—আয়না হইতে সূর্যকিরণের প্রতিফলন

(৫) এবার আরও সূক্ষ্ম একটা পরীক্ষা কর। ড্রইং বোর্ডের উপর একটি সাদা কাগজ লাগাইয়া ইহার উপর রুলারের সাহায্যে বিন্দু বিন্দু দিয়া একটি রেখা টান। তাহার পর ঐ রেখার সঙ্গে কোণ করিয়া একটি সরল রেখা

টান। দুইটি রেখা যেখানে মিলিত হইয়াছে সেখানে খাড়া করিয়া একটি ছোট আয়না বসাও। আয়নাটি ঘুরাও, যেন বিন্দু বিন্দু দিয়া আঁকা রেখা উহার প্রতিচ্ছবির সঙ্গে এক রেখায় থাকে। তখন ঐ রেখাটি আয়নার তলের সঙ্গে লম্ব ভাবে থাকিবে। এখন আয়নার দিকে তাকাইয়া সরল রেখার প্রতিচ্ছবির সঙ্গে একই সরল রেখায় রুলারের এক কিনারা রাখ এবং কিনারা ঘেষিয়া সরল রেখা টান। বিন্দু বিন্দু দিয়া আঁকা রেখার দুই দিকের কোণ চাঁদা দিয়া মাপ। আপতন কোণের মাপ বদলাইয়া পরীক্ষাটি কয়েক বার কর।



৬১নং চিত্র—প্রতিফলনের পরীক্ষা



৬২নং চিত্র—মসৃণ সমতলে প্রতিফলন

বুঝা যাইবে যে, আয়নার লম্বের সঙ্গে আপতিত রশ্মি যে কোণ গঠন করে প্রতিফলিত রশ্মি ও লম্বের সঙ্গে সেই কোণই উৎপন্ন করে। পাশের চিত্রে একটি রশ্মি লইয়া প্রতিফলন দেখানো হইয়াছে। **আপতিত রশ্মি** যে বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর পড়িয়াছে তাহাকে **আপতন-বিন্দু** বলে। আপতন-বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর একটি লম্ব টান; তাহাকে **অভিলম্ব** বলে। আপতিত রশ্মি অভিলম্বের সহিত যে-কোণ উৎপন্ন করে তাহাকে **আপতন-কোণ** বলে; আর **প্রতিফলিত রশ্মি** অভিলম্বের সহিত যে-কোণ উৎপন্ন করে তাহাকে **প্রতিফলন-কোণ** বলে।

পূর্বের পরীক্ষা হইতে এই দুইটি **প্রতিফলনের সূত্র** পাওয়া যায়:

প্রথম সূত্র—**আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন-বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করে।**

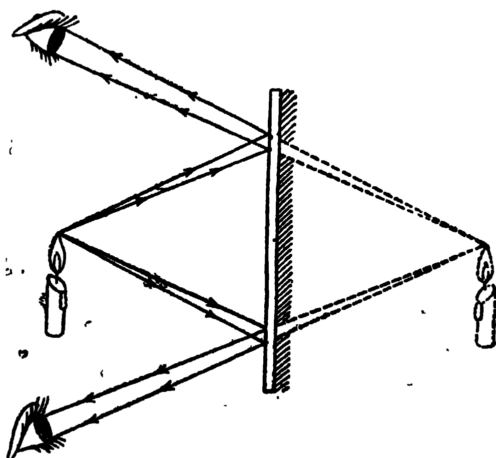
দ্বিতীয় সূত্র—**আপতন-কোণ সর্বদা প্রতিফলন-কোণের সমান হয়।**

আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি ও অভিলম্ব যে-সব সরল রেখাদ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহারা কাগজের একই সমতলে অবস্থিত। ইহা হইতে প্রথম সূত্র প্রমাণিত হইতেছে। দ্বিতীয় সূত্রটির সত্যতা তোমরা কোণ দুইটি মাপিয়াই বুঝিতে পারিয়াছ।

এই সূত্র দুইটি প্রমাণ করার জন্য বোর্ডের উপর দুই দুইটি পিন বসাইয়া আপতিত ও প্রতিফলিত রশ্মির দিক নির্দেশ করিয়া পরীক্ষা করার রীতি প্রচলিত রহিয়াছে। তোমরা সেই প্রণালী মতেও পরীক্ষা করিতে পার।

সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব—সমতল দর্পণে কি করিয়া প্রতিবিম্বের উৎপত্তি হয় এই প্রশ্ন প্রথমেই তোলা হইয়াছিল। আলোকের প্রতিফলনের সূত্রের সাহায্যে ইহার উত্তর বাহির করিবার চেষ্টা কর।

পরীক্ষা—সমতল দর্পণের সম্মুখে একটি মোমবাতি রাখা হইয়াছে। প্রথমে আলোকের উৎস হিসাবে বাতির শীর্ষ বিন্দুটি ধরিয়া লও। ইহা হইতে আলোকরশ্মি সরল রেখায় সব দিকে যাইবে। তাহার মধ্য হইতে দর্পণের উপরের দিকে পড়িয়াছে এরূপ মাত্র দুইটি রশ্মি বিবেচনা কর। রশ্মি দুইটি প্রতিফলনের সূত্রমতে প্রতিফলিত হইয়া চোখে পড়িবে। শীর্ষবিন্দু হইতে বাহির হইলেও রশ্মি দুইটির মধ্যে দূরত্ব ক্রমশই বাড়িয়া যাওয়ার পর তাহারা চোখে গিয়া পৌছিবে। চোখের উপর আপতিত

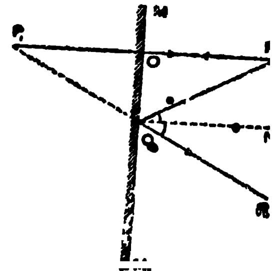


৬৩নং চিত্র—সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব

দুইটি অপসারী রশ্মির দিক দর্পণের পিছনে বাড়াইয়া দিলে তাহারা এক বিন্দুতে মিলিত হইবে। ফলে দর্শকের চোখে প্রতিফলিত রশ্মিদ্বয় পিছনে ঐ মিলন-বিন্দু হইতেই আসিয়াছে মনে হইবে। কারণ আমাদের দৃষ্টিপথ সরল রেখায় নিবদ্ধ। আমাদের চোখ আলোকরশ্মির দিক-পরিবর্তন অনুসরণ করিতে পারে না। এজন্য প্রতিফলনের পর আলোকরশ্মি সর্বশেষে যে সরল রেখা আমাদের চোখে আসিয়া পৌঁছে সেই সরল রেখার বর্ধিত অংশে একাধিক রশ্মির মিলন-বিন্দুতেই প্রতিবিম্ব দেখি। চোখটি নীচে রাখিলে অন্য এক জোড়া প্রতিফলিত রশ্মির সাহায্যে বাতির শিষের অগ্রভাগটি একই স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইবে। মোমবাতির যে-কোন বিন্দু হইতেই রশ্মি প্রতিফলনের সূত্রমতে প্রতিফলিত হইয়া একই প্রণালীতে চোখে পড়িবে। এভাবে দর্পণের সাহায্যে কোনও বস্তুর সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব গঠিত হইয়া থাকে।

তোমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, সমতল দর্পণের প্রতিবিম্ব যে স্থানে দেখা যায় সেই স্থান হইতে আলোক আসিতেছে বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত-পক্ষে আলোক সেই স্থান হইতে আসে না। যখন আলোক-প্রভব হইতে অপসারী রশ্মিগুচ্ছ দর্পণে প্রতিফলনের পর অন্য এক বিন্দু হইতে প্রতিফলিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়, তখন **অসদ্ বিম্বের** (Virtual Image) সৃষ্টি হয়। আর যখন কোন বিন্দু-আলোক-প্রভব হইতে অপসারী রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলনের পর প্রকৃতই আর কোন এক বিন্দুতে মিলিত হয় তখন **সদ্ বিম্বের** (Real Image) সৃষ্টি হয়। সদ্ বিম্বের সত্য সত্যই অস্তিত্ব আছে, আর অসদ্ বিম্বের কোন বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। সদ্ বিম্বের আলোচনা পরে হইবে।

সমতল দর্পণে প্রতিবিম্বের অবস্থান—MM_1 একটি সমতল দর্পণ। P উহার সম্মুখে অবস্থিত একটি বিন্দু-প্রভব, যেমন একটি আলপিনের মাথা। P হইতে PO রশ্মি অভিলম্ব পথে আপতিত হইয়া পুনরায় OP পথে অভিলম্ব ভাবে ফিরিয়া আসিবে। একটি হেলানো রশ্মি, যেমন PQ, QR পথে প্রতিফলিত হইয়াছে। সুতরাং $\angle PQN = \angle RQN$; এখানে QN দর্পণের উপর অভিলম্ব।



৬৪নং চিত্র—সমতল দর্পণে প্রতিবিম্বের অবস্থান

OP ও QR এই দুইটি প্রতিফলিত রশ্মি পিছনের দিকে বর্ধিত করায় P_1 বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। মনে হইবে প্রতিফলিত রশ্মি দুইটি P_1 বিন্দু হইতে আসিতেছে। এজন্য P_1 বিন্দু P বিন্দু-প্রভবের অসদ্ বিম্ব।

যেহেতু OP এবং QN সমান্তরাল

সুতরাং $\angle PQN = \angle QPO$

এবং একই কারণে $\angle NQR = \angle QP_1O$

আবার যেহেতু আপতন কোণ PQN = প্রতিফলন কোণ NQR

সুতরাং $\angle QPO = \angle QP_1O$

এবার OQP ও OQP_1 ত্রিভুজ দুইটি লও।

ইহাদের মধ্যে $\angle QPO = \angle QP_1O$,

$\angle QOP = \angle QOP_1$ (যেহেতু উভয়েই সমকোণ)

এবং QO সাধারণ বাহু।

সুতরাং ত্রিভুজ দুইটি সর্বসম।

অতএব PO বাহু $= P_1O$ বাহু। ইহা হইতে বুঝা যায় আলোক-প্রভব P দর্পণের সম্মুখে যতদূরে, প্রতিবিম্ব P_1 দর্পণ হইতে পিছনে ততদূরে এবং প্রভব ও প্রতিবিম্বের যোগরেখা দর্পণকে লম্বভাবে ছেদ করে। P বিন্দু হইতে হেলানো অন্য কোন রশ্মি নিলেও P_1 বিন্দুতেই পূর্বোক্ত প্রমাণ মতে প্রতিবিম্ব গঠিত হইবে। সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠনের ব্যাপারটি নিম্নের তথ্যগুলি দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে :

(১) সমতল দর্পণ হইতে প্রতিবিম্বের দূরত্ব সমতল দর্পণ হইতে বস্তুর দূরত্বের সমান।

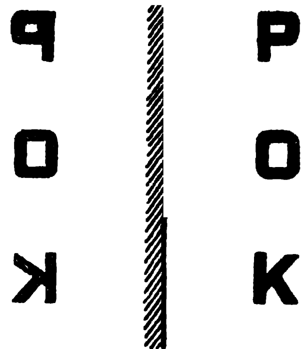
(২) বস্তু ও প্রতিবিম্ব সরল রেখাদ্বারা যোগ করিলে ঐ রেখা দর্পণকে লম্বভাবে ছেদ করে।

(৩) সমতল দর্পণের প্রতিবিম্ব অসৎ।

দর্পণে পাশের দিকে উল্টা প্রতিবিম্ব-গঠন

পরীক্ষা—একটি কাগজে P, O ও K লিখিয়া কাগজটি দর্পণের তলের সঙ্গে লম্বভাবে ধর। প্রতিবিম্ব ৬৫নং চিত্রে যেমন দেখানো আছে সেরূপ হইবে। তোমরা পূর্বে জানিয়াছ যে কোন বিন্দু দর্পণ হইতে যত দূরে তাহার প্রতিবিম্ব উল্টাদিকে ঠিক ততদূরে গঠিত হয়। এই নিয়ম অনুসারে P-এর মাথার

বামদিকের (যাহা দর্পণের কাছে রহিয়াছে) প্রতিবিম্ব দর্পণের কাছে আসিয়া পড়িবে। পাশের দিক দিয়া প্রতিবিম্ব উল্টা হইয়া যাওয়ার এই কারণ। O-এর প্রতিবিম্বে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না কেন?

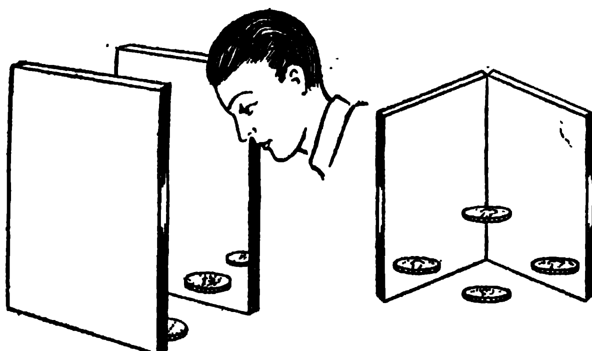


৬৫নং চিত্র—দর্পণে উল্টা প্রতিবিম্ব

লেখা কাগজটি দর্পণের তলের সঙ্গে সমান্তরাল করিয়া ধর। এবার সবগুলি লেখার দূরত্ব সমান, অথচ প্রতিবিম্ব পূর্বের মত উল্টাই হইল। ইহার কারণ এই: কাগজটা তুমি সমান্তরাল করিয়া ধরিবার সময়ই তাহার লেখা-দিক উল্টাইয়া ফেলিয়াছ। এজন্য এবারও উল্টা ছবি দেখিতেছ। তাহা বুঝিবার জন্য কাগজে বেশি কালি দিয়া দাগ কাটিয়া লিখ, যেন লেখাটা উল্টাপিঠে ভাসিয়া উঠে। এবার লেখাটা দর্পণের দিকে ধরিলে ঐটা তোমার দিক হইতে কেমন দেখাইবে কাগজের পিছনের লেখা দেখিয়া বুঝিতে পারিবে। তোমার দিক হইতে লেখা যেরূপ দেখাইত দর্পণে প্রতিবিম্ব ঠিক সেইরূপই দেখায়।

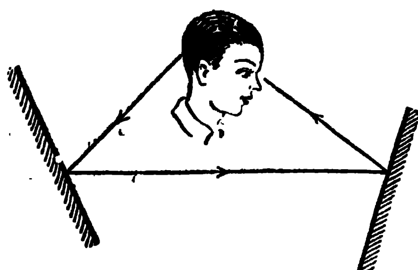
দর্পণে আমাদের ডান হাতকে বাম এবং বাম হাতকে ডান হাত বলিয়া মনে হয়, এই অভিজ্ঞতা তোমাদের রহিয়াছে। ডান হাত ও বাম হাতের আকৃতি একরূপই; আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে ইহাদের মধ্যে প্রভেদের সৃষ্টি হয়। ডান ও বাম করতল দেখ। ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ডান দিকে এবং বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি বাম দিকে থাকে। ইহাই হইল আমাদের অভিজ্ঞতা এবং ইহা দ্বারা আমরা ডান ও বাম হাত চিনি। এখন দর্পণের দিকে দুই করতল রাখ। ডান হাতের প্রতিবিম্ব ডানদিকে এবং বাম হাতের প্রতিবিম্ব বামদিকে পড়িবে; কিন্তু ডান করতলের প্রতিবিম্বে বৃদ্ধাঙ্গুলি বামদিকে এবং বাম করতলের প্রতিবিম্বে বৃদ্ধাঙ্গুলি ডান দিকে দেখাইবে। এজন্য আমরা ডান হাতকে বাম হাত এবং বাম হাতকে ডান হাত বলিয়া মনে করি। ইহাতে বুঝিবার বাকী রইল—প্রত্যেক করতলের প্রতিবিম্ব উল্টা হয় কেন? লেখা কাগজটি দর্পণের সঙ্গে সমান্তরাল করিয়া ধরিবার সময় যেমন আমরা লেখাটা উল্টাইয়া দেই, সেইরূপে করতলও আয়নার সম্মুখে উল্টাইয়া ধরা হয়।

একাধিক দর্পণে প্রতিফলন—একখানি দর্পণে কোন বস্তু হইতে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হওয়ার পর ঐ প্রতিফলির রশ্মি যদি আবার আর একখানা দর্পণে পড়ে তবে সেই স্থান হইতে প্রতিফলনের নিয়মে ঐ রশ্মির আবার প্রতিফলন হইবে। প্রথম আয়নার প্রতিবিম্ব দ্বিতীয় প্রতিফলনের সময় আলোকের উৎস হিসাবে গণ্য হইবে।



দুইখানি আয়না সমান্তরাল রহিয়াছে — ৬৬ নং চিত্র — দুইখানি আয়না কোণ করিয়া রহিয়াছে

ছবিতে দেখ দুইটি আয়না পরস্পর-সমকোণে আছে, আর তাহাদের মধ্যে একটি মুদ্রা রহিয়াছে। মুদ্রাটির তিনটি প্রতিবিম্ব হইবে। আয়না দুইটির মধ্যে কোণের পরিমাণ যতই কমাইবে প্রতিবিম্বের সংখ্যা ততই বাড়িবে। আয়না দুইটির মধ্যে যখন কোন কোণ থাকিবে না অর্থাৎ যখন তাহারা সমান্তরাল ভাবে থাকিবে তখন তাহাদের মধ্যে একটি মুদ্রার অসংখ্য প্রতিবিম্ব দেখা যাইবে। উল্টা দিকের দেওয়ালে দুইটি বড় আয়না সমান্তরাল ভাবে থাকিলে মাঝখানে বসিয়া অসংখ্য প্রতি-বিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

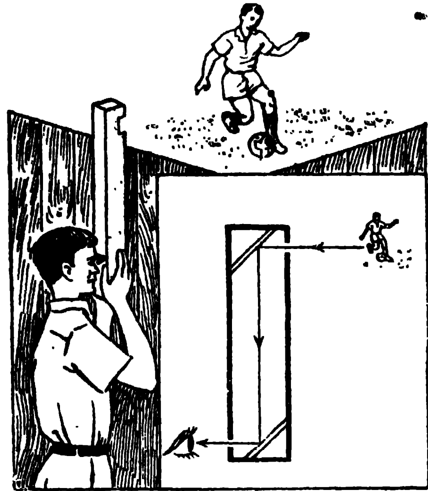


৬৭নং চিত্র—দর্পণের সাহায্যে মাথার পিছন দেখা

দর্পণের সাহায্যে মাথার পিছন দেখা—চুল কাটিবার সময় মাথার পিছন দেখিবার জন্য একটি দ্বিতীয় আয়না মাঝে মাঝে মাথার পিছনে ধরা হয়। মাথার পিছন হইতে আলোকরশ্মি কিভাবে

পিছনের ও সম্মুখের আয়নাতে প্রতিফলিত হইয়া চোখে প্রবেশ করে ছবিতে দেখ। ডান দিকে আর একটি আয়না ধরিলে তিনটি আয়নার সাহায্যে মাথার পিছন দিকের আরও বিস্তৃত অংশ ভাল রূপে দেখা যাইবে।

পেরিস্কোপ—দুইটি আয়না সমান্তরাল ভাবে পরস্পর মুখোমুখি করিয়া একটা কাঠের ফ্রেমে বা ধাতব নলে আটকানো থাকে। ফ্রেম বা নলটির দৈর্ঘ্যের সঙ্গে আয়না দুইটি ৪৫° ডিগ্রি কোণ করিয়া রাখা হয়। আয়না দুইটির সম্মুখ দিকে আলোক-প্রবেশ ও নির্গমনের পথ রহিয়াছে। আয়না দুইটিকে প্রয়োজন মত ঘুরাইবারও ব্যবস্থা আছে। ফ্রেমটিকে খাড়া অবস্থায় রাখিলে উঁচু স্থানের কোন বস্তু হইতে আলোক-রশ্মি আসিয়া প্রথমে উপরের আয়নায় পড়ে। সেখান হইতে ঐ রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া নীচের আয়নায় পড়ে। সেখানে দ্বিতীয় বার প্রতিফলিত হইয়া ঐ রশ্মি দর্শকের চোখে প্রবেশ করে; ফলে দর্শক বস্তুটির অসদ্ প্রতিবিম্ব দেখিতে পারে। কোন দূরের জিনিস সোজাসুজি দেখিতে বাধা থাকিলে এই যন্ত্রের সাহায্যে তাহা দেখা যায়।



৬৮নং চিত্র—পেরিস্কোপ দিয়া মাঠের বাহির হইতে খেলা দেখা

এই ধরনের পেরিস্কোপের সাহায্যে কলিকাতায় খেলার মাঠের দেওয়ালের পিছনে থাকিয়া বহুলোক ফুটবল খেলা দেখেন। উন্নত ধরনের পেরিস্কোপের সাহায্যে জলের নীচে সাবমেরিন হইতে জলের উপরের দৃশ্য দেখা হয়।

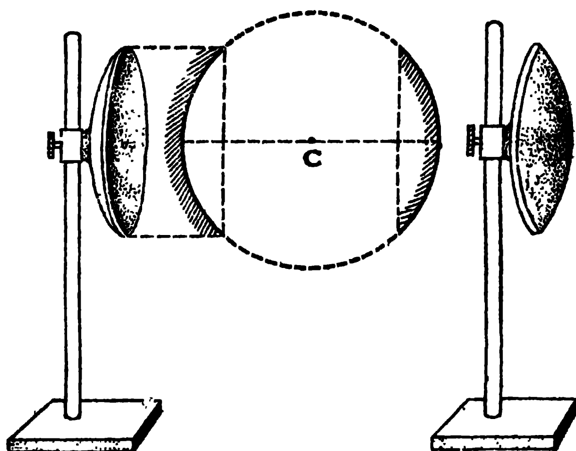
৪

গোলকাকার দর্পণে আলোকের প্রতিফলন

সমতল দর্পণে আলোকের প্রতিফলনের বিষয় তোমরা জানিয়াছ। দর্পণের পৃষ্ঠ সমতল না হইয়া গোলকাকার (Spherical) বা ডিম্বের মত বক্রাকৃতি হইতে পারে। একটা টর্চের ভিতরে বাল্‌বের পিছনে যে বক্রাকৃতি অংশটি রহিয়াছে তাহা খুলিয়া আনিয়া দেখ। ইহা ধাতুনির্মিত, ডিমের খোলার লম্বা দিকের মত বক্রাকৃতি এবং ইহার ভিতরের দিক কাচের দর্পণের মত মসৃণ বলিয়া চক্‌ চক্‌ করে। ইহা একটি বক্রাকৃতি দর্পণ। কাচের উপর রূপার প্রলেপ দিয়া দর্পণ তৈয়ারি হয়। ধাতুর পাত পালিশ করিয়াও দর্পণ তৈয়ারি করা যায়। টর্চের দর্পণটি খুলিয়া রাখিয়া টর্চটি জ্বালাও। বাল্‌বের আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। ফলে কোন দিকেই আলোর জোর আছে বলিয়া মনে হইবে না। দর্পণটি আবার টর্চের ভিতরে লাগাইয়া টর্চ জ্বালাও। এবার সম্মুখের দিকে আলোর উজ্জ্বল ধারা প্রবাহিত হইবে। ট্রেন ও মোটর গাড়িতে যে সার্চ-লাইট ব্যবহার করা হয় তাহাতেও বড় আকারের বক্রাকৃতি দর্পণ রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে এক নির্দিষ্ট স্থানে ইলেকট্রিক বাল্‌ব জ্বলিলে ইহার প্রায় সমস্ত আলোকরশ্মিই সম্মুখের দিকে সমান্তরাল ভাবে প্রতিফলিত হয়। ফলে সার্চ-লাইটের উজ্জ্বল ধারার সম্মুখে বহুদূর পর্যন্ত পথ আলোকিত হয়।

গোলকাকার দর্পণ (Spherical Mirror)—এখন আমরা গোলকাকার দর্পণে আলোক-প্রতিফলন সম্বন্ধে আলোচনা করিব। গোলকাকার দর্পণ একটা ফাঁপা গোলকের (Sphere) অংশ বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যায়। গোলক কাহাকে বলে বোধ হয় জান। একটি গ্লোব বা ফুটবলের উপরের প্রত্যেকটি বিন্দু যদি ইহার কেন্দ্র হইতে সমান দূরে থাকে তবেই ইহাকে গোলক বলা যায়। মনে কর একটি কাচের ফাঁপা গোলকের দুইদিকের অংশ ৬৯নং চিত্রে প্রদর্শিত ভাবে কাটিয়া বাম দিকের অংশে বাহিরের দিকে এবং ডান দিকের অংশে ভিতরের দিকে রূপার প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইলে বামদিকের অংশের ভিতরের দিক এবং ডানদিকের অংশের বাহিরের দিক মসৃণ ও চক্‌চকে

হইবে। এভাবে দুইটি গোলকাকার দর্পণ প্রস্তুত করা যায়। গোলকাকার দর্পণ দুই প্রকারের হইতে পারে। যে গোলকাকার দর্পণের ভিতরের দিক মসৃণ এবং সেদিক হইতে আলোকের প্রতিফলন হয় তাহাকে **অবতল দর্পণ** (Concave Mirror) বলে। আর যে গোলকাকার দর্পণের বাহিরের দিক

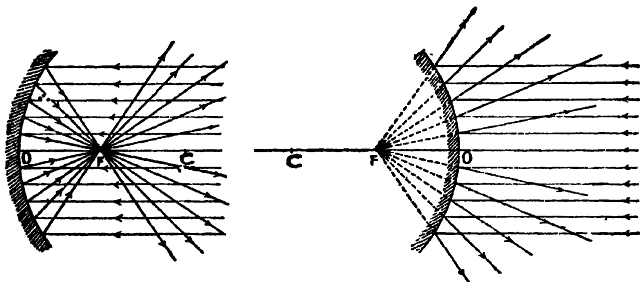


৬৯নং চিত্র—অবতল ও উত্তল দর্পণের গঠন

মসৃণ এবং সে দিক হইতে আলোকের প্রতিফলন হয় তাহাকে **উত্তল দর্পণ** (Convex Mirror) বলে। গোলক হইতে অংশ কাটিয়া অবতল বা উত্তল দর্পণ প্রস্তুত করা হয় না; অবতল বা উত্তল আয়নার পৃষ্ঠ গোলকাকার করিয়াই প্রস্তুত করা হয়।

গোলকাকার দর্পণের ফোকাস (Focus)—একটি ছোট অবতল দর্পণ লইয়া তাহার উপর খাড়া ভাবে সূর্যরশ্মি পড়িতে দাও। সূর্য এত দূরে যে রশ্মিগুলি সমান্তরাল ভাবে আসিয়া দর্পণের উপর পড়িতেছে ধরিয়া নেওয়া যায়। ঐ আলোকরশ্মি দর্পণ হইতে প্রতিফলনের পর একই বিন্দুতে অভিসারী হইয়া সূর্যের একটি অত্যুজ্জ্বল ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব গঠন করিবে। এক পাশ হইতে একটি ছোট কাগজের টুকরা সেখানে ধরিলে কাগজের উপর সূর্যের ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব ফেলা যাইতে পারে। ঐ বিন্দুটিকে **অবতল দর্পণের ফোকাস** বলে। **অবতল দর্পণের ফোকাসের বিম্ব সৎ।** উত্তল দর্পণের উপর সূর্যরশ্মি ফেলিলে দর্পণ রশ্মিগুলিকে এমন ভাবে চারিদিকে অপসারিত করিয়া দিবে যে মনে হইবে উহারা যেন দর্পণের ভিতরের একটি

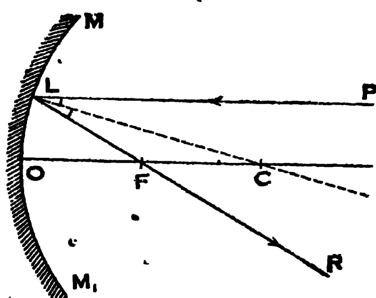
অত্যুজ্জ্বল বিন্দু হইতে আসিতেছে। সেই বিন্দু **উত্তল দর্পণের ফোকাস**। **উত্তল দর্পণের ফোকাসের বিম্ব অসৎ**। ছবিতে উভয় প্রকার দর্পণের ফোকাসই F বিন্দু দিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। দর্পণ যে-গোলকের



৭০নং চিত্র—অবতল ও উত্তল দর্পণের ফোকাস

অংশ বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যায় সেই গোলকের কেন্দ্র C-কে দর্পণের **বক্রতা-কেন্দ্র** (Centre of Curvature) বলে। দর্পণের মধ্যে O বিন্দুকে তাহার **মেরু** (Pole) বলে। মেরু হইতে ফোকাসের দূরত্বকে **ফোকাস-দূরত্ব** (Focal Length) বলে। বক্রতার ব্যাসার্ধ OC-কে দর্পণের **বক্রতা-ব্যাসার্ধ** (Radius of Curvature) বলে। বক্রতা-কেন্দ্র ও মেরুর সংযোগকারী সরল রেখা OC-কে **প্রধান অক্ষ** (Principal Axis) বলা হয়।

ফোকাস-দূরত্ব ও বক্রতা-ব্যাসার্ধের সম্পর্ক—



৭১ নং চিত্র—ফোকাস দূরত্ব ও বক্রতা-ব্যাসার্ধের সম্পর্ক

ছবিতে দেখ প্রধান অক্ষ OC-র সমান্তরাল PL রশ্মি দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া ফোকাস F-এর ভিতর দিয়া গিয়া LR রশ্মিতে পরিগণিত হইল। কারণ আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি রশ্মি দর্পণের অক্ষের সহিত সমান্তরাল ভাবে দর্পণের উপর পড়িলে তাহা ফোকাসের দিকে অভিসারী হইবে।

যেহেতু C বক্রতা-কেন্দ্র, CL রেখা L বিন্দুতে দর্পণের উপর লম্ব। প্রতিফলনের নিয়ম অনুসারে আপতন ∠PLC = প্রতিফলন ∠RLC.

যেহেতু LP ও OC সমান্তরাল এবং LC উহাদের ছেদ করিতেছে, সুতরাং $\angle PLC = \angle LCF$.

$$\angle RLC = \angle PLC = LCF.$$

FLC ত্রিভুজে $\angle FLC = \angle LCF$.

সুতরাং $FL = FC$

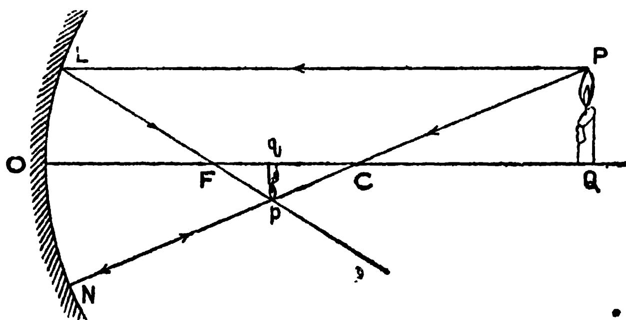
এখন L বিন্দু O-র খুব নিকটে অবস্থিত হইলে অর্থাৎ দর্পণের প্রতিফলন-তল আয়তনে ছোট হইলে FL ও FO সমান হইবে। কাজেই FO ও FC সমান হইবে এবং FO, OC-অর্ধেক হইবে

অর্থাৎ **ফোকাস-দূরত্ব বক্রতা-ব্যাসার্ধের অর্ধেক।**

উত্তল দর্পণের বেলায়ও এই জ্যামিতিক নিয়মের সাহায্যে প্রমাণ দ্বারা একই ফল পাওয়া যায়।

অবতল দর্পণ দ্বারা বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন—বস্তুর অবস্থানের উপর নির্ভর করিয়া অবতল দর্পণ সৎ বা অসৎ, বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর এবং সোজা বা উল্টা প্রতিবিম্ব গঠন করিয়া থাকে। নিম্নে বস্তুর বিভিন্ন অবস্থানে কিরূপ প্রতিবিম্ব গঠিত হয় অঙ্কনের সাহায্যে দেখান হইল।

(১) বস্তু দর্পণের বক্রতা-কেন্দ্র হইতে দূরে—বস্তুর উপরের P বিন্দু হইতে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশ্মি দর্পণ পর্যন্ত

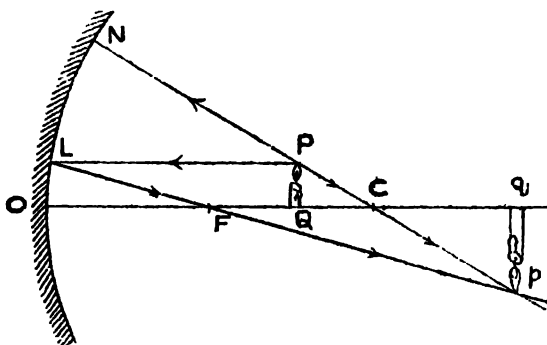


৭২নং চিত্র—বক্রতা-কেন্দ্র হইতে দূরে অবস্থিত বস্তুর প্রতিবিম্ব

টান। ইহা L বিন্দুতে দর্পণের উপর পড়িয়াছে। ঐ রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া ফোকাসের ভিতর দিয়া যাইবে। সেজন্য LF হইল প্রতিফলিত রশ্মি। বস্তুর ঐ একই বিন্দু P হইতে যে-রশ্মি কেন্দ্র C-এর ভিতর দিয়া লম্ব ভাবে দর্পণে গিয়া N বিন্দুতে পড়িবে: উহা সেই পথেই NCP রশ্মিরূপে ফিরিয়া

আসিবে। ঐ দুই প্রতিফলিত রশ্মি সত্যসত্যই p বিন্দুতে মিলিত হইবে। সুতরাং p বিন্দু, P বিন্দুর সদ্ বিম্ব। PQ বস্তুটি প্রধান অক্ষের সঙ্গে লম্ব ভাবে রহিয়াছে; আর বস্তুর নিম্ন বিন্দু Q প্রধান অক্ষের উপরেই আছে। এজন্য Q-র প্রতিবিম্ব পাওয়ার জন্য p হইতে প্রধান অক্ষের উপর লম্ব টান। উহা q বিন্দুতে প্রধান অক্ষকে ছেদ করিয়াছে। এই q-ই হইল Q এর প্রতি-বিম্ব, আর pq হইল বস্তুর প্রতিবিম্ব। **প্রতিবিম্ব সৎ, উল্টা ও ক্ষুদ্রতর।**

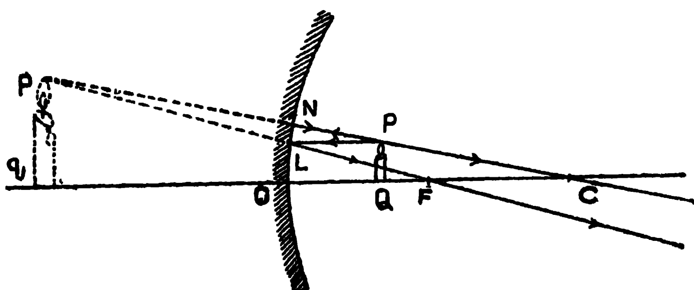
(২) বস্তু দর্পণের বক্রতা-কেন্দ্র ও ফোকাসের মধ্যে—এবার বস্তুটি দর্পণের দিকে সরাইয়া বক্রতা-কেন্দ্র ও ফোকাসের



৭৩নং চিত্র—বক্রতা-কেন্দ্র ও ফোকাসের মধ্যে অবস্থিত বস্তুর প্রতিবিম্ব

মধ্যে বসান হইল। পূর্বোক্ত নিয়মে প্রতিবিম্ব অঙ্কন করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে **প্রতিবিম্ব উল্টা ও বৃহত্তর।**

(৩) বস্তু দর্পণের মেরু ও ফোকাসের মধ্যে অবস্থিত—এবার PQ বস্তুকে দর্পণের দিকে আরও সরাইয়া মেরু ও

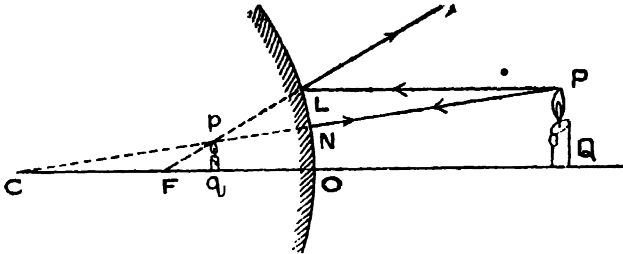


৭৪নং চিত্র—মেরু ও ফোকাসের মধ্যে অবস্থিত বস্তুর প্রতিবিম্ব

ফোকাসের মধ্যে রাখা হইল। পূর্বের নিয়মে প্রতিবিম্ব অঙ্কন করিতে গেলে

দেখা যাইবে প্রতিফলিত L F ও N P C রশ্মি দুইটি সত্যসত্যই মিলিত হয় না। কিন্তু পিছনে বর্ধিত করিলে এক বিন্দুতে মিলিত হইবে এবং ঐ মিলন-বিন্দু p হইতে রশ্মি দুইটি আসিতেছে এরূপ মনে হইবে। এক্ষেত্রে **প্রতিবিম্ব অসৎ, সোজা ও বৃহত্তর।**

উত্তল দর্পণ দ্বারা বস্তুর প্রতিবিম্ব-গঠন—বস্তু উত্তল দর্পণের সম্মুখে যে-কোন স্থানেই থাকুক না কেন ইহার আকৃতি, প্রকৃতি



৭৫নং চিত্র—উত্তল দর্পণের প্রতিবিম্ব

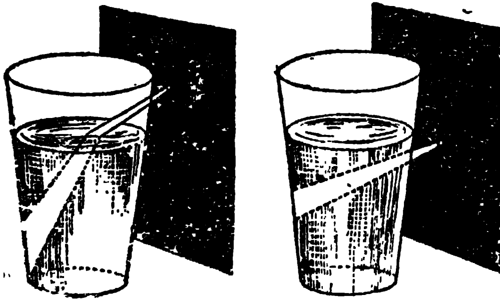
ও অবস্থান চিত্রে প্রদর্শিত একই প্রণালীতে অঙ্কন করিয়া পাওয়া যাইবে। L হইতে প্রতিফলিত রশ্মি ও N P রশ্মি দুইটি বাস্তবিক পক্ষে মিলিত হয় না, তবে পিছনে বর্ধিত করিলে মিলন-বিন্দু p হইতে ইহারা আসিতেছে এরূপ মনে হইবে। এক্ষেত্রে **প্রতিবিম্ব অসৎ, সোজা ও ক্ষুদ্রতর।** বস্তুর সব অবস্থানেই উত্তল দর্পণে এইরূপ প্রতিবিম্ব হয়।

একটি চক্‌চকে চামচের সম্মুখের দিক অবতল এবং পিছনের দিক উত্তল। সম্মুখ দিকে ইহার খুব নিকটে তোমার একটি আঙ্গুল বা একটি পেনসিল নিয়া ধর। সোজা ও বড় প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে। ইহা অবতল দর্পণ হইতে প্রতিফলনের পূর্ববর্ণিত তৃতীয় অবস্থা। এবার চামচের পিছন দিক তোমার সম্মুখে ধর। তোমার সোজা ও ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে। ইহা হইল উত্তল দর্পণ হইতে প্রতিবিম্ব গঠনের দৃষ্টান্ত। মোটর গাড়ির চালকের সম্মুখে উত্তল দর্পণ থাকে বলিয়া তাহাতে চালক রাস্তার পিছনের দিকের বিস্তৃত স্থানের প্রতিবিম্ব দেখিতে পান।

৫
আলোকের প্রতিসরণ (Refraction of Light)

একই রকমের স্বচ্ছ পদার্থে আলোকরশ্মি সরল রেখায় চলে। কিন্তু যখন আলোকরশ্মি কোন একটি স্বচ্ছ পদার্থের (যেমন বায়ুর) ভিতর দিয়া সোজা চলিতে চলিতে ভিন্ন প্রকৃতির স্বচ্ছ পদার্থের (যেমন জলের বা কাচের) মধ্যে প্রবেশ করে তখন সেখান হইতে উহা একটু বাঁকিয়া অর্থাৎ দিক পরিবর্তন করিয়া সরল রেখায় গমন করে। এক প্রকৃতির স্বচ্ছ পদার্থ হইতে ভিন্ন প্রকৃতির স্বচ্ছ পদার্থে প্রবেশ করিবার ফলে আলোকের এই যে গতিপথের পরিবর্তন হয় ইহার নাম **আলোকের প্রতিসরণ** (**Refraction of Light**)।

প্রতিসরণের পরীক্ষা—এক গ্লাস জলে তিন চার ফোঁটা দুধ মিশাইয়া জলটাকে ঘোলাটে কর। একখানা মোটা কালো কাগজের মধ্যে একটি ছোট ছিদ্র করিয়া উহা গ্লাসের সম্মুখে ধর, যেন এই ছিদ্রের ভিতর দিয়া রৌদ্রকিরণ গ্লাসের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। ছিদ্রটি যখন গ্লাসের জলের উপরের তলের ঠিক নীচে থাকে,

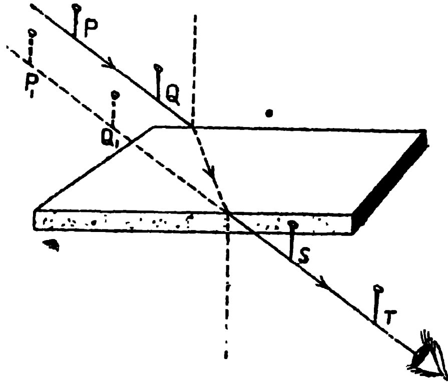


১৬নং চিত্র—বায়ুর মধ্য হইতে আলোকরশ্মি জলে প্রবেশ করিলে বাঁকিয়া যায়

তখন জলের ভিতরে আলোকরশ্মির পথ দেখ একই পদার্থ জলের ভিতর দিয়া যাওয়ায় ইহার পথ একটানা সোজা। এবার কাগজটি একটু তুলিয়া ধর যেন আলোকরশ্মি জলের উপরের তলে পড়ে। আলোকরশ্মি যেখানে বায়ু হইতে জলে প্রবেশ করে সেখানে নীচ দিকে বাঁকিয়া যায়। সেই প্রবেশের স্থানে জলের উপরের তলের সহিত যদি লম্ব টানা যায় তবে দেখা যাইবে আলোকরশ্মি জলে প্রবেশ করিয়া লম্বের দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে।

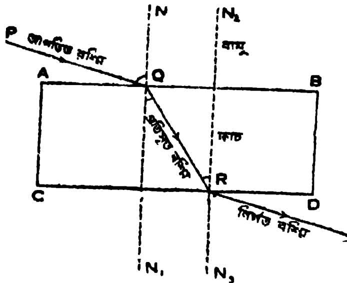
প্রতিসরণের সূত্র (**Laws of Refraction**)—বাস্তব জীবনে প্রতিসরণের নানা দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এগুলি বুঝিতে হইলে প্রতিসরণের সাধারণ নিয়মগুলি জানা দরকার। এইজন্য আর একটা পরীক্ষা কর।

পরীক্ষা—ড্রইংবোর্ডের উপর একখানা সাদা কাগজ পিন দিয়া আটকাও। কাচের একখানা আয়তাকার ফলক (Rectangular Block) কাগজের উপর রাখিয়া ইহার চারি কিনারা ঘেষিয়া কাগজের উপর রেখা টান। ফলকটির একদিকে দুইটি পিন P ও Q খাড়া ভাবে আটকাও। এখন P Q হইল **আপতিত রশ্মির** পথ।



৭৭নং চিত্র—প্রতিসরণ-সূত্রের পরীক্ষা

বিপরীত পার্শ্বে কাচের মধ্য দিয়া তাকাইয়া পিন দুইটির প্রতিবিম্ব P_1 ও Q_1-এর সঙ্গে একই সরল রেখায় S ও T পিন দুইটি খাড়াভাবে বসাও। পিনগুলি সরাইয়া তাহাদের অবস্থান পেনসিল দিয়া চিহ্নিত কর। কাচের ফলকটিও সরাইয়া লও। PQ এবং TS সরল রেখা দুইটি বাড়াইয়া দাও যাহাতে উহারা ফলকের কিনারায় চিহ্নিত সরল রেখা দুই দিক হইতে ছেদ করে। ছেদবিন্দু দুইটি যোগ করিলে যে সরল রেখা পাওয়া যাইবে তাহা হইল **প্রতিসৃত রশ্মির** পথ।



৭৮নং চিত্র—প্রতিসরণে রশ্মির পথ

ছেদবিন্দু দুইটিতে ফলকের কিনারার রেখার সঙ্গে লম্ব টান। আপতিত রশ্মি লম্বের সহিত যে কোণ উৎপন্ন করে তাহাকে **আপতন-কোণ** বলে। আর প্রতিসৃত রশ্মি লম্বের সহিত যে কোণ উৎপন্ন করে তাহাকে **প্রতিসরণ-কোণ** বলে।

৭৮নং চিত্রে $\angle PQN$ আপতন-কোণ, আর $\angle RQN_1$ প্রতিসরণ-

কোণ। কোণ দুইটি মাপিলে দেখা যাইবে আপতন-কোণ প্রতিসরণ-কোণ অপেক্ষা বড় বায়ু লঘুতর মাধ্যম ও কাচ ঘনতর মাধ্যম। সুতরাং দেখা যাইতেছে ঘনতর মাধ্যমে প্রতিসরণ-কোণ আপতন-কোণ অপেক্ষা ছোট হয়।

QR রশ্মিটি আবার কাচের ভিতর হইতে SR পথে বায়ুতে প্রতিসৃত হইয়াছে। এখানে আপতন-কোণ QRN_2 অপেক্ষা বায়ুতে প্রতিসরণ-কোণ SRN_3 মাপিলে বড় দেখা যাইবে। সুতরাং লঘুতর মাধ্যমে প্রতিসরণ-কোণ আপতন-কোণ অপেক্ষা বড় হয়।

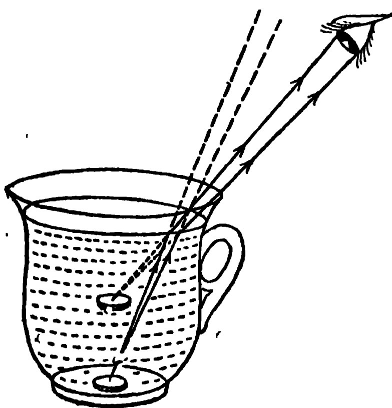
এই পরীক্ষা হইতে প্রতিসরণের দুইটি সূত্র পাওয়া গেল :

(১) যখন আলোকরশ্মি এক মাধ্যম হইতে অন্য মাধ্যমে যায় তখন প্রতিসরণ-কোণ আপতন-কোণ অপেক্ষা ঘনতর মাধ্যমে ছোট ও লঘুতর মাধ্যমে বড় হয়।

(২) আপতিত রশ্মি, প্রতিসৃত রশ্মি ও অভিলম্ব এক সমতলে থাকে।

পূর্বোক্ত পরীক্ষায় আপতিত রশ্মি, প্রতিসৃত রশ্মি ও লম্ব বোর্ডের উপর কাগজের তলে অবস্থিত ছিল। ইহা হইতে দ্বিতীয় সূত্রটি প্রমাণিত হইল।

প্রতিসরণের কয়েকটি সাধারণ দৃষ্টান্ত—আলোকরশ্মির প্রতিসরণের ফলে নানা কৌতুকপ্রদ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। তাহার কয়েকটি উল্লেখ করা যাইতেছে।

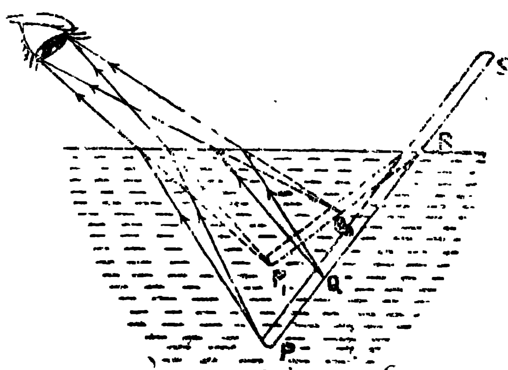


৩৯নং চিত্র—প্রতিসরণের ফলে অদৃশ্য মুদ্রা দেখা যাইতে পারে

(১) অদৃশ্য বস্তু দৃশ্য হওয়া—টেবিল বা বেঞ্চের উপর খালি কাপে একটা ৫০ পয়সার মুদ্রা রাখ। পেছনে হেলান দিয়া মাথা ঠিক রাখিয়া বস এবং ঐ মুদ্রার দিকে তাকাও। এখন কাপটি টেবিলের উপর রাখিয়া আস্তে আস্তে তোমার দিকে সরাইতে থাকে। মুদ্রাটি ঠিক যখন কাপের কানার আড়ালে পড়িয়া অদৃশ্য হইবে তখন কাপটি ঐ

স্থানে রাখ। এখন মুদ্রা হইতে আলোকরশ্মি তোমার চক্ষুতে প্রবেশ করিতেছে না, কারণ কাপের কানা রশ্মিকে আটকাইতেছে। পাত্রের ভিতর এখন অল্প অল্প করিয়া জল ঢালিয়া উহা জলে ভর্তি কর। প্রথম, মুদ্রার দূরের কিনারা, পরে আরও অংশ দেখা যাইবে। যে-রশ্মি মুদ্রা হইতে জলের ভিতর দিয়া কাপের কানা পর্যন্ত আসিবে তাহা বায়ুতে প্রবেশ করিয়া প্রতিসরণের ফলে নীচ দিকে বাঁকিয়া তোমার চক্ষুতে প্রবেশ করিবে। কোন বস্তু হইতে আলোকরশ্মি প্রতিফলন বা প্রতিসরণের ফলে যে-পরিবর্তিত পথে চোখে প্রবেশ করে সেই পথেই বস্তুটিকে দেখা যায়। সেই কারণেই মুদ্রাটি পরিবর্তিত পথে উপরে দেখা যাইবে।

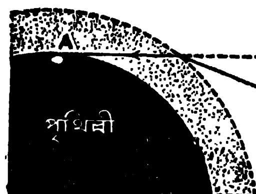
(২) **বস্তুর আকৃতির পরিবর্তন**—একটি লাঠির কতক অংশ জলে ডুবানো থাকিলে জল ও বায়ুর সংযোগস্থলে লাঠিটা যেন বাঁকিয়া গিয়াছে এরূপ দেখা যায়। পূর্বের পরীক্ষা হইতে জানিয়াছ যে প্রতিসরণের ফলে জলের নীচের বস্তু একটু উপরে দেখা যায়। লাঠিটার নীচ প্রান্ত P বিন্দুর প্রতিবিম্ব একটু উপরে P_1 বিন্দুতে দেখা যাইবে। সেইরূপ লাঠিটির Q বিন্দু আর একটু উপরে Q_1 বিন্দুতে দেখা যাইবে। ফলে লাঠিটির নিমজ্জিত অংশ P_1Q_1R রেখায় আছে বলিয়া মনে হইবে। লাঠির যে অংশ জলের উপর আছে তাহা যথাস্থানে ঠিকই দেখা যাইবে। সেই কারণে লাঠিটি জল ও বায়ুর সংযোগ স্থলে বাঁকিয়া গিয়াছে, আর তাহার নীচের অংশ খাটো হইয়া গিয়াছে মনে হইবে।



৮০ নং চিত্র—প্রতিসরণের ফলে সোজা লাঠি বাঁকা দেখা যায়

কাচের গ্লাসে জল রাখিয়া তাহাতে একটা পেনসিলের কতক অংশ ডুবাও। উপর হইতে পেনসিলটিকে কিরূপ দেখায়? কেন ঐরূপ দেখায়? একটি চৌবাচ্চায় বা গ্লাসে জল থাকিলে তাহার তলদেশ উপরে উঠিয়া গিয়াছে এইরূপ কেন দেখা যায়?

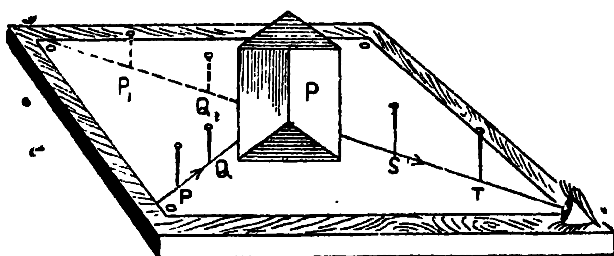
(৩) দিগন্ত রেখার নীচে সূর্যকে দেখা—পৃথিবী উপর যে বায়ুমণ্ডল রহিয়াছে তাহার ঊর্ধ্বস্তরের ওজনের জন্য নিম্নস্তরের বায়ু ঘনতর। পৃথিবীপৃষ্ঠে A একটি স্থান। বিন্দু দ্বারা গঠিত দিগন্তরেখা স্পর্শকের মত সেই স্থান দিয়া গিয়াছে। বায়ুমণ্ডল না থাকিলে দিগন্তরেখার নীচে কিছুই দেখা যাইত না। সকালে সূর্য উঠিবার কিছু আগে এবং সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যাওয়ার কিছু পরে সূর্য চিত্রে প্রদর্শিত মতে দিগন্তরেখার নীচে থাকে। সূর্য হইতে রশ্মি বায়ুশূন্য স্থান দিয়া আসিয়া বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন ঘনত্ব-বিশিষ্ট বায়ুস্তরে প্রতিসৃত হইয়া আমাদের চোখে পড়ে। সেই প্রতিসৃত রশ্মির সাহায্যে আমরা সকালে সূর্যকে দিগন্তরেখার উপরে উঠিবার খানিক পূর্বে এবং সন্ধ্যায় দিগন্তরেখার নীচে নামিয়া যাওয়ার খানিক পরেও দেখিতে পাই।



৮১ নং চিত্র—দিগন্ত রেখার নীচে সূর্যকে দেখা

প্রিজ্‌ম (Prism) দ্বারা আলোকের প্রতিসরণ—প্রিজ্‌ম একটি তিন-ফলা কাচের বা অন্য স্বচ্ছ পদার্থের ফলক। ইহার তিনটি খাড়া ফলাই খুব মসৃণ। ইহা ছাড়া ইহার নীচের ও উপরের অনুভূমিক ফলা দুইটিও খুব মসৃণ। সব সমেত ইহার পাঁচটি তল আছে।

পরীক্ষা—ড্রয়িং বোর্ডের উপর সাদা কাগজ আঁটিয়া একটি প্রিজ্‌ম বসাও এবং খাড়া প্রিজ্‌মটির বাম তলের দিকে P এবং Q পিন দুইটি

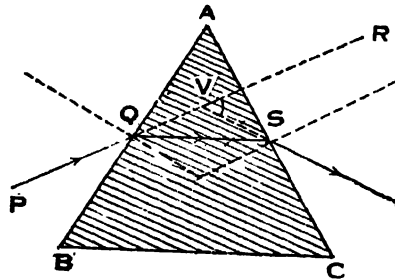


৮২ নং চিত্র—প্রিজ্‌ম দ্বারা আলোকের প্রতিসরণ পরীক্ষা

খাড়া ভাবে চিত্রে প্রদর্শিত ভাবে আটকাও। PQ হইল আপতিত রশ্মির

পথ। ডান দিকের তলের ভিতর দিয়া ইহাদের প্রতিবিম্ব P_1 ও Q_1 দেখিয়া তাহাদের সঙ্গে একই সরল রেখায় S ও T পিন দুইটি বসাও। পিনগুলি সরাইয়া তাহাদের অবস্থান চিহ্নিত কর। প্রিজ্‌মটি সরাইয়া লও। PQ এবং TS সরলরেখা দুইটি টানিয়া বাড়াইয়া দাও। আপাতিত রশ্মি PQ প্রিজ্‌মের ভিতর প্রতিসৃত হইয়া ST রশ্মিরূপে প্রিজ্‌ম হইতে নির্গত হইয়াছে।

বোর্ডের উপরে তোমার অঙ্কন যেরূপ হইবে তাহা চিত্রে দেখান হইতেছে। A B C ত্রিভুজটি বোর্ডের উপরে প্রিজ্‌মের ছেদ। B A C প্রিজ্‌মের প্রতিসরণকারী কোণ (Refracting Angle) এবং BC উহার ভূমি (Base)। P Q আলোক রশ্মি A B তলে Q বিন্দুতে আপতিত হইয়াছে। রশ্মিটি কাচ-মাধ্যমে প্রবেশ করিয়া QS রেখায় প্রতিসৃত হইয়াছে এবং Q S রশ্মি A B তলের উপর Q বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্বের দিকে সরিয়া গিয়াছে। তাহার পর Q S রশ্মি A C তলে S বিন্দুতে আপতিত হইয়া পুনরায় বায়ুর মধ্যে প্রতিসৃত হইয়াছে এবং A C তলে অঙ্কিত অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া গিয়া ST সরল রেখায় নির্গত হইয়াছে। P Q R আপতিত রশ্মির দিক। নির্গত রশ্মির দিক বাড়াইয়া দেওয়ায় V বিন্দুতে উহা আপতিত রশ্মির দিককে ছেদ করিয়াছে। আপতিত রশ্মির মোট বিচ্যুতি (Deviation) RVS কোণ দ্বারা নির্দিষ্ট হইতেছে। ছবিটির দিকে তাকাইলেই তোমরা দেখিতে পাইবে আপতিত রশ্মির A B তলের উপর হইতে প্রথম একবার B C ভূমির দিকে প্রতিসরণের ফলে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। সেই প্রতিসৃত রশ্মি A C তলের উপর পড়িলে প্রতিসরণের ফলে একই দিকে তাহার আবার বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। কাজেই ঐ রশ্মির মোট বিচ্যুতির পরিমাণ দুই বারের বিচ্যুতির সমান।



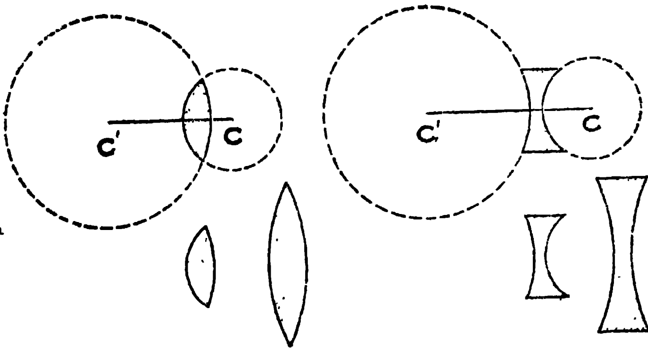
৮৩নং চিত্র—প্রিজ্‌মের ভিতর দিয়া আলোকের প্রতিসরণ

৬

লেন্স ও আলোকের প্রতিসরণ

তোমরা বোধ হয় লেন্সের (Lens) নাম শুনিয়াছ বা লেন্স দেখিয়াছ। ঘড়ি মেরামতকারীরা চোখে লেন্স দিয়া কাজ করেন। চোখের চশমাতে লেন্স থাকে। লেন্স দিয়া ছোট ছোট লেখা বা কীটপতঙ্গ বড় করিয়া দেখা যায়। লেন্স দিয়া কি ভাবে কাজ হয় জানিতে হইলে আগের লেন্সের গঠন ও ধর্ম জানিতে হইবে।

লেন্স—কোন স্বচ্ছ প্রতিসরণকারী (Refracting) মাধ্যমকে যদি দুইটি গোলাকার তল দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায় তবে সেই মাধ্যমকে **লেন্স** বলে। ছবির বাম দিকে দেখ দুইটি গোলক পরস্পরকে ছেদ করায় তাহাদের মধ্যবর্তী অংশ দুই দিকেই গোলকাকার তল দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়াছে। এই ভাবে একটি লেন্স গঠিত হইল। গোলক দুইটির ব্যাসার্ধ এক নয়।



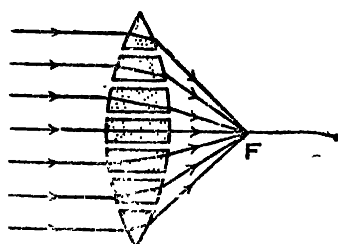
চিত্র ৮৪নং—লেন্সের গঠন

সেজন্য উৎপন্ন লেন্সের দুই দিকের বক্রতা সমান নহে। গোলক দুইটির ব্যাসার্ধ সমান হইলে লেন্সের দুই দিকেরই বক্রতা সমান হইবে (যেমন ডান দিকের লেন্সের)। লেন্স দুইটি মধ্যস্থলে মোটা এবং কিনারার দিকে ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে। এই প্রকারের লেন্সকে **উত্তল লেন্স** (Convex Lens) বলে।

ছবির ডান দিকে দেখ দুইটি গোলক পরস্পরকে স্পর্শ না করিয়া একটি

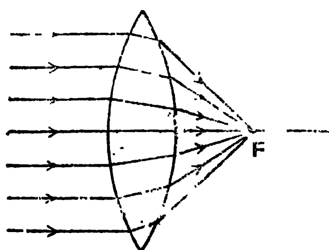
মাধ্যমকে দুই পাশে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। ফলে কিরূপ লেন্স উৎপন্ন হইতে পারে ছবির নীচে দেখ। এই জাতীয় লেন্স মাঝখানে সরু এবং কিনারার দিকে ক্রমশঃ মোটা। এই প্রকারের লেন্সকে **অবতল লেন্স** (Cancave Lens) বলে। উত্তল ও অবতল লেন্সের একদিক যথাক্রমে উত্তল ও অবতল হইয়া অপর দিক সমতলও হইতে পারে। যে গোলক দুইটি দ্বারা লেন্স সীমাবদ্ধ হয় তাহাদের কেন্দ্র দুইটি যোগ করিলে যে সরল রেখা পাওয়া যায় তাহাকে লেন্সের **অক্ষ** বলে। ছবিতে C'C লেন্সের অক্ষ।

লেন্স দ্বারা প্রতিসরণ—একটি উত্তল লেন্সকে চিত্রে প্রদর্শিত প্রণালীতে প্রিজমের কতকগুলি খণ্ড দ্বারা গঠিত বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যায়। উত্তল লেন্সে প্রিজমের টুকরা গুলির প্রতিসরণকারী কোণ লেন্সের প্রান্তের দিকে থাকে, আর অবতল লেন্সকে অনুরূপ ভাবে কতকগুলি খণ্ডিত প্রিজমের সমষ্টি বলিয়া ধরিলে দেখা যাইবে তাহাদের প্রতিসরণকারী কোণ ভিতরের দিকে। উত্তল লেন্সে প্রতিসরণকারী কোণগুলি মধ্যদিক হইতে বাহিরের দিকে ক্রমশঃ বড় হইয়াছে, কিন্তু অবতল লেন্সের বেলায় কোণগুলি বাহির হইতে ভিতরের দিকে ক্রমশঃ বড় হইয়াছে।



৮৫নং চিত্র—প্রিজ্‌মের টুকরা দিয়া গঠিত লেন্স দ্বারা প্রতিসরণ

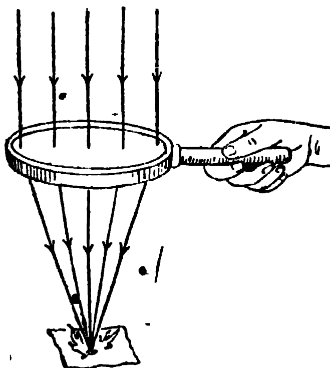
প্রিজ্‌মের উপর আলোকরশ্মি পড়িলে উহা প্রিজ্‌মের ভূমির বা মোটা অংশের দিকে সরিয়া যায়। একটি উত্তল লেন্সের প্রিজ্‌ম গুলির উপর সমান্তরাল রাশ্মি পড়িলে প্রতিসরণের ফলে উহারা ভিতরে দিকে অর্থাৎ লেন্সের অক্ষের দিকে ঝুঁকিয়া আসিবে, আর অবতল লেন্সের বেলায় অক্ষ হইতে দূরে বাহিরের দিকে সরিয়া যাইবে। আবার প্রতিসরণকারী কোণ যত বড় হয় রশ্মির বিচ্যুতি তত বাড়িয়া যায় বলিয়া উত্তল লেন্সের মধ্যভাগ হইতে প্রান্তের দিকের রশ্মিগুলি বেশি বাঁকিবে এবং সেই জন্য আপাতিত



৮৬নং চিত্র—উত্তল লেন্সের ফোকাস

সমান্তরাল রশ্মিগুলি অক্ষের উপর এক বিন্দুতে মিলিত হইবে। ঐ বিন্দুকে **উত্তল লেন্সের ফোকাস** (Focus) বলে; অনুরূপ কারণে অবতল লেন্সের মধ্যভাগ হইতে প্রান্তের দিকের রশ্মিগুলির বিচ্যুতি ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে। ফলে রশ্মিগুলি আর একত্র মিলিত হইতে পারিবে না। তবে রশ্মিগুলিকে পিছনের দিকে বাড়াইয়া দিলে সেদিকে অক্ষের উপর এক বিন্দুতে মিলিত হইবে। এজন্য এই লেন্সের ভিতর দিয়া তাকাইলে মনে হইবে রশ্মিগুলি যেন প্রতিসরণের পর পিছনের এক উজ্জ্বল বিন্দু হইতে আসিতেছে। ইহাই হইল **অবতল লেন্সের ফোকাস**। উত্তল লেন্স দ্বারা সৎ বা অসৎ, ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর প্রতিবিম্ব গঠিত হইতে পারে। অবতল লেন্স দ্বারা সব অবস্থানেই ক্ষুদ্রতর ও অসদ্ বিম্ব গঠিত হয়। চশমায় অবতল ও উত্তল দুই প্রকারের লেন্সই ব্যবহার করা হয়।

আমরা যে সব লেন্স সচরাচর ব্যবহার করি তাহাদের দুই দিকেরই বক্রতা সমান। এই ধরনের লেন্সের প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত এবং লেন্সের উভয় তল হইতে সমদূরবর্তী মধ্যবিন্দুকে লেন্সের **আলোক-কেন্দ্র** (Optical Centre) বলে। আলোক-কেন্দ্র হইতে ফোকাস F-এর দূরত্বকে **ফোকাস-দূরত্ব** (Focal Distance) বলে। লেন্স সরু হইলে কোন আলোকরশ্মি আলোক-কেন্দ্রের ভিতর দিয়া গেলে সোজা বাহির হইয়া আসে, উহার কোন প্রতিসরণ হয় না। আর খুব সরু লেন্সের বেলায় উহার বাহিরের তল হইতে ফোকাসের দূরত্বকেই ফোকাস-দূরত্ব বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যায়।



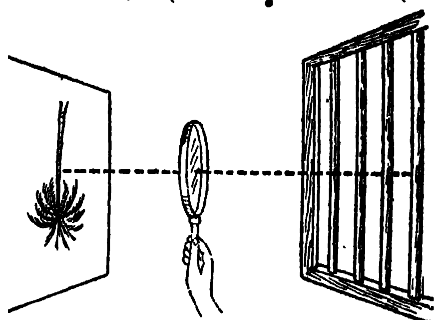
৮৭নং চিত্র—আতশী কাচ দিয়া কাগজ পুড়ানো

উত্তল লেন্স দ্বারা উত্তাপের সৃষ্টি—একখানা উত্তল লেন্স সূর্যালোকে এমন ভাবে ধর যেন সূর্য-কিরণ উহার উপর খাড়া ভাবে পড়ে। সূর্য বহু দূরে আছে বলিয়া সূর্যরশ্মি সমান্তরাল ভাবে আসিয়া লেন্সের উপর পড়িবে। মাটির উপর একখানা কাগজ রাখিয়া তাহার উপরে লেন্সটির

দূরত্ব বাড়াইলে-কমাইলে কোনও এক অবস্থায় কাগজের উপর সূর্যের আলোক কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে খুব উজ্জ্বল একটি বিন্দু উৎপন্ন হইবে। ঐ আলোকের সঙ্গে সূর্যের অদৃশ্য তাপরশ্মিও ঐ বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হইবে। লেন্সটি মোটা হইলে কাগজটিতে আগুন ধরিয়া যাইবে। এজন্য এই লেন্সকে **বার্নিংগ্লাস বা আতশী কাচ** বলে। আতশ শব্দের অর্থ আগুন।

উত্তল লেন্সের ফোকাস-দূরত্ব নির্ণয়:—পরীক্ষা— সূর্যরশ্মি যখন উত্তল লেন্সের সাহায্যে কোনও বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করা যায় তখন লেন্স হইতে উজ্জ্বল আলোক বিন্দুর দূরত্বই হইল ফোকাস-দূরত্ব।

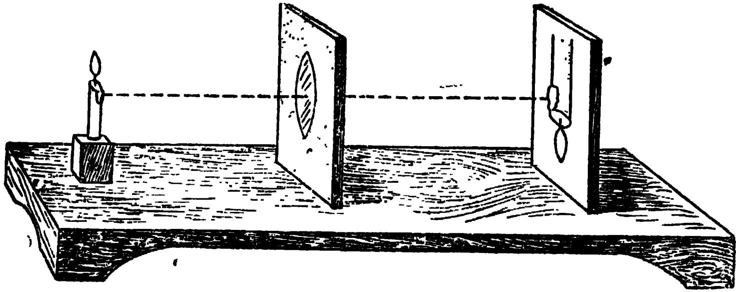
একটি উত্তল লেন্স জানালার ধারে দূরের কোন গাছের দিকে ধর। ঘরের অন্য জানালা ও দরজা বন্ধ কর। লেন্সের পিছনে একখানা সাদা পিজবোর্ড রাখিয়া লেন্সটি আগে পাছে সরাও। দেখিবে পর্দার উপরে গাছের একটি উল্টা প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। লেন্সের যে অবস্থানে প্রতিবিম্বটি সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয় সেই অবস্থানে একটি স্কেল দিয়া লেন্স হইতে পর্দার দূরত্ব মাপ। দূরের গাছ হইতে আলোকরশ্মি প্রায় সমান্তরাল রেখায় আসিয়া লেন্সের উপর পড়ে। সেজন্য প্রতিবিম্বের দূরত্বকে ফোকাস-দূরত্ব বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যায়। ইহা f অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়।



৮৮নং চিত্র—উত্তল লেন্সের সাহায্যে দূরের বস্তুর প্রতিবিম্ব

উত্তল লেন্স কর্তৃক প্রতিবিম্ব গঠন:—পরীক্ষা— একটি উত্তল লেন্সের ফোকাস-দূরত্ব পূর্বোক্ত নিয়মে বাহির কর। এখন লেন্স হইতে বিভিন্ন দূরত্বে বস্তু রাখিলে তাহার প্রতিবিম্বের আকৃতি ও প্রকৃতি কিরূপ হয় পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা কর: দুইটি মোটা পিজবোর্ড কাঠের ফলকের সঙ্গে আটকাইয়া খাড়া করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা কর। মোমবাতি সহ একটি মোমদানি একপাশে পর্দা দুইটির সঙ্গে একই সরল রেখায় রাখ। একটি পিজবোর্ডের মধ্যে ছিদ্র করিয়া একটি লেন্স তাহার মধ্যে আটকাও এবং এই

পিজবোর্ডটি অপর পিজবোর্ড ও মোমবাতির মধ্যে রাখ। লেন্সটি ঠিক জায়গায় রাখিয়া পর্দাটি আগে-পাছে সরাইলে বা পর্দাটি ঠিক রাখিয়া



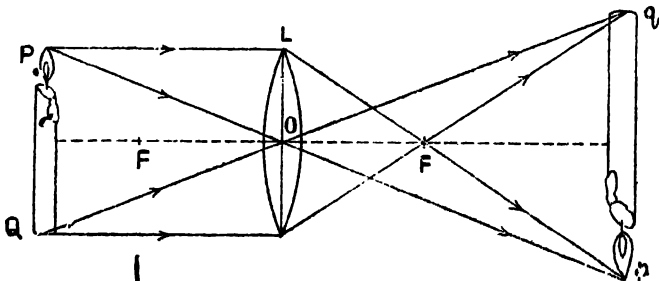
৮৯নং চিত্র—বিভিন্ন দূরত্বে উত্তল লেন্স দ্বারা সদ্‌বিম্ব গঠন

লেন্সটি সরাইলে সাদা পর্দার উপর দীপশিখার স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পড়িবে। বিম্বটি সৎ ও উল্টা। পরীক্ষার সময় ঘর আঁধার করিয়া নিবে।

লেন্স হইতে বস্তুর (শিখার) ও প্রতিবিম্বের দূরত্ব স্কেল দিয়া মাপ। আর প্রতিবিম্ব বস্তু হইতে বড় কি ছোট তাহাও লক্ষ্য কর। বস্তু ও পর্দা লেন্স হইতে বিভিন্ন স্থানে রাখিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে বস্তুটি লেন্স হইতে যত দূরে প্রতিবিম্বের দূরত্ব যদি তাহার চেয়ে বেশি হয় তবে প্রতিবিম্ব আকারে বস্তুর চেয়ে বড় হইবে। আর প্রতিবিম্বের দূরত্ব যদি বস্তুর দূরত্বের চেয়ে কম হয় তবে প্রতিবিম্ব আকারে ছোট হইবে।

দীপশিখাটি যদি লেন্সের ফোকাস্‌-দূরত্বের মধ্যে থাকে তবে প্রতিবিম্ব কিরূপ হয় পরীক্ষা করিয়া বল।

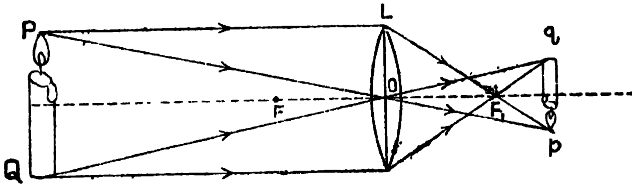
উত্তল লেন্স দ্বারা প্রতিবিম্ব গঠনের জ্যামিতিক অঙ্কন—লেন্স হইতে বস্তুর বিভিন্ন দূরত্বে কিরূপ প্রতিবিম্ব গঠিত হয় আঁকিয়া বাহির কর।



৯০নং চিত্র—f ও 2f এর মধ্যে অবস্থিত বস্তুর প্রতিবিম্ব

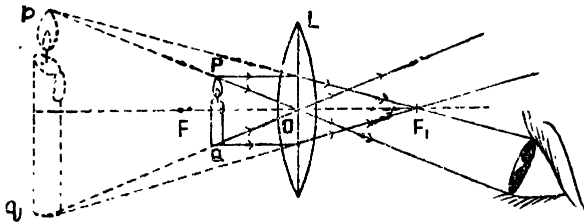
(১) যখন বস্তু f (ফোকাস-দূরত্ব) ও 2f দূরত্বের মধ্যে থাকে : LO একটি লেন্স। PQ বস্তুটি f ও 2f দূরত্বের মধ্যে আছে। ৯০ নং চিত্রে PL রশ্মি অক্ষের সমান্তরাল। লেন্সে প্রতিসৃত হইয়া রশ্মিটি F ফোকাসের মধ্য দিয়া LFp পথ দিয়া যাইবে। PO রশ্মিটি আলোক-কেন্দ্রের মধ্য দিয়া POp পথে চলিয়া আসিবে। প্রতিসৃত রশ্মি দুইটি p বিন্দুতে মিলিত হওয়ায় p হইবে P-এর প্রতিবিম্ব। এইভাবে q হইবে Q এর প্রতিবিম্ব। এক্ষেত্রে বস্তুর প্রতিবিম্ব সৎ, উল্টা এবং বৃহত্তর।

(২) যখন বস্তুর দূরত্ব 2f এর বেশি হয় : পূর্বোক্ত প্রণালীতে আঁকিয়া দেখিবে এ ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব সৎ, উল্টা এবং আকারে বস্তু হইতে ক্ষুদ্রতর।



৯১নং চিত্র—2f এর বাহিরে অবস্থিত বস্তুর প্রতিবিম্ব

(৩) যখন বস্তুর দূরত্ব f এর চেয়ে কম হয় : এই ক্ষেত্রে বস্তু হইতে লেন্সের ভিতর দিয়া রশ্মি অপসৃত হইয়া মিলিত হইতে পারে না।

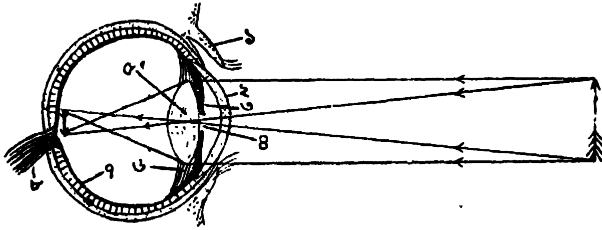


৯২নং চিত্র—f এর মধ্যে অবস্থিত বস্তুর প্রতিবিম্ব

তাহাদিগকে উল্টা দিকে বাড়াইয়া দিলে সেদিকে গিয়া মিলিত হয় এবং সেই মিলিত বিন্দুতে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় বলিয়া মনে হয়। এক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব অসৎ, সোজা ও বৃহত্তর। বস্তুটি যদি 2f দূরত্বে থাকে তবে প্রতিবিম্ব কিরূপ হইবে আঁকিয়া বাহির কর।

চক্ষু ও কয়েকটি আলোক-যন্ত্র

চক্ষু—চক্ষুর বিভিন্ন অংশ ছবিতে দেখ। চক্ষু-গোলকটিকে প্রয়োজন মত খুলিয়া বা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য চক্ষুর **পাতা** রহিয়াছে। চক্ষু-গোলকের সম্মুখ ভাগের আবরণটির নাম **কর্নিয়া** (Cornea)। ইহা স্বচ্ছ বলিয়া ইহার

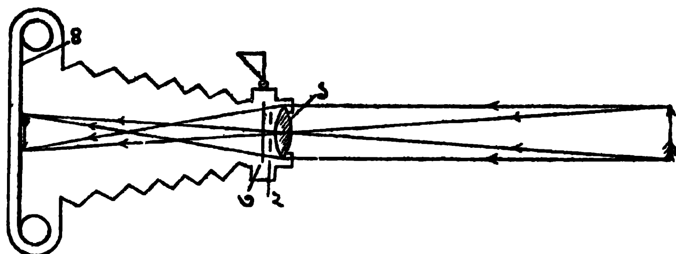


১৩নং চিত্র—১। চক্ষুর পাতা ২। কর্নিয়া ৩। কণীনিকা ৪। চক্ষুর তারা ৫। লেন্স ৬। লেন্সসংলগ্ন পেশি। ৭। রেটিনা। ৮। দৃষ্টিবাহী নার্ভ

ভিতর দিয়া বাহিরের আলোকরশ্মি ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। কর্নিয়ার পিছনে একটি রঙিন গোলাকার ছিদ্রবিশিষ্ট পর্দা আছে। এই ছিদ্রটিকে **চক্ষুর তারা** (Pupil) বলে। পদার্থটিকে **কণীনিকা** (Iris) বলা হয়। কণীনিকা তারাটিকে ছোট বড় করিয়া প্রয়োজন মত আলোক চক্ষুর ভিতর প্রবেশ করিতে দেয়। ইহার পশ্চাতে চক্ষুর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় অংশ **লেন্স,** সংলগ্ন পেশির সাহায্যে চক্ষু-গোলকের ভিতর আটকানো আছে। দৃশ্য বস্তু হইতে আলোকরশ্মি লেন্সের ভিতর দিয়া প্রতিসৃত হইয়া চক্ষু-গোলকের পিছনের গায়ের **রেটিনা** (Retina) নামক পর্দাতে পড়ে, ফলে সেখানে দৃশ্য বস্তুর একটি সৎ, উল্টা ও ক্ষুদ্রতর প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্র হইতে উৎপন্ন **দৃষ্টিবাহী নার্ভ** চক্ষু-গোলকের পিছনে প্রবেশ করিয়া এবং তাহার উপর বিস্তৃত হইয়া রেটিনা বা অক্ষিপটটি গঠন করিয়াছে। এজন্য ইহার উপর প্রতিবিম্ব পড়িলে তাহার অনুভূতি মস্তিষ্কে চলিয়া যায় এবং আমরা বস্তুটি দেখিতে পারি।

ফটোগ্রাফিক ক্যামেরা (**Photographic Camera**)—ক্যামেরার সম্মুখে কোন বস্তু রাখিয়া ক্যামেরা দ্বারা উহার ছবি তোলা হয়। চিত্রে ক্যামেরার অংশগুলি দেখ। সম্মুখের বস্তু হইতে আলোকরশ্মি আসিয়া

ক্যামেরার উত্তল লেন্সের উপর পড়িলে ঐ রশ্মি প্রতিসৃত হইয়া পিছনের পর্দার উপর সৎ ও উল্টা প্রতিবিম্ব গঠন করে। ক্যামেরার পর্দা হইল



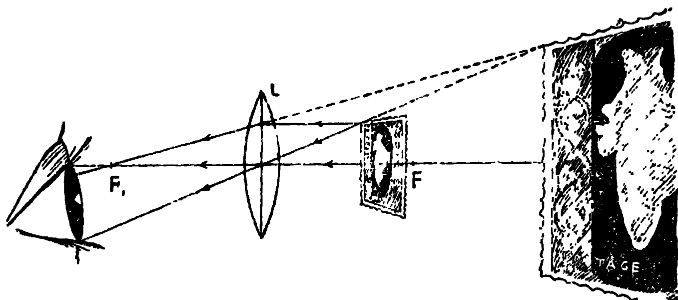
৯৪নং চিত্র—ফটোগ্রাফি ক্যামেরা—১। লেন্স। ২। ডায়াফ্রাম। ৩। সাটার। ৪। ফিল্‌ম

রাসায়নিক দ্রব্য-মাখানো ফিল্‌ম বা প্লেট। ইহার উপর প্রতিবিম্বের আলোক পড়িলে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে পরিবর্তন ঘটে এবং প্রতিবিম্বের দাগ পড়ে। লেন্সের পিছনে ডায়াফ্রাম (Diaphragm) রহিয়াছে। ইহা একটি ছিদ্র বিশিষ্ট পর্দা। এই ছিদ্রটিকে প্রয়োজন মত ছোট বড় করিয়া ইহার সাহায্যে আপতিত আলোকরশ্মির মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি করা হয়। ইহার পশ্চাতে সাটার (Shutter) রহিয়াছে। এই পর্দাটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় কয়েক সেকেণ্ড হইতে সেকেণ্ডের একশ ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত সময়ের জন্য খুলিয়া ফিল্‌ম বা প্লেটের উপর আলোক-রশ্মি পতনের সময় নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। লেন্স বা পর্দাটি আগে পাছে সরাইয়া পর্দার উপর সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব ফেলা হয়।

ক্যামেরার সঙ্গে চোখের নানা সাদৃশ্য রহিয়াছে। চোখের পাতা ক্যামেরার সাটারের মত চক্ষুকে প্রয়োজন মত খুলিয়া বা ঢাকিয়া রাখে। ক্যামেরাতে ডায়াফ্রামের ছিদ্র ছোট বড় করিয়া যেমন কম বেশি পরিমাণে আলোক ভিতরে ফেলা হয় কণীনিকাও তারাটিকে ছোট বড় করিয়া প্রয়োজন মত আলোক ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয়।

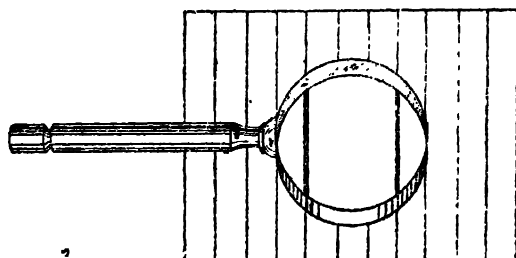
ক্যামেরার সঙ্গে চোখের সাদৃশ্য থাকিলেও চোখের গঠন ও ক্রিয়া অনেক-জটিল ও উন্নত ধরনের। ক্যামেরার লেন্স বা পর্দার আগে পাছে সরাইয়া বিভিন্ন দূরত্বের বস্তুর ছবি পর্দার উপর ফেলা হয়। চোখের বেলায় লেন্স বা পর্দা না সরাইয়া লেন্সের উপর সংলগ্ন-পেশির টান বাড়াইয়া ও কমাইয়া নরম, স্থিতিস্থাপক লেন্সটির বক্রতার যথাক্রমে কমানো ও বাড়ানো হয়। এইরূপে সাময়িক ভাবে ফোকাস-দূরত্বের পরিবর্তন করিয়া পরিবর্তিত লেন্সের সাহায্যে বিভিন্ন দূরত্বের বস্তুর ছবি সুস্পষ্ট ভাবে রেটিনাতে ফেলা হয়।

বিবর্ধক-কাচ (Magnifying Glass)—উত্তল লেন্সের ফোকাস-দূরত্বের মধ্যে বস্তু রাখিলে তাহার অসৎ, সোজা ও বৃহত্তর প্রতিবিম্ব গঠিত হয় ইহা তোমরা পূর্বে জানিয়াছ। এজন্য ক্ষুদ্র বস্তু বড় করিয়া দেখার জন্য উত্তল লেন্স ব্যবহার করা হয়। ছবিতে দেখ একটি ডাকটিকেট উত্তল



৯৫নং চিত্র—উত্তল লেন্স দ্বারা ডাক টিকিট বড় করিয়া দেখা

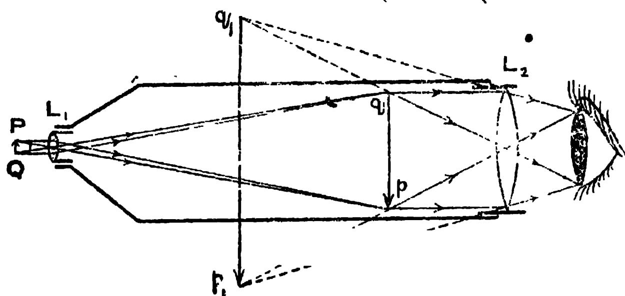
লেন্সের ফোকাসের মধ্যে রাখিয়া তাহার দিকে তাকাইলে ঐ টিকিটের উপরের লেখা ও চিত্রের ক্ষুদ্র খুঁটিনাটি কেমন বড় ও সুস্পষ্ট দেখা যায়। উত্তল লেন্সের সাহায্যে ছোট অক্ষর বড় করিয়া পড়িবার বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। এজন্য ইহাকে পড়িবার কাচও (Reading-glass) বলে। এই সব কাজের জন্য লেন্সটি বেশ চাওড়া হইলে ইহার ভিতর দিয়া যথেষ্ট আলোক আসিতে পারে। ঘড়ি মেরামতকারীরা চোখে ছোট উত্তল লেন্স লাগাইয়া মেরামতের কাজ করিয়া থাকেন। একটি লেন্স কোন বস্তু কতগুণ বড় করিতে পারে জানিবার জন্য উহা রুলকরা কাগজের উপর ধর। ছবিতে দেখিতেছ রুলের ভিতরের একটি ফাঁক কাচের ভিতর দিয়া বর্ধিত হইয়া প্রায় তিনটি ফাঁকের স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায় কাচটির বিবর্ধন-ক্ষমতা (Magnifying Power) প্রায় ৩। লেন্সের ফোকাস-দূরত্ব কম হইলে বিবর্ধন-ক্ষমতা



৯৬নং চিত্র—উত্তল লেন্সের ভিতর দিয়া রুলকরা স্থান বড় করিয়া দেখা

বাড়িয়া যায়। বিবর্ধক-কাচকে **সরল অণুবীক্ষণ-যন্ত্রও** (Simple Microscope) বলা হয়।

অণুবীক্ষণ-যন্ত্র বা **কমপাউণ্ড মাইক্রোস্কোপ** (Compound Microscope)—বস্তু অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইলে পূর্বে বর্ণিত বিবর্ধক-কাচের সাহায্যেও উহা ভাল রূপে দেখা যায় না। এ অবস্থায় আরও শক্তিশালী বিবর্ধক-যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। ইহার নাম **অণুবীক্ষণ-যন্ত্র** বা **কমপাউণ্ড মাইক্রোস্কোপ**। চিত্র দেখিয়া ইহার মূলনীতি বুঝিবার চেষ্টা কর।

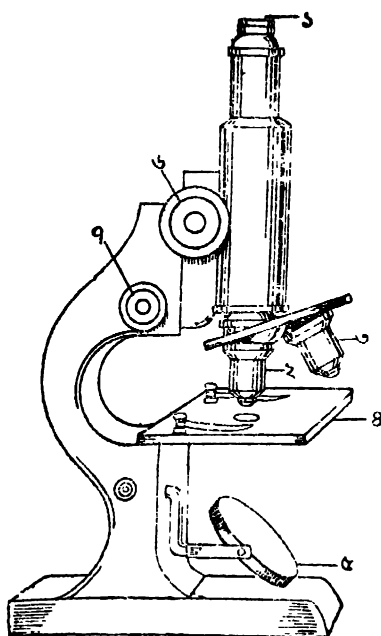


৯৭ নং চিত্র—মাইক্রোস্কোপের ভিতর রশ্মির পথ

PQ ক্ষুদ্র বস্তুটি একটি উত্তল লেন্স L_1 এর ফোকাসের ঠিক বাহিরে রহিয়াছে। তোমরা পূর্বে দেখিয়াছ এরূপ অবস্থায় লেন্সের উল্টাদিকে বস্তুর একটি সৎ, উল্টা এবং বৃহত্তর প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। pq হইল সেই প্রতিবিম্ব। ইহার পিছনে আর একটি বৃহত্তর লেন্স L_2 এইরূপ ভাবে আছে যে প্রতিবিম্বটি এই লেন্সের ফোকাস-দূরত্বের ঠিক মধ্যে রহিয়াছে। সৎ প্রতিবিম্ব pqকে এখানে L_2 লেন্সের সম্মুখে একটি বস্তু হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। ফলে L_2 লেন্স বিবর্ধক-কাচের মত pq প্রতিবিম্বের আরও বড় একটি অসৎ প্রতিবিম্ব গঠন করিবে। L_2 লেন্সের পিছনে চক্ষু রাখিয়া সেই বৃহৎ, অসৎ প্রতিবিম্ব p_1 q_1 দেখা যাইবে।

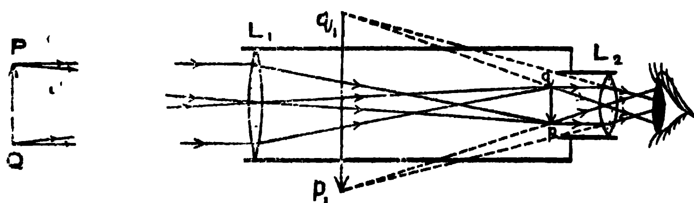
বস্তুর অভিমুখী লেন্স L_1 কে **অবজেক্ট গ্লাস** (Object Glass) বা অভিলক্ষ্য বলে। ইহার পরিসর ও ফোকাস-দূরত্ব অতি ক্ষুদ্র। ইহা দ্বারা বহুগুণে বর্ধিত সদ্‌বিম্ব গঠিত হয়। L_2 লেন্সের উপর চক্ষু রাখিয়া দ্বিতীয় বারের বর্ধিত প্রতিবিম্ব দেখিতে হয়। ইহার নাম **আই-পিস** (Eye-piece) বা **অভিনেত্র**। ইহার ফোকাস-দূরত্ব অবজেক্ট গ্লাসের চেয়ে বেশি।

এবার একটি কমপাউণ্ড মাইক্রোস্কোপের ছবি দেখ। ইহার বিভিন্ন অংশের নাম দেওয়া হইয়াছে। কি করিয়া মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করিতে হয় শিক্ষক মহাশয়ের নিকট শিখ। সর্ব প্রথম আই-পিসের ভিতর দিয়া তাকাইয়া নীচের অবতল দর্পণটি ধীরে ধীরে ঘুরাইতে হইবে যেন মাইক্রোস্কোপের ভিতরে সমস্ত আলোক-ক্ষেত্রটি সমান ও উজ্জ্বল-ভাবে আলোকিত দেখায়। তাহার পর কাচের পাতলা পাতের (slide) উপর খুব ক্ষুদ্র বস্তু (অনেক সময় তাহা খালি চোখে দেখা যায় না) রাখিয়া পাতটি মঞ্চের উপর আট-কাইয়া রাখ। ৬-চিহ্নিত স্ক্রু ঘুরাইয়া অবজেকৃট গ্লাসটি কাচের পাতের খুব নিকটে নিয়া যাও। তাহার পর আই-পিসের ভিতর দিয়া তাকাইয়া ৭-চিহ্নিত স্ক্রু দিয়া অবজেকৃট গ্লাসটি খুব ধীরে ধীরে উপরে উঠাইতে থাক। কোনও এক অবস্থায় বস্তুটির সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে।



১৮ নং চিত্র—মাইক্রোস্কোপের বিভিন্ন অংশ
১। আই-পিস ২। অবজেকৃট গ্লাস
৩। অধিকতর শক্তির অবজেকৃট গ্লাস ৪। মঞ্চ
৫। অবতল দর্পণ ৬। উপর নীচ করার পেঁচকল
৭। খুব ধীরে ধীরে উপর নীচ করার পেঁচকল

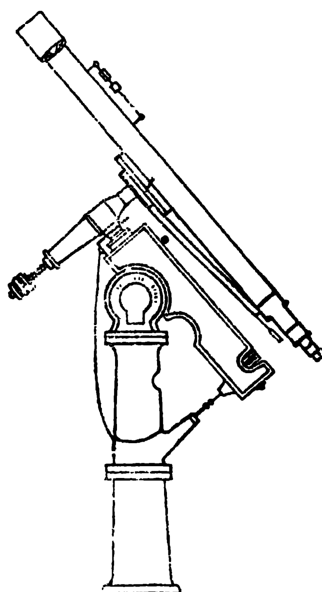
দূরবীক্ষণ-যন্ত্র বা টেলিস্কোপ (Telescope)—লক্ষ্য বস্তু বহু দূরে থাকিলে উহা রেটিনায় যে প্রতিবিম্ব গঠন করে তাহার আকার



১৯ নং চিত্র—টেলিস্কোপের ভিতরে রশ্মির পথ

দূরবীক্ষণ-যন্ত্র বা টেলিস্কোপের সাহায্যে বর্ধিত ও অধিকতর স্পষ্ট হইয়া

থাকে। এই যন্ত্রের প্রধান অংশ দুইটি হইল অবজেক্‌ট গ্লাস L_1 ও আই-পিস L_2। উত্তল অবজেক্‌ট গ্লাসটি ইহার ফোকাসে দূরের বস্তু PQ-র সৎ, উল্টা ও ক্ষুদ্রতর প্রতিবিম্ব pq গঠন করে। এই প্রতিবিম্বটি আই-পিসের ফোকাস-দূরত্বের ঠিক ভিতরে থাকে বলিয়া তাহার সাহায্যে অসৎ ও বর্ধিত প্রতিবিম্ব $p_1 q_1$ গঠিত হয়। টেলিস্কোপের অবজেক্‌ট গ্লাসটি বেশ চওড়া হওয়া দরকার; তাহা হইলে দূরের বস্তু হইতে যথেষ্ট আলোকরশ্মি আসিয়া প্রতিবিম্ব গঠন করিতে পারে। ইহার ফোকাস-দূরত্ব বেশি থাকে। টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশে গ্রহনক্ষত্র ও পৃথিবীতে দূরের বস্তু দেখা হয়। একটি টেলিস্কোপের চিত্র দেখ। অবজেক্‌ট গ্লাস ও আই-পিস একটি লম্বা চোঙ্গার দুই প্রান্তে অবস্থিত। আই-পিসটিকে ভিতরে বা বা বাহিরে সরাইয়া দূরের বস্তুর প্রতিবিম্ব বড় করিয়া দেখা হয়।



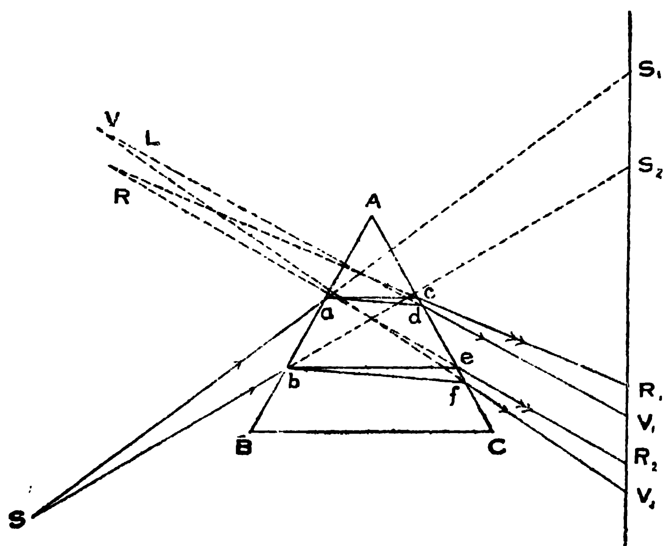
১০০নং চিত্র—টেলিস্কোপ

প্রিজ্‌ম ও আলোকের বিচ্ছুরণ

একটি প্রিজ্‌ম সূর্যালোকে ধরিয়া ইহার ভিতর দিয়া তাকাইলে নানা রঙ দেখিতে পাইবে। সূর্যালোক সাদা, কিন্তু প্রিজমের ভিতর দিয়া গেলে উহা বিভিন্ন বর্ণে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। বিশেষ প্রণালী মতে প্রিজ্‌মের ভিতর দিয়া সূর্যরশ্মির প্রতিসরণ ঘটাইলে উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া মোটামুটি বেগনি (Violet), গাঢ় নীল (Indigo), নীল (Blue), সবুজ (Green), হল্‌দে (Yellow), কমলা (Orange) এবং লাল (Red), এই সাত বর্ণের রশ্মির সৃষ্টি করে।

সাদা আলোকরশ্মির এইরূপ নানা বর্ণে বিশ্লেষণকে আলোকের **বিচ্ছুরণ** (**Dispersion**) বলে। ঐ বিশ্লেষণের ফলে বিভিন্ন বর্ণরঞ্জিত যে আলোকের ডোরা উৎপন্ন হয় তাহাকে **বর্ণালি** (Spectrum) বলে। এজন্যই সাদা আলো সম্মুখে রাখিয়া প্রিজ্‌মের ভিতর দিয়া তাকাইলে নানা রঙের আলো দেখা যায়। বিশ্লেষণের ফলে যে বিভিন্ন রঙের আলোর উৎপত্তি হয়, তাহা পর্দার উপর ধরিলে সুন্দর বর্ণালি দেখা যায়।

বর্ণালির উৎপত্তি—সাদা অলোকরশ্মিতে যে বিভিন্ন রঙের আলোকরশ্মি রহিয়াছে তাহাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যও বিভিন্ন। ইহাদের মধ্যে লালরশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেশি, কমলা রঙের রশ্মিব তাহার চেয়ে কম, হলদে

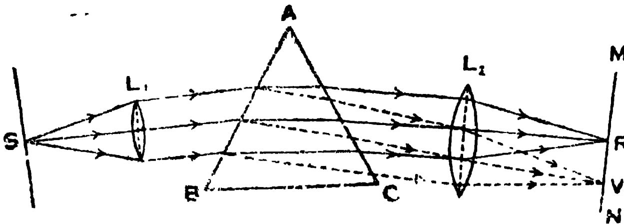


১০১নং চিত্র—বর্ণালির উৎপত্তি

রশ্মির আরও কম। এভাবে কমিতে কমিতে বেগনি রশ্মির বেলায় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম। ইহাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যেমন বিভিন্ন সেইরূপ ইহারা কাচ বা অন্য মাধ্যমের ভিতর দিয়া বিভিন্ন মাত্রায় প্রতিসৃত হয়; ফলে আপতিত রশ্মি হইতে বিভিন্ন পরিমাণে ইহাদের বিচ্যুতিও ঘটিয়া থাকে। এভাবে সাদা রশ্মির উপাদানগুলি পৃথকীকৃত হইয়া রঙিন বর্ণালির সৃষ্টি করে। বিষয়টি ছবির সাহায্য বুঝানো হইয়াছে। S বিন্দু হইতে একটি ছড়ানো সাদা রশ্মিগুচ্ছ বাহির হইয়া ABC প্রিজ্‌মের উপর আপতিত হইয়াছে।

প্রিজ্‌মটি না থাকিলে ঐ রশ্মিগুচ্ছ সোজা পথে গিয়া পর্দায় S_1 S_2 স্থানে আপতিত হইত। প্রিজ্‌মটি থাকায় এক প্রান্তের সাদা Sa রশ্মি হইতে লাল ও বেগনি রশ্মি প্রিজমের ভিতর দিয়া বিভিন্ন মাত্রায় প্রতিসৃত হইয়া যথাক্রমে a c R_1 ও a d V_1 পথে নির্গত হইয়া যাইবে। Sa রশ্মির অন্যান্য রঙের উপাদান R_1 ও V_1-এর মাঝামাঝি স্থানে পর্দার উপর পড়িবে। ফলে একটি সাদা রশ্মি Sa হইতে পর্দার উপর R_1 স্থান হইতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রঙের সমাবেশ সহ V_1 পর্যন্ত একটি বর্ণালির সৃষ্টি হইবে। রশ্মিগুচ্ছের অপর প্রান্তের Sb হইতেও একই প্রণালী মত R_2 V_2 স্থান ব্যাপিয়া একটি বর্ণালির সৃষ্টি হইবে। Sa ও Sb রশ্মির মাঝের অন্যান্য রশ্মি হইতে যে সব বর্ণালির সৃষ্টি হইবে তাহাদের মধ্যে বহু স্থানে বিভিন্ন রঙ্গের রশ্মির মিশ্রণ ঘটিবে। ফলে সম্পূর্ণ বর্ণালিটিতে রঙের ডোরাগুলি আর সুস্পষ্ট থাকিবে না। কেবল বর্ণালির দুই প্রান্তে লাল ও বেগনি রঙের প্রাধান্য দেখা যাইবে। এরূপ **বর্ণালি অশুদ্ধ** (Impure), কারণ ইহার নানা স্থানে বিভিন্ন রঙের মেশামেশি হইয়া থাকে।

বিশুদ্ধ বর্ণালি পাইবার উপায়—সূক্ষ্ম ছিদ্র S আলোকিত করিয়া একখানা উত্তল লেন্স সম্মুখে রাখ, যেন ছিদ্রটি ঐ লেন্সের ফোকাসে থাকে। তাহা হইলে লেন্স হইতে আলোকের রশ্মিগুলি

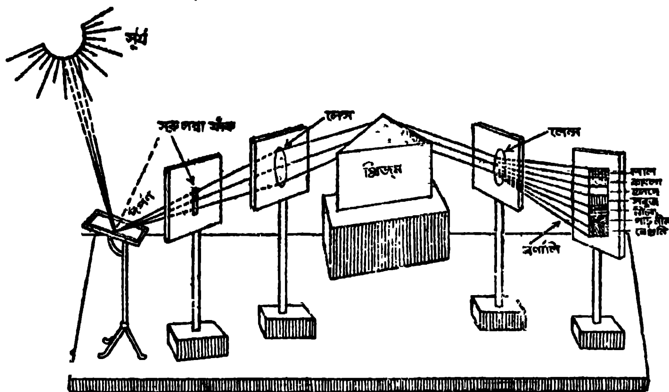


১০২নং চিত্র—বিশুদ্ধ বর্ণালি

সমান্তরাল হইয়া গিয়া প্রিজ্‌মের বিভিন্ন অংশে আপতিত হইবে। প্রিজ্‌মের ভিতর প্রতিসরণের ফলে লাল রশ্মিগুলির একই বিচ্যুতি ঘটিবে। ফলে তাহারা সমান্তরাল হইয়াই প্রিজ্‌ম হইতে নির্গত হইবে। বেগনি রশ্মিগুলির (বিন্দু দ্বারা গঠিত রেখা) বিচ্যুতি লাল রশ্মির চেয়ে বেশি হইলেও তাহাদের পরস্পরের বিচ্যুতি সমান হইবে। এজন্য তাহারাও সমান্তরাল হইয়া প্রিজ্‌ম হইতে নির্গত হইবে। মধ্যবর্তী অন্যান্য রঙের রশ্মিও প্রতিসরণের পর সমান্তরাল

হইয়া বাহির হইবে। এখন এই সব নির্গত রশ্মি ও পর্দার মধ্যে আর একটি উত্তল লেন্স L_2 বসাইয়া পর্দাটিকে লেন্সের ফোকাসে রাখিলে বিভিন্ন বর্ণের রশ্মিগুলি পর্দার উপর বিভিন্ন বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হইয়া বিশুদ্ধ বর্ণালির সৃষ্টি করিবে। ইহাতে বিভিন্ন রঙের ডোরা পৃথক পৃথক ভাবে দেখা যাইবে। এরূপ বর্ণালি পাওয়ার জন্য কিরূপ যান্ত্রিক ব্যবস্থা করিতে হয় ছবিতে দেখ।

সূর্যরশ্মি সমতল দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া একটি পর্দার লম্বা ফাঁকের উপর পড়িতেছে। ইহারা সম্মুখে একটি উত্তল লেন্স বসানো আছে। আলোকিত



১০৩নং চিত্র—বিশুদ্ধ বর্ণালি প্রস্তুত করিবার প্রণালী

ফাঁকটি যখন লেন্সের ফোকাসে থাকিবে তখন লেন্স হইতে সমান্তরাল রশ্মি বাহির হইয়া প্রিজ্‌মের উপর পড়িবে। প্রিজ্‌ম হইতে প্রতিসরণের ফলে বিভিন্ন রঙের রশ্মি নিজেদের মধ্যে সমান্তরাল থাকিয়া নির্গত হইবে। এই রশ্মিসমূহের সম্মুখে আর একটি উত্তল লেন্স রাখিলে লেন্সের ফোকাস-দূরত্বে অবস্থিত একটি পর্দার উপর বিশুদ্ধ বর্ণালির সৃষ্টি হইবে।

প্রশ্ন

১। আলোক যে এক প্রকার শক্তি তাহা কিরূপে বুঝা যায়?

২। আকাশে বিদ্যুৎ-ঝলক দেখার খানিক পরে কেন মেঘ-গর্জন শোনা যায়? যদি শব্দের গতি সেকেণ্ডে ১১২৬ ফুট হয় এবং বিদ্যুৎ-ঝলক দেখার ৬·৫ সেকেণ্ড পরে মেঘ-গর্জন শোনা যায় তাহা হইলে ঐ মেঘের দূরত্ব কত?

৩। কোন বস্তুর ছায়ার কিরূপে সৃষ্টি হয়? নিম্নলিখিত অবস্থায় কিরূপ ছায়া গঠিত হয় চিত্র আঁকিয়া দেখাও:—

(১) বিস্তৃত আলোক-প্রভব অপেক্ষা অস্বচ্ছ বস্তু বৃহত্তর।

(২) বিস্তৃত আলোক-প্রভব অপেক্ষা অস্বচ্ছ বস্তু ক্ষুদ্রতর।

৪। গ্রহণ কাহাকে বলে? চিত্র আঁকিয়া চন্দ্র ও সূর্য-গ্রহণের ব্যাখ্যা কর।

৫। সকল অমাবস্যা ও সকল পূর্ণিমাতে কেন গ্রহণ হয় না? সূর্যের পূর্ণগ্রাস গ্রহণ কেন খুব কম দেখা যায়?

৬। আলোকের প্রতিফলন কাহাকে বলে? সমতল দর্পণে প্রতিফলনের সূত্র দুইটি উল্লেখ কর। কি পরীক্ষা দ্বারা ইহা প্রমাণ করা যায়?

৭। সমতল দর্পণ হইতে প্রতিবিম্বের দূরত্ব সমতল দর্পণ হইতে বস্তুর দূরত্বের সমান। ইহার জ্যামিতিক প্রমাণ কি?

৮। সরল পেরিস্কোপের গঠন ও কার্য-প্রণালী ছবি আঁকিয়া বর্ণনা কর।

৯। উত্তল ও অবতল দর্পণ কাহাকে বলে? ইহাদের ফোকাস বলিলে কি বুঝা যায়?

১০। প্রমাণ কর যে অবতল দর্পণের ফোকাস-দূরত্ব বক্রতা-ব্যাসার্ধের অর্ধেক।

১১। অবতল দর্পণ কিরূপে বিভিন্ন প্রকারের প্রতিবিম্ব উৎপন্ন করে ছবি আঁকিয়া বুঝাইয়া বল।

১২। আলোকের প্রতিসরণ কাহাকে বলে? প্রতিসরণের কি কি সূত্র জান বল। কি পরীক্ষা দ্বারা প্রতিসরণের সূত্র প্রমাণ করা যায় চিত্রের সাহায্যে বুঝাইয়া বল।

১৩। বাস্তব জীবনে দেখা যায়, প্রতিসরণের এরূপ দুইটি দৃষ্টান্ত ছবি আঁকিয়া দেখাও।

১৪। প্রিজ্‌ম কাহাকে বলে? প্রিজ্‌মে কিরূপে আলোকের প্রতিসরণ হয় এবং তাহার ফলে আলোকের বিচ্যুতি ঘটে চিত্রের সাহায্যে বুঝাইয়া বল।

১৫। লেন্স কাহাকে বলে? ইহা কত প্রকার? ইহার ফোকাস ও ফোকাস-দূরত্ব কাহাকে বলে?

১৬। ছবি আঁকিয়া দেখাও উত্তল লেন্স কিরূপে বিভিন্ন প্রকারের প্রতিবিম্ব গঠন করে।

১৭। চক্ষুর গঠন ও কার্যপ্রণালী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

১৮। ফটোগ্রাফি ক্যামেরার গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর। ইহার সহিত চক্ষুর গঠনের তুলনা কর।

১৯। বিবর্ধক-কাচের কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর। কি ভাবে ইহার বিবর্ধন-ক্ষমতা স্থির করা যায়?

২০। কমপাউণ্ড মাইক্রোস্কোপের গঠন ও কার্যপ্রণালী, ইহার ভিতরে আলোকরশ্মির পথ দেখাইয়া বর্ণনা কর।

২১। টেলিস্কোপের গঠন ও কার্যপ্রণালী, আলোকরশ্মির পথ দেখাইয়া বর্ণনা কর।

২২। আলোকের বিচ্ছুরণ বলিলে কি বুঝ? কিরূপে প্রিজ্‌ম দ্বারা বিচ্ছুরণ ঘটিয়া থাকে?

২৩। বর্ণালি কাহাকে বলে এবং ইহা কি ভাবে উৎপন্ন হয় ছবি আঁকিয়া দেখাও।

২৪। অশুদ্ধ ও বিশুদ্ধ বর্ণালি কাহাকে বলে? বিশুদ্ধ বর্ণালি পাইতে হইলে কিরূপ যান্ত্রিক ব্যবস্থা করিতে হয়?

বিষয়গত প্রশ্ন

(নির্দেশ পূর্বের ন্যায়)

১। ঠিক উক্তি নির্বাচন

(ক) আলোক কি শক্তি? —

(খ) ক্ষুদ্র আলোক-প্রভবের সম্মুখে বিস্তৃত অস্বচ্ছ বস্তু থাকিলে ছায়া ও উপচ্ছায়ার সৃষ্টি হয় কি? —

(গ) চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়িবার ফলে সূর্য-গ্রহণ হয় কি? —

(ঘ) উত্তল লেন্স দ্বারা কখনও অসদ্ প্রতিবিম্ব গঠিত হয় কি? —

(ঙ) যে-কোন রঙের আলোকরশ্মি কাচের প্রিজ্‌মের ভিতর দিয়া গেলে বর্ণালির সৃষ্টি হয় কি? —

২। শূন্যস্থান পূরণ

(ক) সমতল দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইলে প্রতিবিম্ব—(১) দিকে —(১)
——(২) দূরে পড়ে। ডান হাতের প্রতিবিম্ব —(২)
——(৩) দিকে এবং বাম হাতের —(৩)
প্রতিবিম্ব——(৪) দিকে দেখা যায়। —(৪)

(খ) উত্তল দর্পণ দ্বারা বস্তুর——(১) —(১)
অবস্থানেই যে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তাহা——(২), —(২)
——(৩) —(৩)
এবং আকারে——(৪) হইয়া থাকে। —(৪)

(গ) একটা জলপূর্ণ পাত্রের তলদেশের কোন বিন্দু হইতে
আগত আলোকরশ্মি——(১) হইয়া বায়ুতে প্রবেশ করিলে —(১)
উহা জলতলের উপলম্ব হইতে——(২) সরিয়া যায় এবং —(২)
——(৩) কোন বিন্দু হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। —(৩)
তখন ঐ বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর——(৪) —(৪)
প্রতিবিম্ব বলা হয়।

৩। কয়েকটি উত্তরের মধ্যে ঠিক উত্তর নির্বাচন

(ক) একটি কাচের আয়তাকার ফলকের ভিতর দিয়া আলোকের যে বিচ্যুতি ঘটে প্রিজ্‌ম দ্বারা তাহার চেয়ে বেশি বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। কারণ

(১) প্রিজ্‌মের প্রতিসরণকারী কোণ আছে।
(২) একটি আয়তকার ফলকের বিচ্যুতি কম।
(৩) প্রিজ্‌মের দুইতল হইতে প্রতিসরণের ফলে বেশি বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে।

(খ) প্রিজ্‌মের ভিতর প্রতিসৃত হইবার ফলে সাদা আলোর বিভিন্ন রঙের রশ্মি বর্ণালিতে পৃথক্ পৃথক্ দেখা যায়। কারণ

(১) সাদা আলো প্রিজ্‌মের ভিতর প্রতিসৃত হয়।
(২) সাদা আলো প্রিজ্‌ম দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়।
(৩) সাদা আলোর বিভিন্ন রশ্মি প্রিজ্‌মের ভিতর দিয়া বিভিন্ন মাত্রায় প্রতিসৃত হয়।

তাপ (Heat)

১

তাপের প্রকৃতি

তোমরা পূর্বে জানিয়াছ আলোকের যেমন রশ্মি আছে তাপেরও সেইরূপ অদৃশ্য রশ্মি রহিয়াছে। আর এই সব রশ্মি ইথারের তরঙ্গ বা ঢেউয়ের আকারে প্রবাহিত হয়। তাপরশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আলোকরশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে বেশি। আলোকের মত তাপেরও তরঙ্গ আছে এই কথা মানিয়া নিলে তাপও যে আলোকের মত এক প্রকার শক্তি ইহাও মানিয়া নিতে হয়। এবিষয়ে একটি নিরপেক্ষ প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি।

কোন জিনিষ শীতল ও উত্তপ্ত অবস্থায় বিশেষ প্রণালীতে খুব সূক্ষ্ম ভাবে ওজন করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহার ওজন একই হয়। তাপ যদি কোন পদার্থ হইত তাহা হইলে জিনিসটি উত্তপ্ত হইলে তাহাতে পদার্থের মাত্রা বাড়িয়া যাইত; ফলে তাহার ওজনও বাড়িত। কাজেই তাপ পদার্থ নয়। তোমরা পূর্বে আরও জানিয়াছ যে এই পৃথিবীতে যত কিছু রহিয়াছে তাহার সবই হয় পদার্থ না হয় শক্তি। তাপ যখন পদার্থ নয় তখন তাহা শক্তিই হইবে। আলোক আমরা চক্ষু দিয়া অনুভব করি, আর তাপ আমরা চর্মের নীচের নার্ভ বা স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিয়া থাকি।

তাপ শক্তি—ইহা জানা গেল। কিন্তু ইহা হইতে একটি উত্তপ্ত জিনিষ ও একটি ঠাণ্ডা জিনিসের মধ্যে কি প্রভেদ এবং কেনই বা প্রভেদের সৃষ্টি হয় বুঝা গেল না। ইহা বুঝিতে হইলে পদার্থের গঠন সম্বন্ধে আগে জানিতে হইবে। মনে কর, কোনও পদার্থকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করিতে করিতে এমন অবস্থায় পৌঁছা গেল যে পদার্থের গুণ বজায় রাখিয়া উহাকে আর ভাগ করা চলে না। পদার্থের যে-ক্ষুদ্রতম অংশ তাহার গুণ বহন করে তাহাকে ঐ পদার্থের অণু বলে। এক একটি অণু এত ক্ষুদ্র যে সাধারণ মাইক্রোস্কোপ দিয়াও উহা দেখা যায় না। অণুগুলি সর্বদাই গতিশীল। অণুসমূহের গতির জন্যই পদার্থের গতীয় শক্তি (Kinetic Energy) রহিয়াছে। গতিশীল অণুগুলির মধ্যে সর্বক্ষণ ধাক্কাধাক্কি চলিতেছে। ইহার ফলে তাপের সৃষ্টি হয়। বাহির হইতে পদার্থের উপর তাপ দিলে অণুগুলির গতীয় শক্তি আরও

বাড়িয়া যায় এবং তাহাদের মধ্যে অধিকতর সংঘর্ষের ফলে পদার্থটিতে আরও বেশি তাপের সৃষ্টি হয়।

তাপ যখন শক্তি তখন ইহা হইতে কাজ পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপ কয়েকটি কাজের উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) কোন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে তাহার অবস্থাগত পরিবর্তন হয়। এক টুকরা লোহা খুব উত্তপ্ত করিলে লাল আলো এবং আরও বেশি উত্তপ্ত করিলে সাদা আলো দিতে থাকে। তাপ আরও বাড়াইলে লোহা, ইস্পাত প্রভৃতি গলিয়া যায়। তাপের মাত্রা খুব বেশি হইলে উহারা উবিয়া গ্যাস হইয়া যায়।

দেহের উপর তাপের প্রভাব তোমরা সর্বদাই অনুভব করিয়া থাক। খুব শীতে যখন শরীর জড়সড় হইয়া যায়, দেহে কাঁপুনি উঠে তখন আগুনের তাপ পাইলে শরীর আবার চাঙ্গা হইয়া উঠে এবং কর্মশক্তি ফিরিয়া আসে। তাপের শক্তি না থাকিলে পদার্থের পরিবর্তন কি ভাবে হয় আর দেহের কর্মশক্তিই বা কোথা হইতে আসে?

(২) তাপের সাহায্যে যন্ত্রাদি চালানো যায়। বাষ্পীয় ইঞ্জিনে তাপের সাহায্যে জল বহুগুণে বিবর্ধিত আকারের বাষ্পে পরিণত করা হয়। সেই বাষ্পের উচ্চ চাপে ইঞ্জিনের চাকা ঘুরানো হয়। তাপের সাহায্যে জল হইতে বাষ্প উৎপন্ন করিয়া বিশেষ রকমের যন্ত্রের সাহায্যে ডাইন্যামোর আর্মেচার বা তারের কুণ্ডলী ঘুরানো হয়। এভাবে তড়িৎ উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে উত্তাপশক্তি তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই তড়িতের সাহায্যে আলো জ্বালানো, পাখা, ট্রাম ও রেলগাড়ি চালানো প্রভৃতি বহু কাজ করা যায়।

(৩) তাপ হইতে সোজাসুজি তড়িৎ-উৎপাদনেরও দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ভিন্ন ধাতুর দুইটি তার দুই প্রান্তে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হইলে একটি বর্ত্মনী তৈয়ারি হয়। ঐ বর্ত্মনীর এক প্রান্ত উত্তপ্ত করিলে তাহার মধ্যে তড়িতের সৃষ্টি হয়।

(৪) তাপের সাহায্যে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য-প্রস্তুতি হইতে আরম্ভ করিয়া নানারূপ শিল্পের সাহায্যে বর্তমান সভ্যতার অত্যাবশ্যক নানা রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধপত্র, লোহা, ইস্পাত প্রভৃতি প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

২

তাপের উৎস

আমরা সাধারণত যে যে উপায়ে তাপ পাই নিম্নে তাহা বলা হইতেছে।

(১) **সূর্য**—তাপের প্রধান ও মূল উৎস সূর্য। সূর্য হইতেই আমরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সমস্ত তাপ পাইয়া থাকি। সূর্য জ্বলন্ত গ্যাস সমষ্টির একটি অতি বৃহদাকার গোলক। ইহার বাহিরের দিকের উষ্ণতা প্রায় ৬০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড; ভিতরের উষ্ণতা অনেক লক্ষ ডিগ্রি হইবে। উষ্ণতার মাপের কথা পরে জানিতে পারিবে। সূর্য হইতে প্রতিনিয়ত তাপ ও আলোকরশ্মি বাহির হইতেছে। এই রশ্মির পরিমাণ এত বেশি যে আমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। সূর্য হইতে মোট যে পরিমাণ রশ্মি নির্গত হয় আমাদের পৃথিবী নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া উহার বিশ হাজার লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র পাইতেছে। সূর্যরশ্মির এই নগণ্য অংশেই এত বেশি তাপ যে প্রতি সেকেণ্ডে ছয় লক্ষ টন কয়লা পুড়াইলে তাহা পাওয়া যাইতে পারে। ইহা হইতে বুঝিতে পার যে পৃথিবীতে তাপ পাওয়ার জন্য সূর্যের স্থান অধিকার করিবার মত কোন ব্যবস্থাই করা যাইতে পারে না। সূর্যরশ্মি হইতেই পৃথিবীপৃষ্ঠে আমাদের বাসোপযোগী তাপ পাওয়া যায়। পৃথিবীর মেরুদেশে সূর্যকিরণ হেলান ভাবে অনেক কম পড়ে বলিয়া সেখানে জীবনযাপন করা খুবই কঠিন। সূর্যের তাপ না পাইলে পৃথিবীর উষ্ণতা শূন্য ডিগ্রির বহু নীচে নামিয়া যাইত এবং জল হইতে বাষ্পীভবন, মেঘের সৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি কিছুই ঘটিতে পারিত না। ফলে পৃথিবী জীবের বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িত।

(২) **যান্ত্রিক ক্রিয়া**—তোমরা দুই হাতের তালু জোরে ঘষিলে দেখিবে উহা বেশ গরম হইয়া উঠে। ঘর্ষণের ফলেই এক্ষেত্রে তাপের সৃষ্টি হয়। ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি শান দিবার সময় লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে ঘর্ষণের ফলে আগুনের ফুলকি বাহির হয়। সৃষ্টির আদিম যুগে সূর্যের আলো ও তাপই মানুষের একমাত্র ভরসা ছিল। তাহার পর মানুষ দুই টুকরা কাঠ ঘষিয়া আগুন ধরাইতে শিখিল। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে আগুন-ধরানো ব্যাপারটা একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার। ইহা হইতেই

মানুষের উন্নত ধরনের জীবনযাত্রা-নির্বাহের সূত্রপাত হইল। বর্ত্তমান যুগেও আমরা দেশলাইয়ের কাঠি বাক্সের গায়ে লাগানো রাসায়নিক দ্রব্যে ঘষিয়া আগুন জ্বালাইয়া থাকি।

(৩) **রাসায়নিক ক্রিয়া**—আমাদের বাড়িঘরে ও কলকারখানায় যে তাপ ব্যবহার করা হয় তাহার বেশির ভাগই কাঠ, কয়লা, খনিজ তৈল, গ্যাস প্রভৃতি পুড়াইয়া উৎপন্ন করা হয়। ঐসব পদার্থ পুড়াইলে বায়ুর অক্সিজেনের সহিত রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে প্রচুর পরিমাণ তাপের সৃষ্টি হয়। আমাদের দেহেও খাদ্যবস্তুর সহিত অক্সিজেনের মৃদু দহনের ফলে তাপের সৃষ্টি হয়। সেই তাপ হইতেই আমরা কাজ করিবার শক্তি পাইয়া থাকি।

(৪) **তড়িৎ**—ইলেকট্রিক বাল্‌বের সরু তারের ভিতর দিয়া তড়িৎপ্রবাহ চলিলে আলোক ও তাপ উৎপন্ন হয়। ইলেকট্রিক উনান, ইস্ত্রি প্রভৃতিতে তড়িৎশক্তি হইতেই তাপশক্তি পাওয়া যায়।

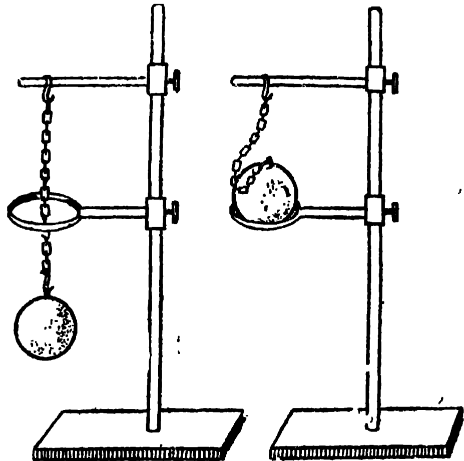
সূর্যই সব শক্তির মূল বা ভিত্তি—মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী যত প্রকারের শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে না হউক পরোক্ষ ভাবে সূর্য হইতেই আসে। সূর্যের আলোকশক্তির সাহায্যেই গাছের সবুজ পাতা খাদ্য প্রস্তুত করিয়া গাছের দেহ পুষ্ট করে। কাজেই কাঠ পুড়াইয়া যে তাপশক্তি পাওয়া যায় তাহার মূল উৎস সূর্যের আলোকশক্তি। গাছ হাজার হাজার বৎসর মাটির নীচে থাকিয়া চাপ ও তাপের ফলে কয়লাতে রূপান্তরিত হইয়াছে। সুতরাং কয়লা হইতে যে তাপ পাওয়া যায় তাহার পিছনেও সৌরশক্তিরই প্রভাব দেখা যায়। খনিজ তৈল, যেমন—পেট্রলিয়াম, প্রাচীন কালের সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। ঐ সব জীব সূর্যের শক্তিতেই পুষ্ট হইয়াছিল। কাজেই খনিজ তৈল পুড়াইয়া যে শক্তি পাওয়া যায় তাহাও পরোক্ষ ভাবে সূর্য হইতেই উৎপন্ন। ডাইন্যামো হইল আমাদের তড়িতের উৎস। কিন্তু ডাইন্যামো চালাইবার জন্য যে ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয় তাহা চালাইবার জন্য কয়লা পুড়াইতে হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় তড়িৎশক্তিও সূর্যের শক্তির রূপান্তর মাত্র। আমরা উদ্ভিদ ও প্রাণিভোজী। সেই হিসাবে আমাদের দেহের শক্তির সঙ্গে সৌরশক্তির কি সম্বন্ধ বল দেখি।

৩

তাপের প্রভাব

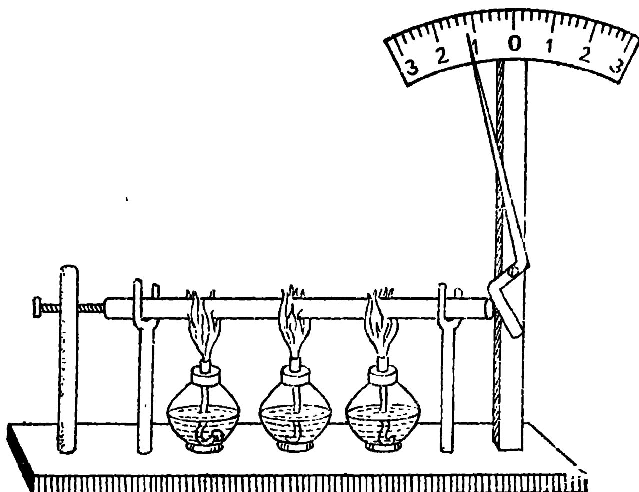
মানুষ বিভিন্ন প্রকারে তাপ উৎপাদন করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু ইহাকে সম্পূর্ণ বশে আনিতে পারে নাই। উনানে কয়লা জ্বালাইয়া রান্নার জন্য যে তাপের সৃষ্টি করা হয় তাহার বেশির ভাগই উপরের চিমনি দিয়া চলিয়া যায়। রেলগাড়ির ইঞ্জিনে কয়লা পুড়াইয়া যে তাপ উৎপাদন করা হয় তাহার দশ ভাগের নয় ভাগেরই অপচয় ঘটে। তাপশক্তিকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করিতে হইলে পদার্থের উপর ইহার কিরূপ ক্রিয়া হয় আগে জানা দরকার। পদার্থের মাধ্যম ছাড়া কোন প্রকারের শক্তিই প্রয়োগ করা যায় না। কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থায় পদার্থের উপর তাপের ক্রিয়া কিরূপ হয় এখন তোমরা জানিবে।

কঠিন পদার্থের উপর তাপের ক্রিয়া—১ম পরীক্ষা—কঠিন বস্তুর আয়তনের বৃদ্ধি—একটি পিতলের আংটার ভিতর দিয়া শিকল দিয়া ঝুলানো একটি পিতলের বল স্বাভাবিক অবস্থায় ঠিক গলিয়া যাইতে পারে। একটা চিমটার সাহায্যে শিকলে ধরিয়া বলটিকে দূরে টানিয়া নিয়া স্পিরিট ল্যাম্প দিয়া উত্তপ্ত কর। এখন দেখা যাইবে উত্তপ্ত বলটি আর আংটার ভিতর দিয়া যাইতে পারে না, আংটার উপরে আটকাইয়া পড়িয়াছে। কিছুক্ষণ পরে বলটি ঠাণ্ডা হইলে আবার আংটার ভিতর দিয়া নীচে ঝুলিয়া পড়িবে। ইহা হইতে বুঝা যায় তাপে বলটির আয়তন বাড়িয়া যায়। এই পরীক্ষা হইতে জানা গেল—**তাপে কঠিন বস্তুর আয়তনের বৃদ্ধি হয়।**



১০৪নং চিত্র—কঠিন বস্তুর আয়তনের বৃদ্ধি

২য় পরীক্ষা—কঠিন বস্তুর দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি—একটি লোহা বা তামার দণ্ড লইয়া চিত্রে প্রদর্শিত যন্ত্রের দুইটা খাঁজের উপর অনুভূমিক করিয়া বসাও। একটা স্ক্রু দণ্ডের বাম প্রান্ত ঠেলিয়া রাখিয়াছে। সেজন্য দণ্ডটি বামদিকে সরিতে পারে না। উহার ডান প্রান্ত একটি শলাকার নীচের দিকে লাগা

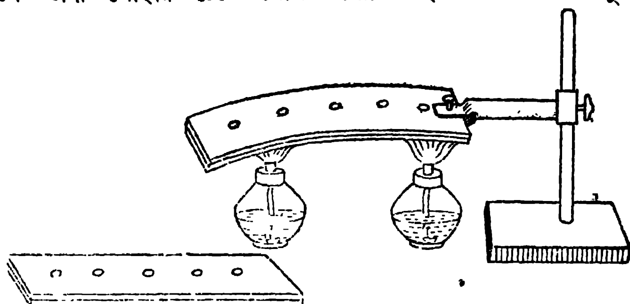


১০৫নং চিত্র—তাপে কঠিন বস্তুর দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি

আছে। ঐ শলাকাটি এমন ভাবে আটকানো আছে যে উহা একটা বৃত্তাকার স্কেলের উপর ঘুরিতে পারে। এখন দণ্ডটি একাধিক স্পিরিট ল্যাম্প দিয়া উত্তপ্ত কর। দেখিবে শলাকাটি স্কেলের উপর ডানদিক হইতে ক্রমাগত বাম দিকে সরিতেছে। স্পিরিট ল্যাম্প সরাইয়া নিয়া দণ্ডটিকে ঠাণ্ডা হইতে দিলে শলাকাটি আবার ডান দিকে পূর্ব স্থানে ফিরিয়া আসিবে। দণ্ডটি উত্তপ্ত করিলে বাম দিকে সরিতে পারে না; বাড়িয়া শলাকাটির নীচ দিক ডান দিকে ঠেলিয়া দেয়। সেইজন্য শলাকার উপর দিক বাম দিকে সরিয়া যায়। এই পরীক্ষা হইতে দেখা গেল **তাপে কঠিন বস্তুর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়।**

৩য় পরীক্ষা—বিভিন্ন কঠিন পদার্থের প্রসারণ বিভিন্ন—একটি লোহার ও একটি তামার পাত সাধারণ তাপমাত্রায় রিভিট (rivet) করিয়া একসঙ্গে আটকানো আছে। একটি কাঠের হাতলের সাহায্যে ঐ মিশ্র পাতটিকে ধরিয়া স্পিরিট-ল্যাম্প দিয়া উহা বেশ উত্তপ্ত কর। দেখিবে পাতটি বাঁকিয়া গিয়াছে এবং তামার পাত বাহিরের দিকে ও

লোহার পাত ভিতরের দিকে রহিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে তাপ প্রয়োগে তামা লোহার চেয়ে বেশি প্রসারিত হয়। অন্যান্য ধাতুর পাত



১০৬নং চিত্র—লোহার ও তামার পাতের প্রসারণ বিভিন্ন

নিয়া পরীক্ষা করিলেও দেখা যাইবে **বিভিন্ন কঠিন পদার্থের প্রসারণ বিভিন্ন।**

তাপে পদার্থের প্রসারণের ব্যবহারিক প্রয়োগ— তাপপ্রয়োগে কঠিন পদার্থের প্রসারণের ব্যাপার মানুষ নানা কাজে লাগায়। নিম্নে তাহার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইতেছে :

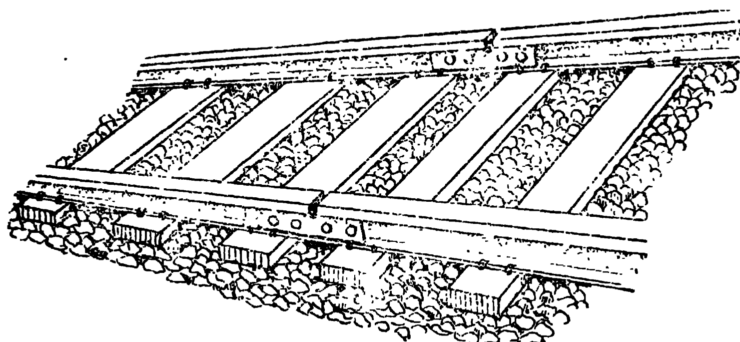
(১) গরু ও ঘোড়ার গাড়ির চাকার চারিদিকে অনেক সময় লোহার বেড় পরানো হয়। সেইজন্য চাকার ঘের হইতে খুব সামান্য ছোট ঘেরের লোহার বেড় নিয়া উহা খুব উত্তপ্ত করা হয়। উত্তাপে লোহার বেড় বড় হইয়া যায়। তখন সহজেই উহা লাগানো যায়। তাহার পর ঐ বেড় ঠাণ্ডা হইলে সঙ্কুচিত হইয়া চাকার উপরে খুব জোরে আঁটিয়া থাকে।

(২) কখনও কখনও শিশিতে কাচের ছিপি এমন ভাবে আঁটিয়া যায় যে উহা খোলা যায় না। শিশির মুখ একটু গরম করিলে মুখের ব্যাস সামান্য বাড়ে এবং ভিতর হইতে ছিপি সহজেই বাহির করা যায়। যদি ধাতব ঢাকনি দিয়া শিশির মুখ বন্ধ থাকে তবে ঢাকনিটিকেই গরম করিতে হয়।

(৩) দুইখানি ধাতুর পাত জুড়িতে উহাতে রিভিট বা খিল গরম অবস্থায় লাগানো হয়। রিভিট ঠাণ্ডায় সঙ্কুচিত হইয়া পাত দুইখানিকে খুব জোরে চাপিয়া ধরে।

কঠিন পদার্থের প্রসারণের জন্য অসুবিধা— অনেক সময় তাপ পদার্থের প্রসারণ ঘটাইয়া মানুষের কাজে অসুবিধার সৃষ্টি করে সেইজন্য নানা ভাবে প্রতিরোধক ব্যবস্থা করিতে হয়।

(১) রেল লাইন পাতিবার সময় দুইখানি রেলের মধ্যে কিছু ফাঁক রাখা হয়। রৌদ্রের প্রখর তাপে ও রেলগাড়ির চাকার ঘর্ষণে রেল উত্তপ্ত হইলে তাহার প্রসারণ হয় এবং তাহার জন্য একটু ফাঁক রাখিতে হয়। রেলগুলি মুখে মুখে লাগাইয়া বসাইলে প্রসারণের ফলে লাইন বাঁকিয়া যাইতে পারে।



১০৭নং চিত্র—দুইটি রেলের মধ্যে ফাঁক

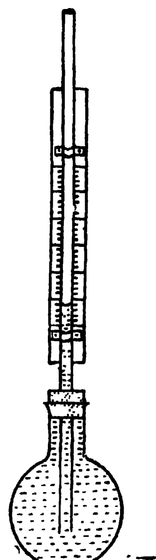
(২) বিজ্ঞানাগারে পরীক্ষার কাজে নানারূপ কাচের পাত্রে বিভিন্ন জিনিস উত্তপ্ত করিতে হয়। কাচের পাত্রের এক অংশ উত্তপ্ত হইলে সেই স্থানটি প্রসারিত হয়, কিন্তু কাচ খুব ভাল তাপ-পরিবাহী নহে বলিয়া পাত্রের অন্য অংশ সেই পরিমাণে প্রসারিত হয় না। ফলে পাত্রটি ফাটিয়া যায়। এজন্য কাচপাত্রে তাপ দেওয়ার প্রথম অবস্থায় উহাকে অগ্নিশিখার উপরে ঘুরাইয়া সব দিকে সমান ভাবে তাপ দিতে হয়।

(৩) ধাতুনির্মিত স্কেলের দুই দাগের মধ্যের দূরত্ব গ্রীষ্মকালে বাড়ে ও শীতকালে কমে। এরূপ স্কেল ব্যবহার করিতে হইলে স্কেলের ধাতুর দৈর্ঘ্য তাপ প্রয়োগের ফলে কি হারে বাড়ে জানিয়া মাপের সংশোধন করিতে হয়।

তরল পদার্থের উপর তাপের ক্রিয়া—পরীক্ষা—তরল পদার্থের উপর তাপের ক্রিয়া কিরূপ জানিতে হইলে সরুগলা-বিশিষ্ট একটি কাচের ফ্লাস্ক রঙিন জলদ্বারা পূর্ণ কর। ইহার মুখে লাগিতে পারে এমন একটি কর্ক লইয়া ইহাতে ছিদ্র কর এবং ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়া দুই মুখ খোলা একটি কাচের নল ঢুকাইয়া নলসহ কর্ক দ্বারা ফ্লাস্কের মুখ বন্ধ কর। একটি স্কেল ঐ নলের সঙ্গে সংযুক্ত কর। কর্কটি ফ্লাস্কের

মুখে এমন ভাবে আঁটিয়া দিতে হইবে যেন রঙিন জল নলের মধ্যে কিছু দূর পর্যন্ত উঠিয়া থাকে। স্কেলের উপর সেই স্থানটি লক্ষ্য কর।

এখন একটি বড় পাত্রে গরম জল রাখিয়া ফ্লাস্কটি তাহার মধ্যে ডুবাইয়া বসাও। প্রথমে দেখিবে নলের মধ্যে রঙিন জল কিছু দূর পর্যন্ত নীচে নামিয়া গিয়াছে। পরে নলের জল আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠিতে থাকিবে। বড় পাত্রে গরম জলের বদলে ফুটন্ত জল রাখিয়া তাহাতে ফ্লাস্কটি ডুবাইলে নলের জল শেষ পর্যন্ত আরও বেশি উপরে উঠিবে।



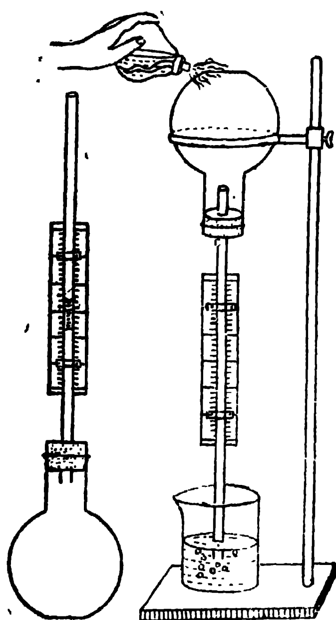
১০৮ নং চিত্র—তাপে তরল পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি

ফ্লাস্কটি গরম বা ফুটন্ত জলে ডুবাইলে নলের ভিতরের রঙিন জল প্রথম নীচে নামিয়া যায়। ইহার কারণ জলের সংস্পর্শে আসিয়া প্রথমে কাচপাত্রটির আয়তন বাড়িয়া যায়। জলের আয়তন তখনও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায় নাই। একটু পরেই জলের মধ্যে তাপ সঞ্চালনের ফলে ইহার আয়তন কঠিন পদার্থ কাচ অপেক্ষা অনেক বেশি বাড়িয়া যায়। ফলে শেষ পর্যন্ত নলের ভিতরে রঙিন জল সর্বপ্রথম যেখানে ছিল সেই স্থান ছাড়াইয়া আরও উপরে উঠিয়া যায়। এই পরীক্ষা অ্যালকোহল, তেল প্রভৃতি অন্য তরল পদার্থ নিয়া করিলেও অনুরূপ ফল পাওয়া যাইবে। ইহাতে প্রমাণ হইল যে, **তাপের প্রভাবে তরল পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পায়।**

গ্যাসীয় পদার্থের উপর তাপের ক্রিয়া—১ম পরীক্ষা—একটি রবারের বেলুনে কিছু পরিমাণ হাওয়া ঢুকাইয়া ইহার মুখ শক্ত করিয়া বাঁধ। তাহার পর বেলুনটিকে উনানের পাশে বা রৌদ্রে রাখিয়া দাও। দেখিবে বেলুনটি ফুলিয়া উঠিয়াছে। বেলুনের ভিতরকার বায়ু তাপ পাইয়া আয়তনে বাড়িয়া গিয়া বেলুনটিকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে।

২য় পরীক্ষা—তরল পদার্থের উপর তাপের ক্রিয়ার পরীক্ষার জন্য ফ্লাস্কের সঙ্গে যেই রূপে কাচের নল লাগানো হইয়াছিল সেইরূপে একটি ফ্লাস্কের সঙ্গে একটি নল লাগাও। ফ্লাস্কটি উল্টাইয়া নলের খোলা মুখ একটা বীকারের মধ্যে রঙিন জলের নীচে রাখ। ফ্লাস্কের উপর সামান্য তাপ দিয়া (ছবিতে

ডানদিকের অবস্থা) উহা হইতে কয়েকটি বায়ুর বুদ্‌বুদ্ বাহির করিয়া দাও। তাপ দেওয়া বন্ধ করা মাত্রই বায়ুর শূন্যস্থান পূরণের জন্য একটু জল নলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবে। ফ্লাস্কটি উল্টাইয়া বসাইয়া রাখিলে ইহার মধ্যস্থিত বায়ু পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে এবং রঙিন জলটুকু নলের ভিতরে একটা নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করিবে (ছবিতে বামদিকের অবস্থা)। এখন ফ্লাস্কটি হাত দিয়া ধরিলে রঙিন জলের ক্ষুদ্র স্তম্ভটি উপরের দিকে উঠিবে। হাত সরাইয়া আনিলে স্তম্ভটি আবার পূর্বের স্থানে ফিরিয়া আসিবে। হাতের উত্তাপে ফ্লাস্কের ভিতর যে বায়ু আছে তাহার আয়তনের প্রসারণ হয় এবং প্রসারিত বায়ু জলের স্তম্ভটিকে ঠেলিয়া উপরের দিকে তুলে। গরম হাতে ফ্লাস্কটিকে চাপিয়া ধরিলে হাতের গরমেই রঙিন জলের স্তম্ভটিকে অনেক সময় নল হইতে ঠেলিয়া বাহির করা যায়। ফ্লাস্কটি খুব বড় না হইলে প্রথম অবস্থায় হাতের গরমেই নলের ভিতর জল ঢুকানো যায়। এই পরীক্ষা দুইটি হইতে বুঝা গেল যে **তাপের প্রভাবে গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পায়।**



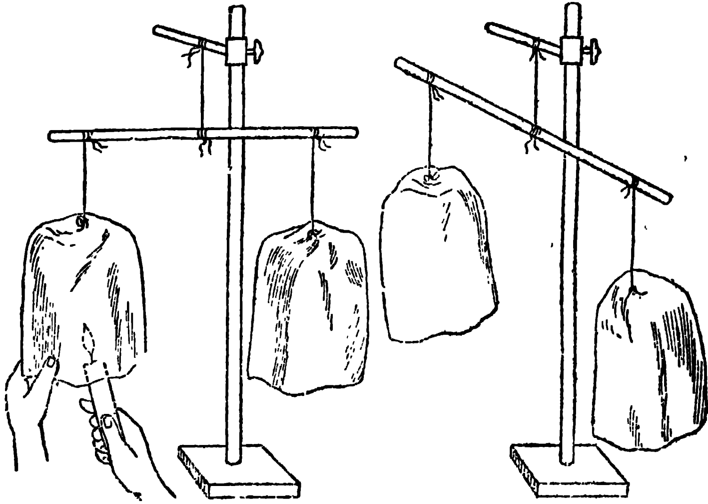
১০৯ নং চিত্র—তাপে বায়ুর আয়তন বৃদ্ধি

তাপে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ সমস্তই প্রসারিত হয়, কিন্তু সমান উত্তাপ পাইলে সমআয়তনের কঠিন পদার্থ অপেক্ষা তরল পদার্থের এবং তরল পদার্থ অপেক্ষা গ্যাসের আয়তন বেশি বৃদ্ধি পায়।

গ্যাসীয় পদার্থের প্রসারণের ফল—(১) আয়তন-বৃদ্ধির ফলে বায়ু হালকা হইয়া যায়—

পরীক্ষা—সমান আয়তনের দুইটি কাগজের ঠোঙ্গা সংগ্রহ কর। নীচের দিকে সুতা লাগাইয়া উহাদিগকে উল্টাইয়া একটি হাতে তৈয়ারি নিক্তির দুই দিক হইতে ঝুলাও, যেন নিক্তির দণ্ডটি অনুভূমিক থাকে। এখন বাম দিকে ঠোঙ্গার

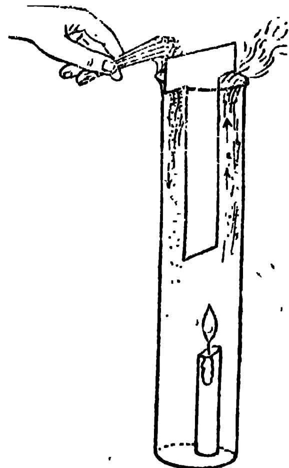
নীচে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি রাখিয়া উহার ভিতরের বায়ু উত্তপ্ত কর। দেখিবে নিক্তির দণ্ডটি ডান দিকে হেলিয়া পড়িবে। ডান দিকের ঠোঙ্গায় যে পরিমাণ



১১০নং চিত্র—গরম বায়ু ঠাণ্ডা বায়ু অপেক্ষা হাল্কা

ঠাণ্ডা বায়ু আছে বাম দিকের ঠোঙ্গায় সেই পরিমাণ গরম বায়ু রহিয়াছে। পাল্লা ডান দিকে হেলিয়া পড়ায় বুঝা যাইতেছে **সমান পরিমাণের ঠাণ্ডা বায়ু অপেক্ষা গরম বায়ু হালকা।**

(২) গরম বায়ু উপরের দিকে উঠিয়া যায়— ১ম পরীক্ষা —বাতির চিমনির ভিতর বায়ু চলাচল—একটি মোমবাতি জ্বালাইয়া টেবিলের উপর আটকাইয়া বসাও এবং একটি চিমনি দিয়া বাতিটি ঢাকিয়া দাও। মোমবাতি আস্তে আস্তে নিবিয়া যাইবে। বাতি জ্বলার ফলে গরম বায়ু হালকা হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং বাতিটি বাহির হইতে অক্সিজেনপূর্ণ শীতল বায়ু না পাওয়ায় নিবিয়া যায়। শীতল বায়ুস্রোত চিমনীর উপর দিয়া সুবিধামত



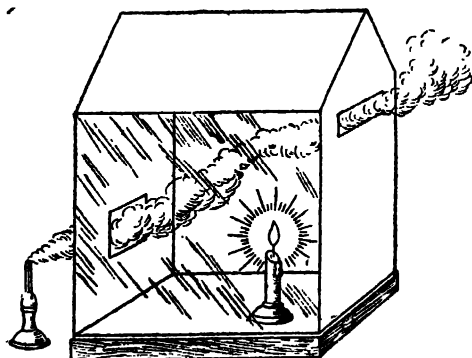
১১১নং চিত্র—চিমনির ভিতর বায়ু-চলাচল

ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না, কারণ সেই পথ দিয়া হালকা গরম বায়ুর স্রোত বাহিরের দিকে চলে।

বাতিটি নিবিয়া যাইবার উপক্রম হইলে T-আকৃতির একটি পিজবোর্ড চিমনির মুখে এমন ভাবে বসাইয়া দাও, যেন মোমবাতিটি উহার এক পার্শ্বে থাকে। এমন ধূপকাঠি জ্বালাইয়া চিমনির মুখে পিজবোর্ডের দুই দিকে পর পর ধরিলে ধূয়ার পথ দেখিয়া বুঝায় যাইবে, যেদিকে মোমবাতি আছে সেদিক দিয়া উষ্ণ বায়ুস্রোত উপরের দিকে উঠিতেছে এবং অন্য দিক দিয়া বাহিরের বায়ুস্রোত চিমনির ভিতর প্রবেশ করিতেছে।

সূর্যের উত্তাপে বায়ুমণ্ডলে কোন স্থানের বায়ু বেশি উত্তপ্ত হইলে উপরে উঠে এবং সেখানে অন্যান্য স্থান হইতে শীতল বায়ু ছুটিয়া আসে। এভাবে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়।

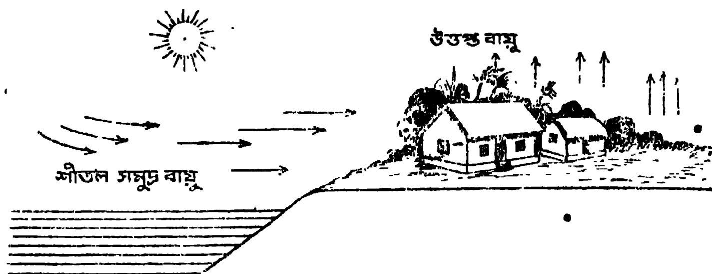
২য় পরীক্ষা—ঘরের ভিতরে বায়ু-চলাচল—কাঠ দিয়া বাক্সের মত বড় একটি ঘরের নমুনা প্রস্তুত কর। ঐ ঘরের এক দিকের দেওয়ালের উপরে এবং বিপরীত দিকের দেওয়ালের নীচের দিকে ফোকর রাখ। বাক্সের সম্মুখের দিকে কাচের ঢাক্‌না থাকিবে। ঢাকনাটি তুলিয়া একটী জলন্ত মোমবাতি ভিতরে রাখ। আমাদের বাসের ঘরে লোকের শ্বাস-প্রশ্বাসে ও প্রদীপ জ্বালাইবার ফলে বায়ু উত্তপ্ত হয়। বাক্স-টিতেও মোমবাতি জ্বলিবার ফলে বায়ু উত্তপ্ত হয়। নীচের জানালার নিকট ধূপকাঠি জ্বালাইয়া রাখিলে দেখা যাইবে ধোঁয়া ঐ জানালা দিয়া বাক্সের ভিতর প্রবেশ করিয়া বিপরীত দিকের উপরের জানালা দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে।



১১২নং চিত্র—ঘরের ভিতর বায়ু-চলাচল

ঘরের ভিতরের গরম বায়ু উপরের দিকের ফোকর দিয়া বাহির হইয়া যায় এবং বাহিরের শীতল বায়ু নীচের জানালা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া ইহার স্থান পূরণ করে।

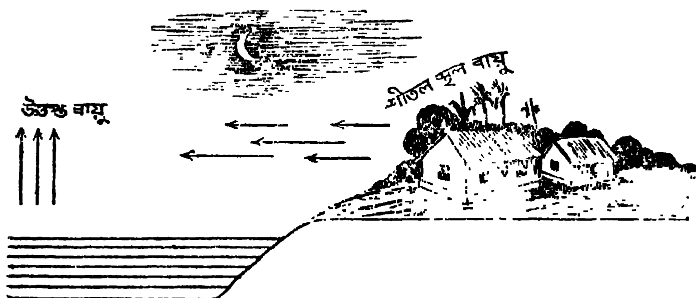
সমুদ্রবায়ু (Sea Breeze)—সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থানে দিনের বেলায় সূর্যের তাপে স্থলভাগের মাটি, পাথর প্রভৃতি জল অপেক্ষা দ্রুত গরম হয়। ফলে গরম স্থলভাগের উত্তপ্ত বায়ু উপরে উঠিয়া যায় এবং সমুদ্র হইতে



১১৩নং চিত্র—সমুদ্রবায়ু

অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বায়ু শূন্য স্থান অধিকার করিবার জন্য স্থলের দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু-প্রবাহকে **সমুদ্রবায়ু** বলে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই বায়ুস্রোত প্রবাহিত হয়।

স্থলবায়ু (Land Breeze)—রাত্রি বেলায় স্থলভাগ জলভাগ অপেক্ষা দ্রুত ঠাণ্ডা হইতে থাকে। ফলে সমুদ্রের উপরের বায়ু স্থলভাগের উপরের



১১৪নং চিত্র—স্থলবায়ু

বায়ু হইতে বেশি গরম থাকে। এজন্য রাত্রিকালে স্থলভাগ হইতে সমুদ্রের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়। ইহাকে **স্থলবায়ু** বলে। গ্রীষ্মমণ্ডলে সমুদ্র কূলের নিকটবর্তী স্থানে এই দুইটি বায়ু প্রবাহিত হয়, তবে স্থলবায়ু সমুদ্রবায়ুর মত নির্দিষ্ট ও নিয়মিত ভাবে পাওয়া যায় না।

৪

তাপ ও উষ্ণতা

তোমরা জান তাপ এক প্রকার শক্তি। সব বস্তুতেই কিছু না কিছু তাপ আছে। গরম জলে তাপ আছে, আর এক গ্লাস ঠাণ্ডা জলে তাপ নাই মনে করিতে পার, কিন্তু ইহাতেও তাপ আছে। ইহার মধ্যে এক টুকরা বরফ ফেলিয়া দিলে উহা গলিয়া যায়। গ্লাসের জলের খানিকটা তাপ বরফকে গলাইয়া দেয়।

কোন বস্তুতে তাপ প্রয়োগ করিলে উহা সাধারণত উষ্ণ হইয়া উঠে। তাপ যত বেশি দেওয়া যায় বস্তুটি সাধারণত তত বেশি উষ্ণ হয় আমরা এরূপ অনুভব করি। আবার একই পরিমাণ তাপ বেশি পরিমাণ বস্তুর মধ্যে ছড়াইয়া পড়িলে তাপ যেন কমিয়া গিয়াছে মনে হয়। এক গ্লাস ফুটন্ত জলে হাত দিলে উহা আমরা খুবই গরম বলিয়া অনুভব করি, কিন্তু এক বালতি সাধারণ জলের সহিত উহা মিশাইলে ঐ মিশ্রিত জল আর বিশেষ গরম মনে হইবে না। গ্লাসে যে গরম জল ছিল উহা বালতির জলের সহিত মিশাইবার পর মোট তাপের পরিমাণ কিছু কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। কারণ বালতির সাধারণ জলেও তাপ ছিল। অথচ মিশ্রিত জলের বেশি তাপও হাত দিয়া গরম মনে হইবে না। ইহা হইতে বুঝা যায় কোন বস্তুর মধ্যে তাপের পরিমাণ হইল এক বিষয়, আর উহা উষ্ণ কি শীতল সেই অনুভূতি হইল অন্য ব্যাপার। **কোন বস্তু উষ্ণ কি শীতল তাহার মাপকে উষ্ণতা (Temperature)** বলে। মনে রাখিও উষ্ণতা তাপের মাপ নহে, কারণ আমরা এই মাত্র দেখিলাম কোন বস্তুর তাপের মাত্রার সঙ্গে উহা উষ্ণ কি শীতল এই অনুভূতির সব সময়ে সম্পর্ক থাকে না।

উষ্ণ ও শীতল জিনিস সংস্পর্শে আসিলে উহাদের উষ্ণতা এক না হওয়া পর্যন্ত উহাদের মধ্যে তাপ-বিনিময় হয়। এই হিসাবে বলা যায় উষ্ণতা হইল একটি **তাপীয় অবস্থা** এবং উহা তাপ-প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। একটি সূঁচ গরম করিলে লাল হইয়া যায়। এক বালতি গরম জলে ইহার চেয়ে অনেক বেশি তাপ রহিয়াছে। অথচ খুব উত্তপ্ত সূঁচটি গরম জলে ডুবাইলে তাপ সূঁচ হইতে বালতির জলে প্রবাহিত হইবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না

উভয়ের উষ্ণতা সমান হয়। এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে তাপ সঞ্চালিত হইবে কিনা তাহা উহাদের উষ্ণতার উপর নির্ভর করে, তাপের উপর নয়।

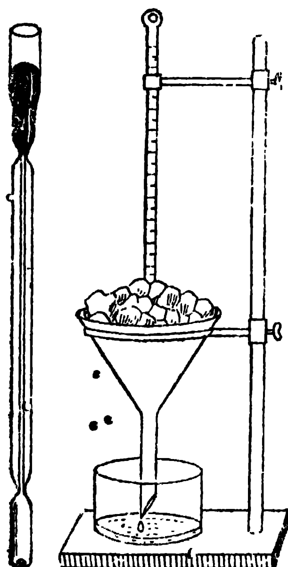
কোন বস্তুর তাপ ও উষ্ণতার সহিত একটি পাত্রের জল ও জলতলের উচ্চতার তুলনা করা যাইতে পারে। মনে কর দুইটি পাত্রে জল আছে। উভয় পাত্রের নীচ দিকে উহাদের মধ্যে জল-চলাচলের জন্য নল লাগাইয়া দিলে যে পাত্রের জলতলের উচ্চতা বেশি উহা হইতে অপর পাত্রে জল প্রবাহিত হইবে। প্রথম পাত্রটি যদি সরু হয় এবং তাহাতে জল পরিমাণে কমও থাকে তথাপি তাহার জলতল বেশি উচ্চ হাওয়ায় উহা হইতেই অপর পাত্রে জল প্রবাহিত হইবে। তাপকে পাত্রের জলের সঙ্গে এবং উষ্ণতাকে জলতলের উচ্চতা ও নিম্নতার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে।

উষ্ণতার মাপ—আমরা ত্বক দ্বারা ঠাণ্ডা বা গরমের অনুভূতি পাইয়া থাকি। যে পদার্থ আমাদের দেহ অপেক্ষা অধিক উষ্ণ তাহা স্পর্শ করিলে তাহার খানিকটা তাপ অঙ্গুলিতে আসে, সেজন্য উহা গরম মনে হয়। আর যে পদার্থ দেহ অপেক্ষা ঠাণ্ডা তাহা স্পর্শ করিলে অঙ্গুলি হইতে খানিকটা তাপ বাহির হইয়া সেই জিনিসে যায়। সেজন্য উহা ঠাণ্ডা মনে হয়। কাহারও জ্বর হইলে আমরা সাধারণত হাত দিয়া দেহের উষ্ণতা অনুভব করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু ত্বকের অনুভূতি সব সময়ে সূক্ষ্ম বা নির্ভুল হয় না। আমাদের হাত যদি পূর্বে বেশি গরম অবস্থায় থাকে তবে সাধারণ গরম জিনিস ঠাণ্ডা বোধ হইবে; আর হাত যদি পূর্বে বেশি ঠাণ্ডা অবস্থায় থাকে তবে সাধারণ গরম জিনিস অধিক গরম বোধ হইবে।

পরীক্ষা—তিনটি গামলার প্রথমটিতে গরম জল, দ্বিতীয়টিতে সাধারণ জল ও তৃতীয়টিতে বরফ-জল রাখ। প্রথম ও তৃতীয় পাত্রে যথাক্রমে ডান ও বাম হাত কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া দুই হাতই পরে মাঝের দ্বিতীয় পাত্রে ডুবাইলে দেখিবে একই পাত্রের জল ডান হাতে ঠাণ্ডা ও বাম হাতে গরম বোধ হইতেছে। ইহা হইতে বুঝা যায় সব সময় উষ্ণতার মাপের জন্য ত্বকের উপর নির্ভর করা যায় না। দুইটি বস্তুর উষ্ণতার পার্থক্য খুব কম হইলে হাত দিয়া ঐ পার্থক্য উপলব্ধি করা যায় না; এজন্য সূক্ষ্ম যন্ত্রের প্রয়োজন। যে যন্ত্রের সাহায্যে কোন বস্তুর উষ্ণতা মাপা যায় তাহাকে **উষ্ণতা-মাপক-যন্ত্র** বা **থার্মমিটার (Thermometer)** বলে। তাপ ও উষ্ণতার মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা বিবেচনা না করিয়া অনেকে থার্মমিটারকে তাপমান-যন্ত্র বলেন। কিন্তু ইহা

ঠিক নয়। কাহারও জ্বর হইলে থার্মমিটার দিয়া তাহার দেহের উষ্ণতা দেখা হয়। কিন্তু বেশির ভাগ লোকেই জিজ্ঞাসা করেন "রোগীর দেহের তাপ কত?"

থার্মমিটার নির্মাণ-প্রণালী—তাপ-প্রয়োগে তরল পদার্থের আয়তন বৃদ্ধির সাহায্য লইয়া উষ্ণতা-মাপক-যন্ত্র বা থার্মমিটার তৈয়ারি করা হয়। কতকগুলি কারণে এই উদ্দেশ্যে পারদের ব্যবহার অন্যান্য তরলের তুলনায় বেশি সুবিধাজনক। চুলের মত আগাগোড়া সমান সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট একটি কাচের নল লও। উহার এক দিকে লম্বাটে ধরনের একটি বাল্‌ব বা গোলক থাকা চাই, আর অন্য দিক ফানেলের মত ছড়ানো থাকা আবশ্যক। ফানেলের মধ্যে বিশুদ্ধ পারদ রাখিয়া গোলকটি একটু গরম করিলে নলমধ্যস্থ বায়ুর খানিকটা পারদের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া যাইবে; পরে গোলকটি ঠাণ্ডা করিলে ভিতরের বায়ু সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে কিছু পারদ নলের মধ্যে প্রবেশ করিবে। এই ভাবে কয়েকবার গোলকটি গরম ও ঠাণ্ডা করিলে পারদ গোলকটিকে ভরিয়া নলের মধ্যেও কিছুদূর অবধি উঠিবে। ইহার পর গোলকের মধ্যের পারদ গরম করিয়া ফুটাইতে হয়। তাহাতে নলের মধ্য হইতে সব বায়ু বাহির হইয়া যায় এবং ঐ স্থান পারদ-বাষ্পে পূর্ণ হয়। এই অবস্থায় নলের খোলা মুখের নীচে খুব সরু স্থান উত্তাপে গলাইয়া বন্ধ করিয়া দিতে হয়। এইরূপে থার্মমিটার তৈয়ারি হয়। উষ্ণতা বাড়িলে পারদ নলের মধ্য দিয়া উপরে উঠিবে, উষ্ণতা কমিলে নীচের দিকে নামিবে। উষ্ণতা মাপিবার জন্য থার্মমিটারের নলের উপর দাগ কাটিয়া স্কেল তৈয়ারি করিতে হইবে।

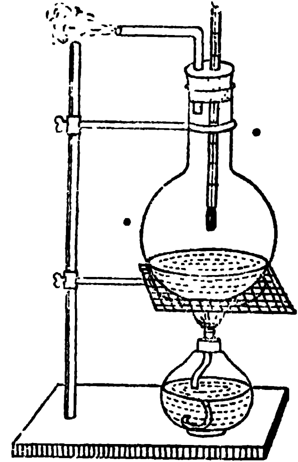


১১৫নং চিত্র—নিম্ন স্থিরাঙ্ক-নির্ণয়

থার্মমিটারের স্থিরাঙ্ক—উষ্ণতা মাপিবার স্কেল তৈয়ারি করিবার জন্য দুইটি নির্দিষ্ট উষ্ণতাকে স্থির ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহার একটি হইল বরফের গলনাঙ্ক অর্থাৎ যে উষ্ণতায় বরফ গলে। অন্যটি হইল জলের স্ফুটনাঙ্ক অর্থাৎ যে উষ্ণতায় জল ফুটিয়া থাকে।

নিম্ন স্থিরাঙ্ক-নির্ণয়—একটি ফানেল বরফের ছোট ছোট টুকরা দিয়া ভরিয়া

তাহার মধ্যে থার্মমিটারের বাল্‌বটি ঢুকাইয়া দাও। বরফ গলিতে থাকিবে এবং কিছুপরে পারদ সঙ্কুচিত হইয়া নলের এক স্থানে আসিয়া স্থির হইয়া থাকিবে। এই জায়গায় নলের গায়ে একটি দাগ কাট। ইহাই হইল থার্মমিটারের **নিম্ন স্থিরাঙ্ক**।



১১৬ নং চিত্র—উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক-নির্ণয়

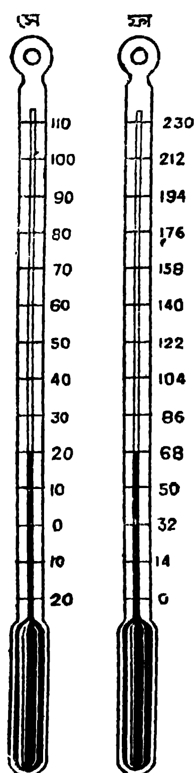
উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক-নির্ণয়—এবার চিত্রে প্রদর্শিত প্রণালীতে একটি ফ্লাস্কের মধ্যে বিশুদ্ধ জল লইয়া উহা ফুটাইতে থাক। ফ্লাস্কের মুখে একটি কর্ক লাগানো আছে, আর কর্কের ভিতরের একটি ছিদ্র দিয়া একটি কাচের বাঁকা নল লাগানো রহিয়াছে। ঐ নল দিয়া ফুটন্ত জলের বাষ্প বাহির হইয়া যাইতে পারে। কর্কের আর একটি ছিদ্র দিয়া থার্মমিটারটি ফুটন্ত জলের বাষ্পের মধ্যে রাখ। দেখিতে পাইবে পারদ তাপে প্রসারিত হইয়া থার্মমিটারের সরু নলের মধ্য দিয়া উপরে উঠিয়া এক স্থানে স্থির ভাবে আছে। ঐ জায়গায় নলের গায়ে আর একটি দাগ কাট। ইহা হইল থার্মমিটারের **উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক**।

উষ্ণতার স্কেল—স্থিরাঙ্ক দুইটি নির্দিষ্ট হইবার পর উহার মধ্যবর্তী উষ্ণতাকে ভাগ করিয়া থার্মমিটারের স্কেল প্রস্তুত করা হয়। আমাদের দেশে দুই রকমের স্কেল প্রচলিত আছে।

(১) **সেণ্টিগ্রেড স্কেল**—(Centigrade Scale)—এই স্কেল অনুসারে নিম্ন স্থিরাঙ্ককে শূন্য ডিগ্রি এবং উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ককে ১০০ ডিগ্রি ধরিয়া উষ্ণতার মধ্যবর্তী ব্যবধানকে সমান ১০০ ভাগে ভাগ করিয়া থার্মমিটারের গায়ে দাগ কাটা হয়। দাগের একটি অংশকে উষ্ণতার এক ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড ব্যবধান ধরা হয় এবং লেখা হয় ১°C। এই স্কেলে এক শত ভাগ থাকায় ইংরেজিতে ইহাকে সেণ্টিগ্রেড স্কেল বলে এবং যে থার্মমিটারে এই স্কেল রহিয়াছে তাহাকে **সেণ্টিগ্রেড থার্মমিটার** বলে। সর্ব প্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সর্ব দেশেই এই স্কেল প্রচলিত।

(২) **ফারেনহাইট স্কেল** (**Fahrenheit Scale**)—বৈজ্ঞানিক

ফারেন হাইটের নামানুসারে আর এক রকমের স্কেলেও উষ্ণতা মাপা হয়। এই স্কেল মতে নিম্ন স্থিরাঙ্ক ৩২ ডিগ্রি ও উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক ২১২ ডিগ্রি। উষ্ণতার মধ্যবর্তী ব্যবধানকে সমান ১৮০ ভাগে ভাগ করা হয়। প্রতি ভাগকে উষ্ণতার এক ডিগ্রি ফারেন হাইট ব্যবধান ধরা হয় এবং লেখা হয় ১°F। যে থার্মমিটারে এই স্কেল থাকে তাহাকে **ফারেন হাইট থার্মমিটার** বলে। এই স্কেল মতে পূর্বে বায়ুর উষ্ণতা মাপা হইত। মাপের কাজে দশমিক প্রণালী প্রবর্তিত হওয়ার পর বায়ুর উষ্ণতা সেন্টিগ্রেড স্কেলে মাপা হইয়া থাকে।

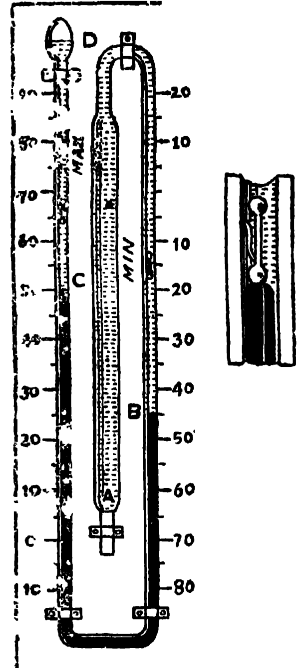


১১৭নং চিত্র—সেন্টিগ্রেড ও ফারেন হাইট থার্মমিটার

গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ থার্মমিটার
(Maximum and Minimum Thermometer)—আবহাওয়া নির্ণয়ের কাজে কোন স্থানে সমস্ত দিবারাত্রে উষ্ণতা সর্বোচ্চ কতদূর উঠে বা সর্বনিম্ন কতদূর নামে তাহা জানিতে হয়। কাহারও পক্ষে দিবারাত্র বসিয়া থাকিয়া উষ্ণতার উঠা-নামা দেখা সুবিধাজনক নহে। সেজন্য স্বয়ংক্রিয় থার্মমিটার ব্যবহার করা হয়। থার্মমিটার দেখিয়াই উষ্ণতা সর্বোচ্চ কত দূর উঠিয়াছিল বা সর্বনিম্ন কতদূর নামিয়াছিল জানা যায়। সর্বোচ্চ উষ্ণতা জানিবার জন্য যে থার্মমিটার ব্যবহার করা হয় তাহাকে **গরিষ্ঠ থার্মমিটার** এবং সর্বনিম্ন উষ্ণতা দেখিবার জন্য যে থার্মমিটার ব্যবহার করা হয় তাহাকে **লঘিষ্ঠ থার্মমিটার** বলে।

সিক্সের গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ থার্মমিটার (Six's Maximum and Minimum Thermometer)—সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতা মাপিবার জন্য দুইটি পৃথক থার্মমিটার থাকিতে পারে। সিক্সের থার্মমিটারে গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ থার্মমিটার একই সঙ্গে যুক্ত। এই থার্মমিটারের বাল্ব A-র সহিত একটি লম্বা U-নল সংযুক্ত। U-নলের প্রান্তে আর একটি ছোট বাল্ব D আছে। বাল্ব-A ও U-নলের প্রথম বাহুর B পর্যন্ত অংশ অ্যালকোহলে পূর্ণ।

এইটুকুই থার্মমিটারের আসল অংশ। B হইতে U-নলের অপর বাল্বের C পর্যন্ত অংশ পারদে পূর্ণ। C হইতে U নলের বাকী অংশ ও D বাল্বের কিছু অংশ আবার অ্যালকোহলে পূর্ণ। পারদ-সূত্রের দুই প্রান্তে পারদের বাহিরে দুইটি ইস্পাতের ডাম্বেলের আকৃতির হালকা সূচক আছে। প্রত্যেক সূচকের গায়ে একটি কবিয়া অল্প-জোরালো স্প্রিং থাকায় (ছবির পাশের অংশ দেখ) উহা নলের কাচের সহিত সূচককে সামান্য জোরে চাপিয়া রাখে। থার্মমিটারের কাজ আরম্ভ হইবার পূর্বে সূচক দুইটিকে চুম্বকের সাহায্যে টানিয়া আনিয়া পারদ-পৃষ্ঠের ঠিক উপরে রাখিতে হয়।

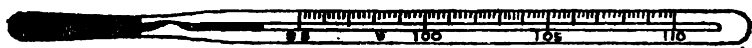


১১৮নং চিত্র—সিক্সের গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ থার্মমিটার

বায়ুর উষ্ণতা বাড়িলে A বাল্বে অ্যালকোহলের আয়তন বৃদ্ধি হয় এবং উহা পারদকে বাম দিকের নলে ঠেলিয়া তোলে। এই নলে পারদ-পৃষ্ঠের উপরে অবস্থিত সূচকটিও একই সঙ্গে উপরে উঠে, কিন্তু ডান দিকের সূচকটি পূর্বের স্থানেই থাকিয়া যায়। আবার বায়ুর উষ্ণতা কমিলে A বাল্বের অ্যালকোহল যখন সঙ্কুচিত হয় তখন পারদ ডান দিকের নলে উপরে উঠে এবং ঐ দিকের সূচকটিকে উপরে তোলে। তখন বাম দিকের সূচক পূর্বের স্থানেই থাকিয়া যায়। এই থার্মমিটারে বাম দিকের সূচকের নিম্নাংশ কোনও সময়ের সর্বোচ্চ উষ্ণতা এবং ডান দিকের সূচকের নিম্নাংশ সর্বনিম্ন উষ্ণতা নির্দেশ করে।

ডাক্তারী থার্মমিটার (Clinical Thermometer)—ইহা কার্যত একটি গরিষ্ঠ থার্মমিটার। জ্বর দেখিবার জন্য ইহা ব্যবহার করা হয়। একটি থার্মমিটার নিয়া পরীক্ষা কর। দেখিবে ইহার বাল্বের পরে নলটি খুব সরু ও বাঁকা। বাল্বটি দেহের তাপে উত্তপ্ত হইলে উহার ভিতরের পারা আয়তনে বাড়ে। তখন ঐ বাঁকানো সরু অংশের ভিতর দিয়া পারা

নলের ভিতরে চলিয়া যাইতে পারে। দেহ হইতে থার্মমিটারটি সরাইয়া আনিলে বাল্‌বের ও তাহার সঙ্গে সংলগ্ন পারা ঠাণ্ডায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। তখন সরু বাঁকানো অংশে পারদের সূত্রটি ছিঁড়িয়া যায়, কিন্তু নলের উপরকার



১১৯নং চিত্র—ডাক্তারী থার্মমিটার

পারদ যথা স্থানেই থাকে, বাহিরের ঠাণ্ডায় নামিয়া আসে না। সেজন্য শরীরের উষ্ণতার মাপ নেওয়ার পর থার্মমিটারটি বাহিরে নিয়া আসিলেও ইহাতে শরীরের উষ্ণতার নির্দেশই থাকিয়া যায়। পুনরায় উষ্ণতা মাপিতে হইলে থার্মমিটারটি ঝাঁকাইয়া উপরের দিকের পারা বাল্‌বে লইয়া আসিতে হয়। এই থার্মমিটারে ফারেন হাইট স্কেল থাকে। মনুষ্যদেহে বিভিন্ন অবস্থায় উষ্ণতার মাত্রা ৯৫° ফা. হইতে ১১০ ফা. পর্যন্ত উঠানামা করে বলিয়া এই থার্মমিটারে ৯৫ ডিগ্রি হইতে ১১০ ডিগ্রি পর্যন্ত দাগ কাটা থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় জিহ্বার নীচে মনুষ্যদেহে উষ্ণতা ৯৮·৪° ফা.। সেইজন্য ৯৮·৪ ডিগ্রির ঘরে একটা বিশেষ চিহ্ন থাকে।

তাপের মাপ—উষ্ণতা কিরূপে মাপিতে হয় তোমরা জানিয়াছ। যখন কেহ জানিতে চান যে এক মন বা এক টন কয়লা পুড়াইয়া কত তাপ পাওয়া যাইবে তখনই তাপ মাপিবারও প্রশ্ন উঠে। তাপ কোন পদার্থ নয়, ইহা কোন স্থান অধিকার করিয়া থাকে না, ইহার কোন ওজনও নাই। তাহা হইলে কিরূপে ইহা মাপা যায়? তাপ সোজাসুজি মাপিতে না পারায় পদার্থের উপর প্রভাব দ্বারা ইহা মাপিতে হয়।

প্রথম পরীক্ষা—তোমরা জান কোন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে ইহা সাধারণত উত্তপ্ত হয় এবং তাহার উষ্ণতা বাড়িয়া যায়। প্রযুক্ত তাপের সঙ্গে উষ্ণতা বৃদ্ধির কোন সম্বন্ধ আছে কিনা দেখা যাউক।

একটি কাচের বড় বিকারে প্রায় ৫০০ গ্রাম জল নিয়া তাহা একটি স্পিরিট ল্যাম্প দিয়া উত্তপ্ত করিবার ব্যবস্থা কর। জলে যাহাতে স্থির ভাবে তাপ লাগে সেজন্য ল্যাম্পের শিখার উপর বাতাস লাগিতে দিও না। জলের মধ্যে একটি থার্মমিটার রাখিয়া প্রথমে তাহার উষ্ণতা কত লিখিয়া রাখ। গরম জল একটি কাচের সরু দণ্ড দিয়া নাড়িতে হইবে যেন তাপ জলের মধ্যে সর্বত্র সমান ভাবে বিস্তৃত হয়। দুই মিনিট, চার মিনিট ও

ছয় মিনিট পরে পরে জলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইয়া কত হয় দেখিয়া লিখিয়া রাখ। এই সব বর্ধিত উষ্ণতা হইতে গোড়াতে যে উষ্ণতা ছিল তাহা বাদ দিলে বিভিন্ন সময়ে উষ্ণতার বৃদ্ধি কত হইয়াছে জানা যাইবে। দুই মিনিট কাল সময়ে জল যে পরিমাণ তাপ পাইয়াছে, চার মিনিটে তাহার দ্বিগুণ এবং ছয় মিনিটে তাহার তিন গুণ তাপ পাইয়াছে। পরীক্ষার ফল হইতে দেখা যাইবে দুই মিনিট পরে জলের উষ্ণতার যে বৃদ্ধি হইয়াছে, চার মিনিটে সেই বৃদ্ধির পরিমাণ হইয়াছে দ্বিগুণ এবং ছয় মিনিটে হইয়াছে তিনগুণ। এরূপ পরীক্ষা হইতে বুঝা যায় কোন বস্তুর উপর যে পরিমাণ তাপ প্রযুক্ত হয় তাহার উষ্ণতা সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কাজেই উষ্ণতার বৃদ্ধি মাপিয়াই তাপ মাপা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় পরীক্ষা—পূর্বের প্রণালী মত ৪০০, ৮০০ ও ১২০০ গ্রাম জলের উপর পৃথক পৃথক ভাবে একটা নির্দিষ্ট সময়, ধর ৪ মিনিট, ব্যাপিয়া স্থির ভাবে তাপ দাও। দেখিবে ৪০০ গ্রাম জলের উষ্ণতা বৃদ্ধি যাহা হইবে ৮০০ গ্রাম জলের বেলায় তাহা হইবে প্রায় অর্ধেক, আর ১২০০ গ্রাম জলের বেলায় হইবে প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ। পরীক্ষার এই সব অঙ্ক হইতে দেখা যায় যে, বস্তুর ভরকে উষ্ণতা-বৃদ্ধি দ্বারা গুণ করিলে প্রতি বার প্রায় একই ফল পাওয়া যায়। এই পরীক্ষার ফল সঠিক ভাবে পাইতে হইলে তাপ-প্রয়োগের মাত্রা স্থির রাখিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার। আর যে পাত্রে জল থাকিবে তাহাও বিশেষ ধরনের হওয়া উচিত, যেন তাহা হইতে তাপ বাহিরে যাইতে না পারে।

তাপের একক—উষ্ণতার একক হইল ডিগ্রি। তাপ যখন মাপা যায় তখন তাহার মাপেরও একটি একক (Unit) থাকা দরকার। **এক গ্রাম জলের এক ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতা বাড়াইতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাহাকে তাপের একক ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এই এককের নাম ক্যালরি (Calorie)।**

৫

পদার্থের অবস্থা-পরিবর্তন

পদার্থের ত্রিবিধ অবস্থা—পদার্থ তিনপ্রকার অবস্থায় থাকে ; (১) **কঠিন** (Solid), যথা—লোহা, কাঠ, মোম, ইট, পাথর, বরফ ইত্যাদি ; (২) **তরল** (Liquid), যথা—জল, তেল, স্পিরিট. দুধ, পারদ ইত্যাদি ; (৩) **গ্যাসীয়** (Gaseous), যথা—বায়ু, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি।

একই পদার্থ তিন প্রকার অবস্থাতেই থাকিতে পারে, যেমন জল—কঠিন অবস্থায় ইহা বরফ, তরল অবস্থায় জল, গ্যাসীয় অবস্থায় জলীয় বাষ্প। সাধারণত উত্তাপের দ্বারা পদার্থ কঠিন হইতে তরল ও পরে তরল হইতে গ্যাসীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বরফে বাহিরের তাপ লাগিলে জল হয় ; জলে আগুনের উত্তাপ দিলে উহা ফুটিয়া বাষ্পে পরিণত হয়। চায়ের কেট্‌লিতে জল ফুটাইবার সময় ইহার মুখ দিয়া যখন বাষ্প বাহির হইয়া আসে তখন সেখানে একটি প্লেট বা গ্লাস ধরিলে তাহার উপর বিন্দু বিন্দু জল দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ঠাণ্ডা গ্লাসের বা প্লেটের সংস্পর্শে গ্যাসীয় অবস্থা হইতে জল তরল অবস্থায় পরিণত হয়। একটি পাত্রে লবণ-মিশ্রিত বরফের টুকরা রাখিলে মিশ্রের উষ্ণতা বরফের উষ্ণতা হইতে বেশ নীচে নামিয়া যায়। একটি টেস্ট-টিউবে (Test-tube) জল লইয়া উহা লবণ-মিশ্রিত বরফের মধ্যে রাখিয়া দিলে ঐ জল হইতে তাপ বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা ঐ মিশ্রের মধ্যে যাইতে থাকে। এরূপ ভাবে ঠাণ্ডা হইতে হইতে ঐ জল পরে জমিয়া বরফে পরিণত হয়। এই ভাবে আইস-ক্রিম বা কুলপি-বরফ তৈয়ারি করা হয়।

পদার্থের তিন অবস্থার কারণ—পদার্থমাত্রই তাহাদের অতি সূক্ষ্মতম অংশ অণুদ্বারা গঠিত। কঠিন পদার্থের অণুগুলি খুব কাছাকাছি থাকায় তাহাদের গতি খুব সংকীর্ণ স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আবার অণুগুলি কাছাকাছি থাকায় উহাদের পরস্পরের আকর্ষণ খুব বেশি। এজন্য অণুগুলি ছড়াইয়া না পড়িয়া জমাট বাঁধিয়া থাকে এবং পদার্থও কঠিন অবস্থা লাভ করে। তরল পদার্থে অণুগুলির মধ্যে অধিকতর ব্যবধানের জন্য আণবিক

আকর্ষণ কম এবং গতিমাত্রা বেশি। এজন্য অণুগুলি অপেক্ষাকৃত আলগা অবস্থায় থাকে এবং পৃথিবীর অভিকর্ষের জন্য নীচ দিকে গড়াইয়া যায়। এই কারণে তরল পদার্থকে কঠিন পদার্থের মত স্তূপ করিয়া রাখা যায় না; উহাদের রাখিবার জন্য পাত্রের প্রয়োজন হয়। গ্যাসীয় পদার্থে আণবিক ব্যবধানের জন্য আকর্ষণ অতি সামান্য, আর আণবিক গতিমাত্রা থাকে খুব বেশি। কাজেই তাহার অণুগুলি খুব স্বাধীন ভাবে ছুটাছুটি করে এবং সব দিক ছড়াইয়া পড়ে। গ্যাসীয় পদার্থ খোলা পাত্রে রাখা চলে না, আবদ্ধ পাত্রের দরকার হয়। কঠিন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিতে থাকিলে উহার আণবিক গতিমাত্রা ও ব্যবধান খুব বাড়িয়া যায়, আণবিক আকর্ষণ উহাদের জমাট রাখিতে পারে না, কাজেই পদার্থটি তরল অবস্থা লাভ করে। তেমনি তরল পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে আণবিক ব্যবধানের বৃদ্ধি ও আণবিক গতিমাত্রার বিশেষ প্রাবল্য ঘটে; ফলে উহা গ্যাসীয় অবস্থা লাভ করিয়া থাকে। তাপ প্রয়োগে যেমন আণবিক ব্যবধান ও গতিমাত্রার বৃদ্ধি হয় তাপ কমাইলে তেমনি তাহাদের হ্রাস হইয়া থাকে। এজন্য খুব ঠাণ্ডা করিলে গ্যাসীয় পদার্থ তরল অবস্থা এবং তরল পদার্থ কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

পদার্থের তিন অবস্থায় থাকিতে হইলে তাহার মধ্যে নিম্নের দুই প্রকারের পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক।

(১) **গলন** (Melting)—তাপ প্রয়োগে পদার্থের কঠিন অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় পরিণত হওয়াকে **গলন** বলে। ইহার বিপরীত প্রক্রিয়া অর্থাৎ তাপ নিষ্কাশনে পদার্থের তরল হইতে কঠিন অবস্থায় পরিণত হওয়াকে **কঠিনীভবন** (Solidification বা Freezing) বলে। বরফ, গন্ধক, লোহা প্রভৃতি কঠিন অবস্থায় আছে। উত্তাপ পাইলে ইহারা গলিয়া তরল হইয়া যায়, ঠাণ্ডা করিলে ইহারা আবার কঠিন অবস্থায় ফিরিয়া আসে।

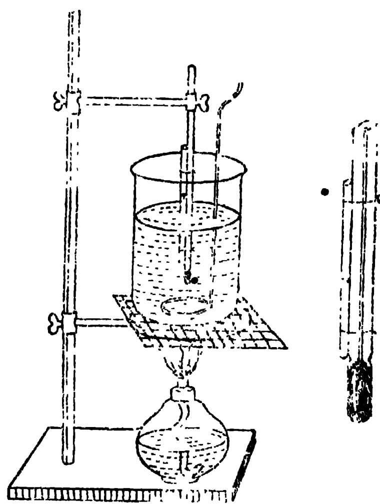
(২) **বাষ্পীভবন** (Vaporisation)—তাপ প্রয়োগে পদার্থের তরল অবস্থা হইতে বাষ্পে পরিণত হওয়াকে **বাষ্পীভবন** বলে। ইহার বিপরীত প্রক্রিয়া অর্থাৎ তাপ নিষ্কাশনে পদার্থের বাষ্প হইতে তরল অবস্থায় পরিণত হওয়াকে **ঘনীভবন** (Condensation) বলে। তাপ পাইলে জল বাষ্প হইয়া যায়, আবার ঠাণ্ডা পাইলে উহা তরল অবস্থায় ফিরিয়া আসে। শুধু জলের বাষ্প নয়, অন্য বায়বীয় পদার্থকেও তাপ কমাইয়া তরল ও কঠিন করা হয়।

পদার্থের গলনাঙ্ক (Melting Point) ও হিমাঙ্ক (Freezing Point)—তাপ প্রয়োগে বরফের ও তাপ নিষ্কাশনে জলের যে অবস্থা হয় দেখা গেল। প্রায় সকল পদার্থের বেলায়ই ঐরূপ হয়। কঠিন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিতে থাকিলে প্রথমে উহার উষ্ণতা বাড়িতে থাকে। ক্রমে কিন্তু এমন একটি অবস্থা আসে যখন তাপ প্রয়োগে উষ্ণতার আর পরিবর্তন হয় না, পদার্থ গলিয়া তরল হইতে থাকে। গলন আরম্ভ হইলে কঠিন পদার্থের সবটা গলিয়া না যাওয়া পর্যন্ত উহার উষ্ণতা একই থাকে। **যে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন কঠিন পদার্থ তাপ প্রয়োগে গলিয়া যায় তাহাকে ঐ পদার্থের গলনাঙ্ক বলে।** আবার তরল পদার্থকে ঠাণ্ডা করিতে থাকিলে এমন একটি অবস্থা আসে যখন তরল পদার্থ আর ঠাণ্ডা না হইয়া জমিয়া কঠিন হইতে থাকে। যতক্ষণ না তরলের সবটা জমিয়া কঠিন হয়, ততক্ষণ ইহার উষ্ণতা একই থাকে। **যে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন তরল পদার্থ তাপ নিষ্কাশনে জমিয়া কঠিন পদার্থে পরিণত হয় তাহাকে ঐ তরল পদার্থের হিমাঙ্ক বলে।** কেলাসিত (Crystalline) পদার্থের গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক একই হয়। অকেলাসিত (non-crystalline) পদার্থ যেমন—মোম, কাচ, লোহা প্রভৃতির খুব নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক নাই।

গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক নির্ণয়—থার্মমিটারের নিম্ন স্থিরাঙ্ক নির্ণয়ের জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল সেই ভাবে একটি ফানেলে বরফের টুকরা রাখিয়া তাহার মধ্যে একটি থার্মমিটার ঢুকাইয়া উহা আটকাইয়া রাখ। দেখিবে বরফ গলিয়া জল হইতেছে এবং থার্মমিটারটি 0°C উষ্ণতা নির্দেশ করিতেছে। যতক্ষণ না সমস্ত বরফ গলিয়া জল হয় ততক্ষণ আর উষ্ণতার কোন পরিবর্তন হইতেছে না। গলন সম্পূর্ণ হইলে জলের উষ্ণতা বাড়িতে থাকিবে। 0°C স্থির উষ্ণতায় বরফ গলিয়া জল হইল। কাজেই ইহাই হইল বরফের গলনাঙ্ক।

জলের হিমাঙ্ক নির্ণয়ের জন্য একটি পাত্রে লবণ-মিশ্রিত বরফ রাখ। ইহার উষ্ণতা ০°C-র কম হইবে। একটি টেস্ট-টিউবে জল রাখিয়া উহা ঐ মিশ্রের মধ্যে রাখ। কিছুক্ষণ পরে জল জমিয়া বরফ হইতে আরম্ভ হইবে। একটি থার্মমিটারের সাহায্যে জলের উষ্ণতা মাপিলে দেখিবে যতক্ষণ না জলের সবটা জমিয়া বরফ হয় ততক্ষণ উহার উষ্ণতা 0°C-এ স্থির থাকিবে। ইহা হইতে বুঝা গেল জলের গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক এক এবং তাহা 0°C।

মোমের গলনাঙ্ক পরীক্ষা—কতকটা মোম গলাইয়া তাহার মধ্যে এক টুকরা কাচের কৈশিক নল (Capillary tube) প্রবেশ করাইয়া দাও। এই ভাবে গলিত মোম সরু নলের ভিতর প্রবেশ করিয়া আবার জমিয়া যাইবে। সরু নলের এক মুখ গলাইয়া বন্ধ করিয়া দাও। এবার নলটিকে একটি থার্মমিটারের পাশে বাঁধ। একটি কাচের পাত্রে জল লইয়া নলসহ থার্মমিটারটি উহার মধ্যে ডুবাইয়া আটকাইয়া রাখ। কৈশিক নলের খোলা মুখ যেন জলের উপরে থাকে। জল ধীরে ধীরে গরম করার সঙ্গে সঙ্গে উহা নাড়িতে হইবে যেন জলের মধ্যে তাপ সর্বত্র সমান ভাবে বিস্তৃত হইতে পারে। কৈশিক নলে মোম গলিতে শুরু করিলে থার্মমিটারে জলের উষ্ণতা দেখ। এইবার গরম করা বন্ধ করিয়া জল ঠাণ্ডা হইতে দাও। কৈশিক নলে মোম যখন জমিতে শুরু করিবে তখন আবার থার্মমিটারে উষ্ণতা দেখ। এই দুই উষ্ণতার গড়ই হইবে মোমের গলনাঙ্ক। বিভিন্ন রকম মোমের গলনাঙ্ক ৪০°C হইতে ৬০°C হইয়া থাকে। এভাবে মাখনের গলনাঙ্কও বাহির করা যায়। পদার্থের গলনাঙ্ক ১০০°C-এর বেশি হইলে জল ব্যবহার করা চলিবে না। ঐ ক্ষেত্রে অন্য কোন্ তরল পদার্থ নিতে হইবে যাহার স্ফুটনাঙ্ক পদার্থটির গলনাঙ্ক হইতে বেশি।



১২০নং চিত্র—মোমের গলনাঙ্ক নির্ণয়

লীন তাপ (Latent Heat)—বরফের গলনাঙ্ক বাহির করিবার সময় বুঝা যায় যে, বাহির হইতে তাপ পাইবার ফলে বরফ গলিয়া জল হয়, অথচ প্রথম হইতেই তাহার উষ্ণতা বাড়ে না। আগে বরফ গলিয়া জল হয় এবং তাহার পর উষ্ণতা বাড়ে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে বরফকে কেবল মাত্র গলাইবার জন্যই অর্থাৎ জলকে কঠিন অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় পরিবর্তিত করিতেই কতকটা তাপের প্রয়োজন হয়। এই তাপকে **বরফ গলনের লীন তাপ** (Latent heat of fusion of ice) বলে। লীন তাপ গ্রহণ করিয়া বরফের উষ্ণতা বাড়ে না, অবস্থার পরিবর্তন হয় মাত্র।

আবার জলের হিমাঙ্ক বাহির করিবার সময় দেখা গিয়াছে যে জল হইতে লবণ-মিশ্রিত বরফে তাপ নিষ্কাশিত হওয়া সত্ত্বেও জলের উষ্ণতা কমে না, অবস্থান্তর হয় মাত্র। এইরূপে বর্জিত তাপকে **কঠিনী ভবনের লীন তাপ** (Latent Heat of Solidification) বলে। বরফ গলিয়া জল হইবার সময় যে তাপ গ্রহণ করে সেই জল জমিয়া বরফ হইবার সময় আবার সেই পরিমাণ তাপই ত্যাগ করে।

বরফ গলনের লীন তাপ ৮০ ক্যালরি/গ্রাম। এই কথার অর্থ এই যে 0° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় এক গ্রাম বরফকে ঐ উষ্ণতায় এক গ্রাম জলে পরিণত করিতে ৮০ ক্যালরি তাপের প্রয়োজন হয়। জল কঠিনী ভবনের লীন তাপ ৮০ ক্যালরি/গ্রাম বলিলে বুঝিতে হইবে 0° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় এক গ্রাম জল ঐ উষ্ণতায় এক গ্রাম বরফে পরিণত হইলে ৮০ ক্যালরি তাপ উদ্ভূত হয়।

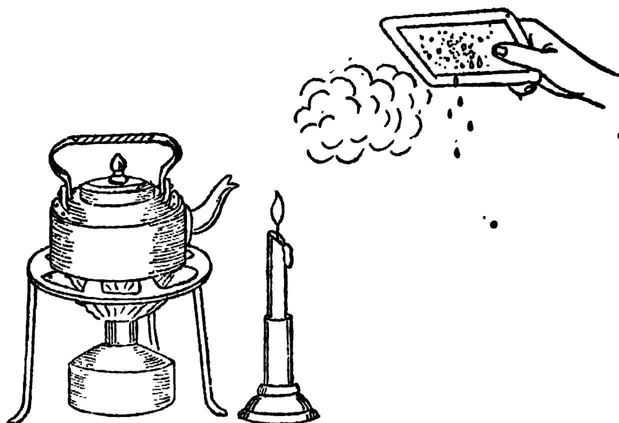
বাষ্পীভবন (Vaporisation)—তাপ প্রয়োগে তরল পদার্থের বায়বীয় অবস্থায় পরিণত হওয়াকে **বাষ্পীভবন** বলে এবং বায়বীয় অবস্থায় পরিণত পদার্থকে বাষ্প বলে। দুইটি বিভিন্ন উপায়ে তরল পদার্থ বাষ্প হইতে পারে, যেমন—

(১) **স্ফুটন** (Boiling)—তরল পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিতে থাকিলে ইহার উষ্ণতা বাড়িতে থাকে। ক্রমাগত তাপ প্রয়োগের ফলে এমন একটা অবস্থায় পৌছান যায় যখন তরল পদার্থের সকল অংশ হইতেই দ্রুত গতিতে বাষ্পীভবন হইতে থাকে। তরল পদার্থের এই পরিবর্তনকে **স্ফুটন** বলে। বাষ্প ঠাণ্ডায় জমিয়া তরল হইলে তাহাকে **ঘনীভবন** (Condensation) বলে।

(২) **মন্থর বাষ্পীভবন** (Evaporation)—যখন বাষ্পীভবন তরল পদার্থের উপরিভাগ হইতে ধীরে ধীরে স্ফুটনাঙ্কের নিম্নে যে কোন উষ্ণতায় হইয়া থাকে তখন তাহাকে **মন্থর বাষ্পীভবন** বা উবিয়া যাওয়া বলা হয়।

স্ফুটন ও ঘনীভবনের পরীক্ষা—একটি কেটলিতে জল রাখিয়া স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে তাহাতে উত্তাপ দিতে থাক। কিছুকাল পরে পাত্রের নীচের দিকে জলীয় বাষ্পের ছোট ছোট বুদ্‌বুদ্ গঠিত হইয়া খানিকটা উপরে উঠিয়া ঠাণ্ডা জলের সংস্পর্শে আসিয়া মিলাইয়া যাইবে। তাহার পর বাষ্পের বুদ্‌বুদ্ যখন নীচ হইতে একেবারে উপর পর্যন্ত উঠিবে

তখন জল ফুটিতেছে বলা হয়। ইহাই **স্ফুটন**। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে-বাষ্প বাহির হইতেছে কেটলির নলের ঠিক মুখের নিকট তাহা বায়ুর মত অদৃশ্য; কিন্তু নলের মুখের একটু দূরে আসিয়াই উহা কুয়াশার মত হয়।



১২১ নং চিত্র—স্ফুটন ও ঘনীভবন

এই কুয়াশা জলীয় বাষ্প নহে। অদৃশ্য বাষ্পের ঠাণ্ডা বায়ুর সংস্পর্শে ঘনীভবনের ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার সৃষ্টি হয়। ঐ জলকণা সমূহই কুয়াশার মত দেখায়; সেই কুয়াশার মধ্যে একটি শ্লেট ধরিলে জলকণাগুলি তাহার উপর জমিয়া জলের ফোঁটার সৃষ্টি করিবে। পরে ঐ ফোঁটাগুলি শ্লেট হইতে নীচে পড়িতে থাকিবে।

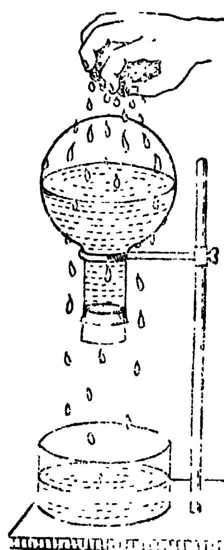
কেটলির নলের মুখের সম্মুখে একটি মোমবাতি জ্বালাও। কুয়াশার যে অংশে মোমবাতির উত্তাপ পড়িবে তাহা আবার জলীয় বাষ্পে পরিণত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

স্ফুটনাঙ্ক (Boiling Point)—বিশুদ্ধ জলের স্ফুটনাঙ্ক ১০০° সেন্টিগ্রেড ইহা তোমরা থার্মমিটারের ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক-নির্ণয়ের সময়ই জানিয়াছ। ঐরূপ ভাবে যন্ত্রপাতি সাজাইয়া ফ্লাস্কের ভিতর বিশুদ্ধ জল লও। ঐ জল ফুটিতে থাকিলে দেখিবে উহার বাষ্পের মধ্যে যে থার্মমিটার রহিয়াছে তাহা দ্বারা প্রায় ১০০°C উষ্ণতা নির্দিষ্ট হইতেছে। ইহা হইল জলের **স্ফুটনাঙ্ক**।

যে স্থানে জলের স্ফুটনাঙ্ক বাহির করা হয় সেই স্থানের বায়ুর চাপের সঙ্গে স্ফুটনাঙ্কের সম্বন্ধ রহিয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠে বা যে স্থানে বায়ুর চাপের ফলে

ব্যারোমিটারের পারদ-স্তম্ভের উচ্চতা ৭৬ সেন্টিমিটার সেই স্থানে জলের স্ফুটনাঙ্ক ১০০° সেন্টিগ্রেড। উচ্চ স্থানে, যেমন পর্বতের উপর বায়ুর চাপ কম। সেখানে জল ফুটাইতে কম তাপ দিতে হয়; কম তাপের ফলে উষ্ণতাও কম হয়। কাজেই যেখানে বায়ুর চাপ কম সেখানে স্ফুটনাঙ্কও কম হইয়া থাকে। এজন্য খুব উচ্চ পর্বতের উপর খোলা পাত্রে জল ফুটাইয়া ডিম, মাংস প্রভৃতি ভাল রূপে সিদ্ধ করা যায় না। বেশি চাপে জল ফুটাইলে স্ফুটনাঙ্ক ১০০°র বেশি হয়। প্রেসার কুকার (Pressure Cooker) নামক বন্ধ রান্নার পাত্রে বাষ্পের চাপ বাড়াইয়া জলের স্ফুটনাঙ্ক বাড়ানো হয়। ফলে রান্নার কাজ কম সময়ে সম্পন্ন হয়।

পরীক্ষা—কম চাপের ফলে যে স্ফুটনাঙ্ক কমিয়া যায় তাহা একটি পরীক্ষা করিয়া দেখ। একটি ফ্লাস্ক জলে অর্ধেক ভর্তি করিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া ঐ জল ফুটাইয়া ভিতরের সমস্ত বায়ু দূর কর। তাহার পর তাপ বন্ধ করিয়া একটি ছিপির সাহায্যে উহার মুখ বন্ধ কর। এইবার উত্তপ্ত ফ্লাস্কটি মোটা কাপড় দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া চিত্রে প্রদর্শিত মতে উল্টা করিয়া আটকাইয়া রাখ। ফ্লাস্কের গরম জলে স্ফুটনের আর কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না। ফ্লাস্কের জলের উপরে কেবল জলীয় বাষ্প আছে বলিয়া তাহার উপরে যে চাপ পড়ে তাহা ঐ বাষ্পের চাপের সমান। এবার একটি ন্যাকড়া জলে ভিজাইয়া তাহাদ্বারা ফ্লাস্কের উপর জল ছিটাইয়া দাও। দেখিবে জল পুনরায় ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।



১২২ নং চিত্র—কম চাপে স্ফুটনাঙ্ক কমিয়া যায়

ঠাণ্ডা জল ঢালাতে ভিতরকার জলীয়-বাষ্পের খানিকটা জমিয়া জলে পরিবর্তিত হয়। ফলে বাষ্পের চাপ কমে এবং কম চাপে জলের স্ফুটনাঙ্ক কম হওয়ায় উহা আবার ফুটিতে আরম্ভ করে।

বাষ্পীভবনের লীন তাপ (**Lalent Heat of Vaporisation**)—গলনের ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে তাপ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও গলনের

সময় উষ্ণতা বাড়ে না। প্রযুক্ত তাপ উষ্ণতা না বাড়াইয়া পদার্থকে কঠিন অবস্থা হইতে তরল অবস্থাতে পরিবর্তিত করে।

স্ফুটনের সময়ও দেখা যায় যে তাপ দেওয়া সত্ত্বেও তরল পদার্থের উষ্ণতা বাড়ে না, তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হইতে থাকে মাত্র। উষ্ণতা না বাড়াইয়া প্রতি গ্রাম তরল পদার্থকে বাষ্পে পরিণত করিতে যে তাপ লাগে তাহাকে ঐ তরল পদার্থের **বাষ্পীভবনের লীন তাপ** বলে।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে ১০০° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় জল যখন ফুটিতে থাকে তখন প্রতি গ্রাম জলকে বাষ্প করিতে প্রায় ৫৪০ ক্যালরি তাপের প্রয়োজন হয়। ১০০° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় জলের স্পর্শে শরীর যে ভাবে পুড়ে তদপেক্ষা অনেক বেশি পুড়ে ১০০° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় স্টীমের সংস্পর্শে। স্টীম শীতল দেহের সংস্পর্শে যে লীন তাপ ছাড়িয়া দেয় উহারই ক্রিয়ায় শরীরের বেশি ক্ষতি হয়।

মন্থর বাষ্পীভবন (Evaporation)—কঠিন পদার্থ কেবল গলনাঙ্কেই তরলে পরিণত হয়। কিন্তু তরল পদার্থ স্ফুটনাঙ্ক ছাড়াও অন্য যে কোন কম উষ্ণতায় বাষ্পে পরিণত হইতে পারে। খোলা পাত্রে জল রাখিয়া দিলে উহা রোজ রোজ কমিতে কমিতে অদৃশ্য হইয়া যায়। সাধারণ উষ্ণতায়ই জল উবিয়া যায় বলিয়া এরূপ হয়। সাধারণ উষ্ণতায় তরল পদার্থের উবিয়া যাওয়াকে **মন্থর বাষ্পীভবন** বলে। পরীক্ষার ফলে মন্থর বাষ্পীভবনের এই কয়েকটি নিয়ম দেখা গিয়াছে :

(১) যে পাত্রে জল থাকে উহার মুখ যত বিস্তৃত হয় মন্থর বাষ্পীভবনও তত দ্রুত হয়। এজন্য একই পরিমাণ জল একটি গ্লাসে ও একটি থালায় রাখিলে থালার জল আগেই উবিয়া যায়।

(২) জল যতই উত্তপ্ত হইবে তাহা হইতে মন্থর বাষ্পীভবনও তত দ্রুত হইবে।

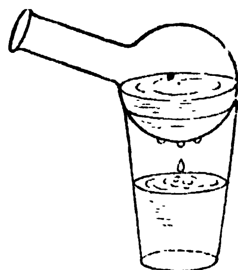
(৩) স্থির বায়ু অপেক্ষা হাওয়ার মধ্যে মন্থর বাষ্পীভবন দ্রুত হয়। কারণ হাওয়া দ্বারা তরল পদার্থের উপর হইতে বাষ্পের স্তর সরাইয়া দিলে বাষ্পীভবন বেশি হইতে পারে।

পরীক্ষা—একটি পরীক্ষার সাহায্যে মন্থর বাষ্পীভবন ও ঘনীভবন দেখানো যাইতে পারে। একটি গ্লাসে প্রায়-ফুটন্ত জল লও। একটি ফ্লাস্কে খুব ঠাণ্ডা জল রাখিয়া ফ্লাস্কটি গ্লাসের উপর কাত করিয়া বসাও। যদিও

জল ফুটান হইতেছে না তথাপি গরম জল হইতে মন্থর বাষ্পীভবনের ফলে



১২৩নং চিত্র—গরম জল হইতে মন্থর বাষ্পীভবন

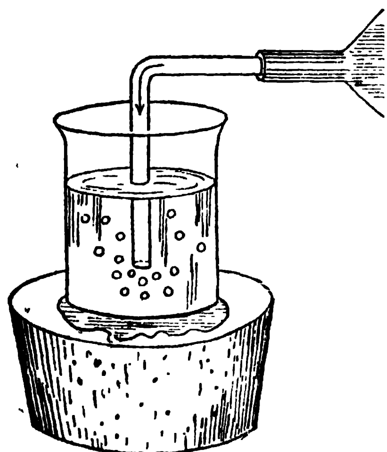


১২৪নং চিত্র—মন্থর বাষ্পীভবন ও ঘনীভবন

বাষ্প বাহির হইয়া ঠাণ্ডা গ্লাসের গায়ে জলকণাতে ঘনীভূত হইবে এবং ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কণা মিলিত হইয়া ফোঁটার আকারে নীচে পড়িবে।

মন্থর বাষ্পীভবন ও স্ফুটনের পার্থক্য—(১) মন্থর বাষ্পীভবন ধীরে ধীরে হয়. কিন্তু স্ফুটন অতি দ্রুত সংঘটিত হয়।

(২) মন্থর বাষ্পীভবন তরল পদার্থের উপরের তল হইতে হইয়া থাকে, স্ফুটন তরলের সমগ্র অংশ ব্যাপিয়া হয়।



১২৫নং চিত্র—জল দ্রুত ঠাণ্ডা করিলে বরফে পরিণত হয়

(৩) মন্থর বাষ্পীভবন সকল উষ্ণতায়ই হয়। স্ফুটন এক নির্দিষ্ট উষ্ণতায় হইয়া থাকে।

মন্থরবাষ্পীভবনে শৈত্যের উৎপত্তি—একটি কাঠের ব্লকের উপর সামান্য একটু গর্ত করিয়া ঐ গর্তে কিছু জল রাখ এবং তাহার উপর একটি কাচ পাত্র বসাও। পাত্রে কিছু ইথার লও। ইথার খুব দ্রুত বাষ্পে পরিণত হয়। একটি সরু কাচের নলের সঙ্গে হাপর লাগাইয়া নলটি ইথারে ডুবাও এবং হাপর জোরে চালাইয়া ইথারের ভিতর দিয়া দ্রুত গতিতে

বায়ুর বুদ্‌বুদ্‌ চালিত কর। ইহাতে ইথার দ্রুত বাষ্পে পরিণত হইবে। ইহার জন্য যে লীন তাপের প্রয়োজন তাহা কাঠের উপরে রাখা জল হইতে আসিবে। ফলে জল দ্রুত ঠাণ্ডা হইয়া বরফে পরিণত হইবে। বরফের স্তর কাচ-পাত্রকে কাঠের সহিত আটকাইয়া রাখিবে।

মন্থর বাষ্পীভবনে শৈত্য-সঞ্চারের অনেক দৃষ্টান্ত বাস্তব জীবনে রহিয়াছে। বেলে মাটির কুঁজোতে জল রাখিলে তাহা বেশ ঠাণ্ডা হয়, কারণ জল ইহার গায়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া বাহিরে আসিয়া উবিয়া যায় এবং সেই সময় পাত্রও ভিতরের জল হইতে তাপ সংগ্রহ করে। ইহাতে জল ঠাণ্ডা হয়।

অনেকে গ্রীষ্মকালে ঘর ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য দরজা বা জানালায় খসখস ব্যবহার করেন। খসখসে পিচকারি দিয়া জল ছিটাইয়া দিলে সেই জল ঘরের বায়ু হইতে তাপ সংগ্রহ করিয়া বাষ্পীভূত হয়। ফলে ঘর ঠাণ্ডা হয়।

৬

তাপ-সঞ্চালন

সূর্য, কাঠ, কয়লা প্রভৃতির উনান, কেরোসিনের স্টোভ, ইলেকট্রিক উনান প্রভৃতি হইতে আমরা তাপ পাইয়া থাকি। আমাদের তাপের প্রয়োজন হয় এক স্থানে, আর তাপের উৎসগুলি থাকে অন্য স্থানে।

আমাদের তাপের প্রধান উৎস সূর্য নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে। সেই স্থান হইতেই বা কি ভাবে তাপ পাওয়া যায় ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? এই সব দৃষ্টান্ত হইতে মনে হয় তাপ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালিত হইতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে **তাপের সঞ্চালন** (Transference of Heat) বলে। এখন তাপ কি কি ভাবে সঞ্চালিত হয় তাহা দেখিবে।

পরীক্ষা—(১) একটি তামা বা লোহার শিকের এক দিক হাতে ধরিয়া উহার অন্য দিক জলন্ত উনানের মধ্যে ঢুকাইয়া দিলে কিছুক্ষণ পরে হাতে বেশ গরম লাগে। শিকের গরম দিক হইতে তাপ অবশ্যই ঠাণ্ডা দিকে চলিয়া আসিয়াছে। গরম দিকে উষ্ণতা বেশি, ঠাণ্ডা দিকে কম। কোন বস্তুর দুই অংশের উষ্ণতা সমান না থাকিলে অধিক উষ্ণ স্থান হইতে তাপ

কম উষ্ণ স্থানে চালিত হয়। তাপের এই প্রকার সঞ্চালনকে **পরিবহন** (Conduction) বলে।

(২) শিকটি আগুন হইতে সরাইয়া উহার গরম প্রান্তের সামান্য উপরে বায়ুতে হাত রাখিলে হাতে গরম লাগিবে। গরম শলাকার সংস্পর্শে বায়ু উত্তপ্ত হইয়া উপরের দিকে উঠিয়া হাতে আসিয়া লাগে। এখানে উষ্ণ বায়ু এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালিত হইল এবং তাপ সঙ্গে লইয়া গেল। তাপের এই প্রকার সঞ্চালনকে **পরিচলন** (Convection) বলে।

(৩) এবার শলাকাটির গরম প্রান্তের সামান্য নীচে বায়ুতে হাত রাখিলেও গরম লাগিবে ; তবে উপরের চেয়ে নীচে গরম কমই লাগিবে। এই অবস্থায় তাপ গরম বায়ুর সাহায্যে পরিচালিত হইয়া আসে নাই ; কারণ গরম বায়ু হালকা বলিয়া উর্ধ্বগামী। এক্ষেত্রে কোন জড় পদার্থের মাধ্যমে না আসিয়া অন্য যে উপায়ে তাপ সঞ্চালিত হইয়াছে তাহাকে তাপের **বিকিরণ** (Radiation) বলে। সূর্য হইতে আমরা যে তাপ পাই তাহা এই বিকিরণ-প্রক্রিয়ায়।

তাপ-সঞ্চালনের তিনটি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার বিষয় এখন আলোচনা করা যাইবে :

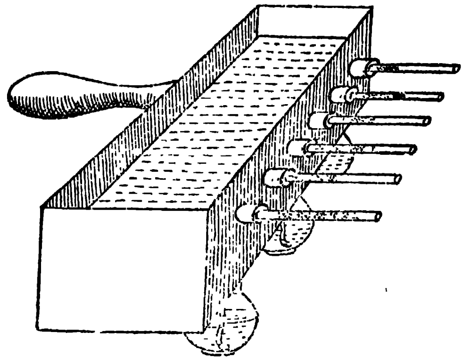
তাপ-পরিবহন—তাপ-পরিবহনের জন্য মাধ্যম হিসাবে কোন জড় পদার্থের প্রয়োজন। জড় পদার্থ অসংখ্য অণুদ্বারা গঠিত। তোমরা জান আণবিক গতিশক্তিই তাপের ভিত্তি। কঠিন পদার্থের অণুগুলি নিজ নিজ স্থান ছাড়িয়া যাইতে পারে না ; তাহাদের গতিশক্তি দ্রুত কম্পনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শলাকার একটি প্রান্ত উত্তপ্ত করিলে সেখানকার অণুগুলির কম্পনের মাত্রা বহু গুণে বাড়িয়া যায়। সেই বর্ধিত কম্পনের একটা অংশ পরস্পর-সংলগ্ন এক অণু হইতে অন্য অণুতে সঞ্চালিত হওয়ার ফলে উষ্ণ অণুগুলি হইতে তাপ পর পর অপেক্ষাকৃত শীতল অণুতে বিস্তৃত হয় এবং সর্বশেষে সমস্ত শলাকাটিই উত্তপ্ত হয়। এই রূপে **যে প্রক্রিয়া দ্বারা কোন বস্তুর উষ্ণতর অংশ হইতে অপেক্ষাকৃত শীতলতর অংশে অথবা উষ্ণ বস্তু হইতে তাহার সহিত সংযুক্ত অপেক্ষাকৃত শীতল বস্তুতে তাপ গমন করে অথচ ইহার জন্য বস্তুর অণুগুলির কোন স্থানচ্যুতি হয় না তাহাকে তাপের পরিবহন বলে।**

সাধারণত কঠিন পদার্থে তাপ-সঞ্চালন পরিবহন প্রণালীতে হইয়া থাকে।

সকল পদার্থের পরিবহন ক্ষমতা বা **পরিবাহিতা** সমান নহে। ইহা নিম্নের পরীক্ষা দুইটি হইতে বুঝিতে পারিবে।

প্রথম পরীক্ষা—একটি কাচের পাত্রে ফুটন্ত জল লও। পরে ঐ জলের মধ্যে প্রায় সমান আকারের কাচ, লোহা, তামা ও পিতলের শলা, একটি কাঠের কলম ও একখানি রূপার চামচের প্রায় অর্ধেক ডুবাইয়া রাখ। জলের তলের কত নিকটে ইহাদের প্রত্যেকটিকে স্পর্শ করিতে পারা যায় দেখ। পদার্থের পরিবাহিতা কম হইলেই তাহাকে জলতলের খুব নিকটে ধরা যাইবে। এই পরীক্ষা হইতে এই সকল পদার্থের বিভিন্ন পরিবাহিতা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়।

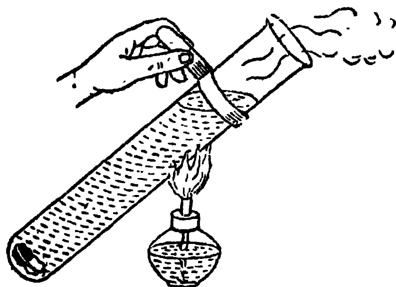
দ্বিতীয় পরীক্ষা—একটি ধাতব পাত্রের পাশের দিকে ছয়টি ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্রগুলি কর্ক দিয়া বন্ধ এবং কর্কগুলির ভিতর দিয়া সমান মোটা ও সমান লম্বা বিভিন্ন ধাতু ও কাঠের দণ্ড ঢুকানো আছে। দণ্ডগুলির উপর সমান ভাবে মোমের প্রলেপ লাগানো আছে। পাত্রের মধ্যে জল ফুটাইলে প্রত্যেক দণ্ডের ভিতরের প্রান্ত ফুটন্ত জলের উষ্ণতা লাভ করিবে। অন্য প্রান্তগুলি শীতল বলিয়া তাপ বিভিন্ন দণ্ডের মধ্য দিয়া পরিবাহিত হইবে। কিছুক্ষণ পরে দেখা যাইবে যে বিভিন্ন দণ্ডের উপর মোম বিভিন্ন দূরত্ব পর্যন্ত গলিয়াছে। যে দণ্ডে যত বেশি দূর পর্যন্ত মোম গলিয়াছে সেই দণ্ডে তত বেশি তাপ পরিবাহিত হইয়া আসিয়াছে। বিভিন্ন পদার্থের দণ্ড নিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে রূপার তাপ-পরিবাহিতা সব চেয়ে বেশি; তাহার পর তামা, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, পিতল ও লোহার বেলায় পরিবাহিতা ক্রমশই কমিয়া আসিয়াছে। কাচ ও কাঠের পরিবাহিতা খুব কম, তাহার মধ্যে কাঠের সব চেয়ে কম।



১২৬নং চিত্র—বিভিন্ন পদার্থের পরিবাহিতা বিভিন্ন

পারদ ও গলিত ধাতু ভিন্ন সকল তরল পদার্থেরই পরিবাহিতা কম।

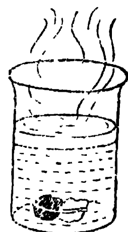
জলের পরিবাহিতা কাচ ও কাঠের পরিবাহিতার মাঝামাঝি অর্থাৎ খুবই কম। নিম্নের পরীক্ষা হইতে তাহা বুঝা যাইবে।



১২৭নং চিত্র—জলের পরিবাহিতা খুব কম

প্রথম পরীক্ষা—একটি টেস্ট-টিউব জলে প্রায় ভর্তি কর। ঐ জলে এক খণ্ড বরফ ইটের টুকরার সহিত বাঁধিয়া ডুবাইয়া রাখ। এখন টেস্ট-টিউবটি কাত করিয়া উহার উপরি ভাগের জল গরম করিতে করিতে ফুটাও। দেখিবে তখনও তলার বরফ বিশেষ গলে নাই।

দ্বিতীয় পরীক্ষা—একটি বিকারে এক খণ্ড বরফ ইটের টুকরার সঙ্গে বাঁধিয়া জলের নীচে ডুবাইয়া রাখ। জলের উপর স্পিরিট ঢালিয়া দিয়া ঐ স্পিরিটে আগুন ধরাইয়া দাও। স্পিরিট জ্বলিতে থাকিবে, অথচ বরফ গলার বিশেষ কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না।



১২৮নং চিত্র—জলের পরিবাহিতা খুব কম

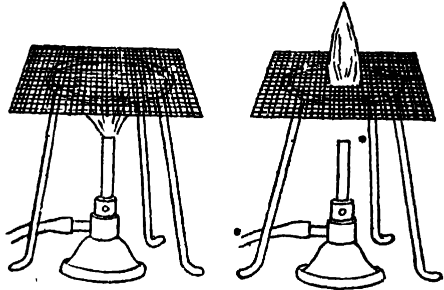
তামা জলের চেয়ে প্রায় ৫০০ গুণ বেশি তাপ পরিবহন করে। বায়ুর তুলনায় জল তাপ পরিবহন করে প্রায় ২৫ গুণ বেশি।

পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থের ব্যবহার—

(১) ডেভির সেফ্‌টি ল্যাম্প (**Davy's Safety Lamp**)—এই ল্যাম্পে আলোর শিখা কাচের চিমনির বদলে খুব ঘন তামার তারের জাল দিয়া ঘেরা থাকে। অনেক স্থানে খনির ভিতরে বিস্ফোরক গ্যাস থাকে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার হামফ্রি ডেভি (**Sir Humphry Davy**) কর্তৃক ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত সেফ্‌টি (নিরাপত্তা) ল্যাম্প খনিতে ব্যবহার করিলে বিস্ফোরণ-জনিত দুর্ঘটনার হাত হইতে অনেক পরিমাণে রক্ষা পাওয়া যায়। এই ল্যাম্পের মূলতত্ত্ব বুঝিবার জন্য একটি সহজ পরীক্ষা করা যাউক।

পরীক্ষা—একটি বুনসেন বার্নারের কিছু উপরে একখানা তামার তারের জাল (Wire Gauge) রাখ। বার্নারে গ্যাস ছাড়িয়া দিয়া তারের জালের

নীচে ম্যাচ দিয়া আগুন ধরাইলে বার্নারের শিখা নীচেই থাকিবে; সহজে জালের উপরে যাইবে না। আবার প্রথমেই জালের উপরে গ্যাসে আগুন ধরাইলে শিখা উপরেই জ্বলিবে, নীচে যাইবে না। তামার তারের জাল খুব ভাল তাপ-পরিবাহক বলিয়া ইহার এক দিকের শিখার তাপ সহজেই জালের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে, ফলে অপর দিকে গ্যাসের উষ্ণতা তাহার জ্বলনাঙ্ক পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। ডেভির ল্যাম্পের দীপশিখার তাপ তামার জাল দ্রুত সর্বত্র পরিবাহিত করে। ফলে বাহিরে বিস্ফোরক গ্যাস থাকিলেও তাহা জ্বলনাঙ্ক পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না এবং তাহাতে আগুন ধরে না।



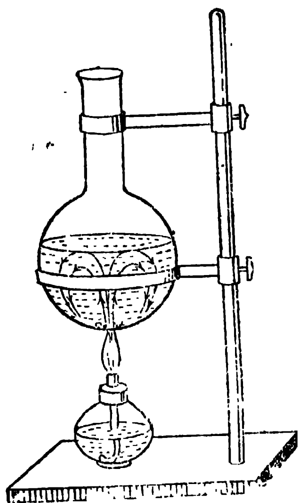
১২৯নং চিত্র—তারের জালের নীচে ও উপরে গ্যাস জ্বলে

(২) **পশমী ও সুতী বস্ত্র**--শীতকালে আমরা যে-সব গরম কাপড় ব্যবহার করি তাহার উষ্ণতা এবং সিল্ক, রেয়ন, ও সুতী বস্ত্রের উষ্ণতা একই। তবে পশমী বস্ত্রকে 'গরম' কাপড় বলে কেন? পশমী বস্ত্রের পশমের আঁশগুলি অপেক্ষাকৃত আলগা ভাবে থাকে বলিয়া ইহার তৈয়ারি বস্ত্রে অসংখ্য ছিদ্র থাকে এবং ঐ ছিদ্রগুলি সর্বদা বায়ু আটকাইয়া রাখে। তোমরা জানিয়াছ বায়ুর তাপ-পরিবাহিতা সব চেয়ে কম। সেই জন্য পশমী কাপড় ব্যবহার করিলে বায়ুর স্তর আমাদের দেহের তাপ বাহির হইতে দেয় না। আর এই বায়ুস্তর থাকায় ঘর্ম বাষ্পে পরিণত হইয়া শৈত্যের সৃষ্টি করিতে পারে না, ফলে আমরা গরম বোধ করি। এজন্য পশমী কাপড় শীতকালে ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

সিল্ক, রেয়ন ও সুতী বস্ত্রে বায়ুপূর্ণ ছিদ্র প্রায় না থাকায় ঐ সব বস্ত্র পরিধানে থাকিলে দেহের অতিরিক্ত তাপ সহজেই বাহির হইয়া যাইতে পারে। আর দেহের ঘর্ম হইতে বাষ্পীভবনের ফলে দেহ শীতল বোধ হয়।

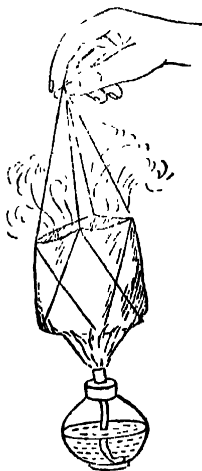
তাপ-পরিচলন—তাপের পরিচলন তরল এবং গ্যাসীয় পদার্থেই ঘটে, কঠিন পদার্থে নহে। তরল বা গ্যাসীয় পদার্থ তাপ পাইলে উহাদের আয়তন বাড়ে এবং ঘনত্ব কমিয়া যায়। ফলে উত্তপ্ত তরল বা গ্যাসীয় পদার্থ

হালকা হইয়া উপরে উঠে এবং উপরের ও পাশের শীতল অংশ অপেক্ষাকৃত ভারী বলিয়া নীচে নামিয়া আসে। এইরূপে নীচের উষ্ণ তরল বা গ্যাসীয় পদার্থ তাপ বহন করিয়া উপরে লইয়া যায় এবং উপর ও পাশ হইতে শীতল অংশ নীচে আসিয়া তাপ বহন করিয়া আবার উপরে চলিয়া যায়। যে প্রক্রিয়ায় তাপ উষ্ণতর স্থান হইতে শীতলতর স্থানে উত্তপ্ত অণুসমূহের স্থান-চ্যুতি দ্বারা সঞ্চালিত হয় তাহাকে **পরিচলন** বলে। তরল পদার্থ ও গ্যাসে পরিচলন ও পরিবহন দুইই হইতে পারে।



১৩০ নং চিত্র—পরিচলন-প্রণালীতে তরল পদার্থ উত্তপ্ত হয়

তরল পদার্থে পরিচলনের পরীক্ষা—(১) একটি কাচের পাত্রে কিছু জল লইয়া তাহার মধ্যে পটাসিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটের দুই একটি ছোট দানা ফেলিয়া দাও। কাচের পাত্রটির ঠিক নিম্ন স্থান স্পিরিট ল্যাম্পের খুব ছোট শিখার সাহায্যে গরম করিলে দেখা যাইবে, যে-স্থানে দানা রহিয়াছে সেই স্থান হইতে সরু রঙিন জলের রেখা উপরে উঠিতেছে। গরম রঙিন জলস্রোত উপরের ঠাণ্ডা জলের সংস্পর্শে ঠাণ্ডা হইয়া পাত্রের কিনারার পাশ দিয়া বাঁকিয়া নামিয়া আসে এবং আবার উত্তপ্ত হয়। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে সমস্ত জলটাই ক্রমশ রঙিন হইতেছে। রঙের সাহায্যে জলের স্রোত দেখিয়া বুঝা যায় যে জলের এক স্থানে তাপ দিলে একটা প্রবাহের সৃষ্টি হয় এবং উহা দ্বারা তাপ জলের মধ্যে সর্বত্র বিস্তৃত হয়।



১৩১ নং চিত্র—কাগজের থলিতে জল ফুটানো

(২) পালিশ ও পাতলা কাগজের একটি ছোট থলি তৈয়ারী করিয়া সুতা দিয়া বাঁধিয়া উহা ঝুলাও। থলিটির অর্ধেক

জলে ভর্তি করিয়া স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে তাপ দিয়া ঐ জল ফুটানো যাইতে পারে। থলির কাগজ যে জায়গায় জলের সংস্পর্শে আছে সেখানে পুড়িবে না, কারণ পাতলা কাগজে তাপ লাগামাত্রই উহা দ্রুত পরিবাহিত হইয়া জলের সংস্পর্শে আসিবে। জলের মধ্যে পরিচলনের ফলে তাপ সর্বত্র বিস্তৃত হইবে এবং কিছু সময়ের মধ্যেই জল ফুটিতে আরম্ভ করিবে। যে উষ্ণতায় জল ফুটে তাহার চেয়ে বেশি উষ্ণতা না হইলে কাগজ পুড়িতে পারে না।

বায়ুতে পরিচলন—(১) হ্যারিকেন লণ্ঠন—১১১নং চিত্রের সাহায্যে যে পরীক্ষার বর্ণনা করা হইয়া ছিল তাহা হইতে বুঝিয়াছিলে, বাতি হইতে চিমনি দিয়া গরম বাতাস উপরের দিকে চলিয়া যায়। অক্সিজেন জোগাইয়া বাতিটি জ্বালাইয়া রাখিতে হইলে বাহির হইতে ঠাণ্ডা বায়ু অন্য পথ দিয়া ভিতরে আনিতে হয়। হ্যারিকেন লণ্ঠনে উত্তপ্ত বায়ু একেবারে উপরের পথ দিয়া বাহির হইয়া যায়। চিমনির উপরের ছিদ্রগুলি দিয়া বাহিরের বায়ু প্রবেশ করিয়া দুই পাশের নলের ভিতর দিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং বাতির শিখায় অক্সিজেন জোগায়। বায়ুতে পরিচলন-প্রবাহের সাহায্যেই বাতি জ্বলিতে পারে।

(২) ঘরের ভিতরে বায়ু-চলাচল—১১২নং ছবিতে ঘরের ভিতরে কি ভাবে পরিচলন-প্রবাহের সাহায্যে বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা করা হয় দেখানো হইয়াছিল।

(৩) বায়ু-প্রবাহ—বিভিন্ন রকমের বায়ু-প্রবাহ, যেমন মৌসুমী বায়ু, স্থলবায়ু, সমুদ্রবায়ু প্রভৃতি বায়ুর পরিচলন-স্রোতের ফলেই ঘটিয়া থাকে।

তাপ-বিকিরণ—তোমরা পূর্বেই জানিয়াছ, **যে প্রক্রিয়া দ্বারা তাপ কোন জড় পদার্থের মাধ্যমের সাহায্য ছাড়াই এক স্থান হইতে অপর স্থানে সঞ্চালিত হয় তাহাকে বিকিরণ বলে।** বিকীর্ণ তাপশক্তি তাপরশ্মি রূপে শূন্যের মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হয়। সেই রশ্মির তরঙ্গ চারি দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং কোন কোন বস্তুর সংস্পর্শে আসিলে তাহাকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে।

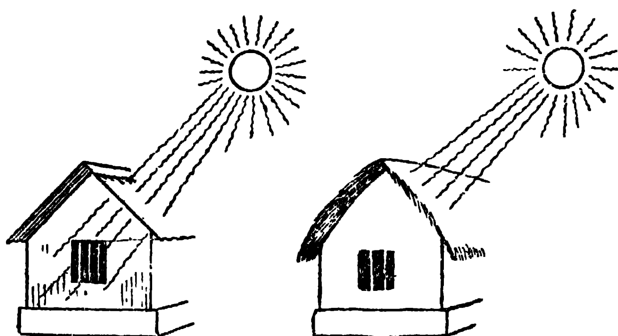
বিকীর্ণ তাপের ধর্ম—সূর্য হইতে বিকীর্ণ তাপ ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পৌঁছিবার পথে প্রথমে রহিয়াছে প্রায় নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইলব্যাপী মহাশূন্য; সেখানে বায়ু বা অন্য কোন জড় মাধ্যম নাই। তাহার পর ঐ রশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া আসে। কিন্তু তাহাতে বায়ু উষ্ণ হয় না;

যে সব বস্তুতে তাপরশ্মি বাধা পায় তাহাকেই উত্তপ্ত করে, যেমন মাটি, ধাতু, কাঠ, জল প্রভৃতি। বিকীর্ণ তাপ কোন বস্তুর উপরে পড়িলে উহার কতকাংশ শোষিত, কতকাংশ প্রতিফলিত এবং কিছুটা বস্তুর ভিতর দিয়া নির্গত হয়। বস্তুবিশেষে এই বিভিন্ন অংশের পরিমাণ কম বেশী হইয়া থাকে। কালো বস্তু তাপ বেশি শোষণ করে; পক্ষান্তরে সাদা ও মসৃণ বস্তু তাপ কম শোষণ করে, বেশির ভাগই প্রতিফলিত করে। এই কারণে গরমের সময়ের জন্য সাদা জামা এবং শীতের সময়ের জন্য কালো জামা বিশেষ উপযোগী।

তাপ-নিবারণ—বাস্তব জীবনে তাপ বা শৈত্য নিবারণের প্রয়োজন হয়। যেমন রৌদ্রে সূর্যের বিকীর্ণ তাপ হইতে দেহকে রক্ষা করার জন্য ছাতা ব্যবহার করা হয়, আবার দেহের তাপরক্ষার জন্য শীতকালে গরম পোশাক পরিধান করিতে হয়।

নিম্নে আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :

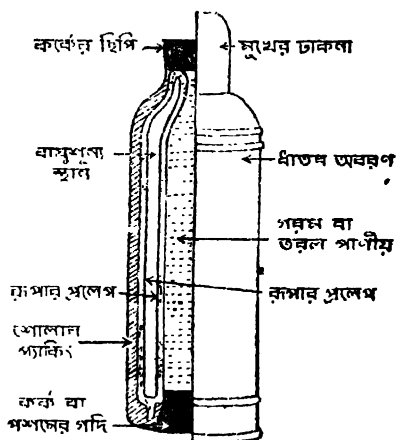
টিনের ও খড়ের ঘর—টিনের ঘরের উপর সূর্যরশ্মি পড়িলে টিনের তাপ-পরিবাহিতা খুব বেশি বলিয়া টিনের ভিতরের দিকও



১৩২নং চিত্র—টিনের ঘর ও খড়ের ঘর

বেশ উত্তপ্ত হইয়া যায়। উত্তপ্ত টিন হইতে তাপরশ্মি বিকীর্ণ হইয়া ঘরের ভিতর গরম করিয়া তোলে। ঘরের চাল খড়ের ও বেড়া মাটির হইলে এই দুইটি পদার্থের তাপ-পরিবাহিতা খুব কম বলিয়া এবং খড় ও মাটির স্তর বেশ পুরু হওয়ায় সামান্য তাপই চাল ও বেড়ার ভিতরের দিকে যাইতে পারে। সেজন্য খড়ের ঘরের দেওয়াল মাটির হইলে তাহার ভিতর বেশ ঠাণ্ডা থাকে।

থার্মফ্লাস্ক—(**Thermos Flask**)—ইহা তোমরা অনেকেই দেখিয়া থাকিবে। ইহার ভিতরে গরম জিনিস রাখিলে বহু ক্ষণ গরম এবং ঠাণ্ডা জিনিস রাখিলে বহু ক্ষণ ঠাণ্ডা থাকে। ইহার ভিতর হইতে তাপ যাহাতে পরিবহন, পরিচলন বা বিকিরণ-প্রক্রিয়া দ্বারা সহজে বাহিরে না আসিতে পারে বা বাহির হইতে তাপ যাহাতে এই সব প্রক্রিয়া দ্বারা ভিতরে প্রবেশ না করিতে পারে সেই রূপ ব্যবস্থাই ইহাতে করা হয়। থার্মফ্লাস্ক দুই দেওয়াল বিশিষ্ট সরু মুখের একটি পাত্র। ফ্লাস্কটি তৈয়ারি করিবার সময় দুই দেওয়ালের মধ্যকার স্থান বায়ুশূন্য করা হয়। ফলে পরিবহন ও পরিচলনে তাপ বাহিরে যাইতে বা ভিতরে আসিতে পারে না। সামান্য পরিবহন যাহা হয় তাহা পাত্রের মুখের কাছে দুই দেওয়ালের সংযোগস্থল দিয়া এবং পাত্রের মুখে যে কর্কের ছিপি দেওয়া থাকে তাহার ভিতর দিয়া। ভিতরের দেওয়ালের বাহিরের দিকে এবং বাহিরের দেওয়ালের ভিতরের দিকে খুব পালিশ রূপার প্রলেপ দেওয়া থাকে। সেজন্য ইহাদের ভিতরের তাপ মসৃণ তলে বেশি প্রতিফলিত হইয়া ভিতরেই থাকিয়া যায়, বাহিরে খুব কমই বিকীর্ণ হইতে পারে।



১৩৩নং চিত্র—থার্মফ্লাস্ক

প্রশ্ন

১। তাপ যে শক্তি তাহার কি কি প্রমাণ আছে? ইহা হইতে কি কি শ্রেণীর কাজ পাওয়া যায় দৃষ্টান্ত দ্বারা বল।

২। তাপের বিভিন্ন উৎসের নাম কর। ইহাদের মধ্যে কি কি উপায়ে তাপের সৃষ্টি হয় বল।

৩। তাপে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন বৃদ্ধির এক একটি করিয়া পরীক্ষা বর্ণনা কর।

৪। তাপের প্রভাবে বায়ু ঊর্ধ্বগামী হয় কেন পরীক্ষার উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া বল।

৫। সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ু কাহাকে বলে এবং কি ভাবে ইহাদের সৃষ্টি হয় চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

৬। তাপ ও উষ্ণতার প্রভেদ কি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া বল। কোন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিতে থাকিলে ইহার উষ্ণতা কি ক্রমাগতই বাড়িতে থাকিবে? বুঝাইয়া বল।

৭। সেণ্টিগ্রেড স্কেলের একটি পারদ-থার্মমিটারের গঠন প্রণালী বর্ণনা কর।

৮। চিত্রের সাহায্যে সিক্সের গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ থার্মমিটারের গঠনপ্রণালী বর্ণনা কর এবং ইহার কার্যপ্রণালী বুঝাইয়া বল।

৯। পদার্থের অবস্থার কি কি পরিবর্তন হইয়া থাকে দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণনা কর।

১০। কোন পদার্থের গলনাঙ্ক 0° ও ১০০° সেণ্টিগ্রেডের মধ্যে হইলে তাহা কিরূপ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করা যায়-চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

১১। জল হইতে কি ভাবে বরফ তৈয়ারি করিতে হয় বল। প্রচুর বরফের সাহায্যে সামান্য একটু জলকে জমাইয়া বরফ করা যায় না কেন?

১২। স্ফুটন ও মন্থর বাষ্পীভবনের মধ্যে পার্থক্য কি? মন্থর বাষ্পীভবন কি কি অবস্থার উপর নির্ভর করে?

১৩। স্ফুটনাঙ্ক কাহাকে বলে? পদার্থের উপরের চাপের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ কি? এই সম্বন্ধে একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।

১৪। তাপ-সঞ্চালনের বিভিন্ন প্রণালী দৃষ্টান্তের সাহায্যে বর্ণনা কর।

১৫। তাপ-সঞ্চালনের বিভিন্ন প্রণালীর মধ্যে পার্থক্য কি?

১৬। বিভিন্ন কঠিন পদার্থের তাপ-পরিবাহিতা তুলনা করিবার একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।

১৭। তরল ও গ্যাসীয় পদার্থে কি ভাবে তাপ-পরিচলন হয় পরীক্ষার উল্লেখ করিয়া বল।

১৮। আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে তাপ ব্যবহার করি তাহার বেশির ভাগ কোন্ প্রণালীতে সঞ্চালিত হয় দৃষ্টান্ত দ্বারা বল।

১৯। থার্মফ্লাস্কের গঠন ও কার্যপ্রণালী চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

২০। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:

(ক) তাপে কঠিন পদার্থের প্রসারণের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে কি জান?

(খ) বেলেমাটির কুঁজায় জল রাখিলে তাহা ঠাণ্ডা হয় কেন?

(গ) গরম কালে পাখার হাওয়ায় আরাম বোধ হয় কেন?

(ঘ) পশমের কাপড়কে গরম কাপড় বলে কেন?

বিষয়গত প্রশ্ন

(নির্দেশ পূর্বের মত)

১। ঠিক উক্তি নির্বাচন

(ক) তাপ কি অণুর গতীয় শক্তি?

(খ) দুইটি বস্তুতে সমান পরিমাণ তাপ থাকিলে তাহাদের উষ্ণতা কি সব সময় সমান হয়? ——

(গ) জলের উষ্ণতা ১০০° সেন্টিগ্রেড না হইলে উহা কি ফুটিতে পারে? ——

(ঘ) সব তাপের উৎস হইতেই কি তাপ বিকিরণের সাহায্যে পাওয়া যায়? ——

২। শূন্যস্থান পূরণ

(ক) গরমের সময় খালি গায়ে পাখার হাওয়া লাগিলে
বেশ—(১) বোধ হয়, কারণ দেহের ——(১)
ঘামের উপর হইতে পাখার হাওয়ায়—(২) আবরণ ——(২)
শীঘ্র দূর হইয়া যায় এবং ঘাম দ্রুত——(৩) হইয়া ——(৩)
দেহের ——(৪) বেশি পরিমাণে দূর করে। ——(৪)

(খ) যে প্রক্রিয়ায় কোন পদার্থের ——(১) ——(১)
অংশের অণুগুলি——(২) অংশে ——(২)
——(৩) বহন করিয়া দিয়া যায় তাহাকে ——(৩)
তাপের ——(৪) বলে। ——(৪)

৩। কয়েকটি উত্তরের মধ্যে ঠিক উত্তর নির্বাচন

শীতকালে সুতীর পোশাকের চেয়ে পশমের পোষাক পরিলে বেশি আরাম লাগে, কারণ ——

(১) পশমী কাপড়ের উষ্ণতা সুতীর কাপড়ের চেয়ে বেশি।

(২) পশমী কাপড় গরম।

(৩) ছিদ্রবহুল পশমী কাপড় তাপ-অপরিবাহী বায়ুতে ভর্তি।

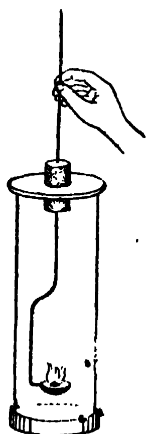
(৪) পশমের কাপড় সুতীর কাপড়ের চেয়ে মোটা।

রসায়ন (Chemistry)

১

অম্ল, ক্ষারক ও লবণ (Acid, Base and Salt)

অম্ল বা অ্যাসিড—তোমরা হয়তো সালফিউরিক অ্যাসিড (Sulphuric Acid), নাইট্রিক অ্যাসিড (Nitric Acid), হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (Hydrochloric Acid) প্রভৃতির নাম শুনিয়াছ। গন্ধক হইতে সালফিউরিক অ্যাসিড, সোরা বা পটাশিয়াম নাইট্রেট হইতে নাইট্রিক অ্যাসিড এবং খাদ্য-লবণ হইতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করা যায়। ঐ পদার্থ-গুলি পৃথিবীর মাটিতে পাওয়া যায় বলিয়া এই অ্যাসিড গুলিকে **খনিজ অ্যাসিড** (Mineral Acids) বলে। ইহা ছাড়া লেবুর রসে সাইট্রিক অ্যাসিড (Citric Acid), তেঁতুলে টারটারিক অ্যাসিড (Tartaric Acid), টক দধিতে ল্যাকটিক অ্যাসিড (Lactic Acid), ভিনিগারে অ্যাসেটিক অ্যাসিড (Acetic Acid) ও পিঁপড়ার দেহে ফর্মিক অ্যাসিড (Formic Acid) আছে। এই অ্যাসিড গুলি জৈব পদার্থ হইতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাদিগকে **জৈব অ্যাসিড** (Organic Acid) বলে। খনিজ অ্যাসিড গুলি পরীক্ষাগারে সর্বদাই ব্যবহৃত হয়।



১৩৪নং চিত্র—গন্ধক পুড়াইয়া উৎপন্ন গ্যাসের গুণপরীক্ষা

অ্যাসিডের উৎপত্তি ও সাধারণ গুণ—১ম পরীক্ষা—একটি দহন-চামচে একটু গন্ধক (Sulphur) লইয়া উহাতে আগুন ধরাও। বায়ুর অক্সিজেনের সহিত সালফার মিলিত হইয়া সালফার-ডাই-অক্সাইড নামক গ্যাস উৎপন্ন করিবে। ইহার গন্ধ ঝাঁজালো। হাতলে ঢাকনা-লাগানো চামচটি একটি গ্যাস জারে ঢুকাইয়া ইহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখ। আগুন নিবিয়া গেলে চামচটি বাহির করিয়া জারের মধ্যে সামান্য জল দিয়া উহা ঝাঁকাও। গ্যাস জলে দ্রবীভূত হইয়া যায়। ঐ দ্রবণে লিটমাস কাগজ দিলে উহা লাল হইয়া যাইবে। লিটমাস একটি উদ্ভিদজাত বেগনি রঙ। ঐ রঙে ফিল্টার পেপারের টুকরা ডুবাইয়া

শুকাইয়া নিলে লিটমাস পেপার তৈয়ারি হয়। অম্ল বা অ্যাসিড লাগিলে ইহার রঙ্গ লাল হয়, আর ক্ষারজাতীয় পদার্থ লাগিলে ইহার রঙ্গ নীল হইয়া যায়। যে পদার্থ অম্লও নয়, ক্ষারজাতীয়ও নয় তাহার সংস্পর্শে ইহার রঙ্গের পরিবর্তন হয় না। সালফার-ডাই-অক্সাইড জলের সঙ্গে মিশিয়া **সালফিউরাস অ্যাসিড** (Sulphurous Acid) উৎপন্ন করে। অক্সিজেন-পূর্ণ জারের মধ্যে গন্ধক পুড়াইলে বেশি পরিমাণে সালফার-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয় এবং পরীক্ষার ফল আরও সুস্পষ্ট হয়।

সালফার-ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে বিশেষ প্রণালীতে আরও বেশি অক্সিজেন মিলিত করিলে সালফার-ট্রাই-অক্সাইড নামক গ্যাস উৎপন্ন হয়। ঐ গ্যাস জলে দ্রবীভূত হইয়া **সালফিউরিক অ্যাসিড** উৎপন্ন করে।

২য় পরীক্ষা—অক্সিজেনপূর্ণ জারের মধ্যে চামচে করিয়া জলন্ত কাঠকয়লা ঢুকাইলে ইহা উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিবে। পরে ঐ জারে পরিষ্কার চুনের জল ঢালিয়া ঝাঁকাইলে উহা সাদা হইয়া যাইবে। ইহা হইতে বুঝা যায় কয়লা বা কার্বন পুড়িলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। আর একটি জারে এই গ্যাস উৎপন্ন করিয়া তাহার মধ্যে সামান্য পরিমাণ জল ঢালিয়া ঝাঁকাইলে গ্যাস জলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে দ্রবীভূত হইবে। লিটমাস পেপার দিয়া পরীক্ষা করিলে উহা লাল হইয়া যাইবে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস জলে দ্রবীভূত হইয়া **কার্বনিক অ্যাসিড** (Carbonic Acid) উৎপন্ন করে। আমরা যে সোডা ওয়াটার ব্যবহার করি তাহাতে উচ্চ চাপে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস দ্রবীভূত থাকে।

৩য় পরীক্ষা—পূর্বের প্রণালীতে শিক্ষক মহাশয়ের নির্দেশ মতে ফসফরাস নামক পদার্থ পুড়াইয়া পরীক্ষা করিলে জারের মধ্যে সাদা, ঘন ধূয়ার সৃষ্টি হইবে। ইহা ফসফরাসের একটি অক্সাইড। ইহা জলে দ্রবীভূত হইয়া যে অ্যাসিড উৎপন্ন করে তাহার নাম **ফসফরিক অ্যাসিড** (Phosphoric Acid)।

উপরের পরীক্ষাগুলি সালফার, কার্বন ও ফসফরাস নামক যে মৌলিক পদার্থ নিয়া করা হইয়াছে উহারা ধাতু নহে। এজন্য ইহাদিগকে **অধাতু** (Non-metals) বলে। পরীক্ষা হইতে আরও বুঝিলে যে কতকগুলি অধাতু পুড়াইলে অক্সিজেনের সঙ্গে মিলনের ফলে তাহাদের অক্সাইডের সৃষ্টি হয়। সেই অক্সাইডগুলি আবার জলে দ্রবীভূত হইলে অম্ল বা অ্যাসিড

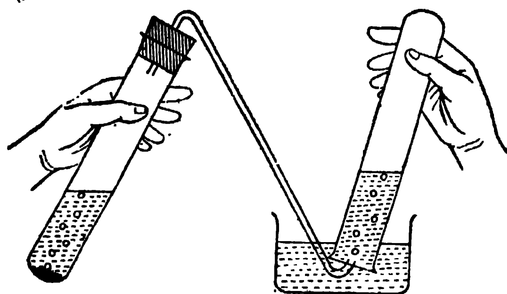
উৎপন্ন হয়। এই জন্য এই অক্সাইড গুলিকে **আম্লিক অক্সাইড** বা **অ্যাসিড-ধর্মী অক্সাইড** (Acidic Oxides) বলে।

অ্যাসিডের সাধারণ গুণ—(১) সালফিউরিক্ অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিড তীব্র অ্যাসিড। কার্বনিক অ্যাসিড ও অধিকাংশ জৈব অ্যাসিড মৃদু অ্যাসিড। তীব্র অ্যাসিড জল মিশাইয়া লঘু করিয়া নিয়া ও মৃদু অ্যাসিড স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়া তাহাতে লিটমাস পেপার ডুবাইলে দেখা যাইবে অ্যাসিড লিটমাসের রঙ লাল করিয়া দেয়।

(২) জলমিশ্রিত তীব্র অ্যাসিডের এবং মৃদু অ্যাসিডের দুই ফোঁটা জিহ্বায় লাগাইলে টক লাগিবে।

(৩) সকল অ্যাসিডেই হাইড্রোজেন থাকে। এই হাইড্রোজেন ধাতুর সাহায্যে বিতাড়ন করা যায়। ইহা বুঝিবার জন্য একটি পরীক্ষা কর :

পরীক্ষা—চিত্রে প্রদর্শিত প্রণালীতে একটি টেস্ট-টিউবের মুখে কর্কের সাহায্যে একটি নির্গম-নল লাগাইবার ব্যবস্থা কর। ইহার মধ্যে দস্তার (Zinc) ছোট ছোট দানা লইয়া তাহার উপর কিছু লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ঢালিয়া দিলে অ্যাসিড জিঙ্কের সংস্পর্শে আসায় যে গ্যাস উৎপন্ন হইবে, তাহা বুদবুদের আকারে বাহির হইবে। ঐ গ্যাস চিত্রে প্রদর্শিত প্রণালীতে সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিবে উহা হাইড্রোজেন গ্যাস। দস্তার বদলে ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর পাতলা টুকরা নিয়া পরীক্ষা করিলেও হাইড্রোজেন উৎপন্ন হইবে। সালফিউরিক ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অধিকাংশ ধাতুর সংস্পর্শে আসিলেই হাইড্রোজেন উৎপন্ন করিয়া থাকে। নাইট্রিক অ্যাসিডও সম্ভবত ধাতুর সংস্পর্শে আসিলে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ঐ হাইড্রোজেনের সঙ্গে উহার বিক্রিয়ার ফলে অন্য গ্যাস গঠিত হইয়া পড়ে। সমস্ত ধাতুই মৌলিক পদার্থ।



১৩৫ নং চিত্র—হাইড্রোজেন উৎপাদন ও সংগ্রহ

কাজেই পূর্বে বর্ণিত পরীক্ষা হইতে যে হাইড্রোজেন পাওয়া যায় তাহা নিশ্চয়ই অ্যাসিড হইতে আসিয়াছে।

ক্ষারক (Base)—ধাতুর সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় যে সব অক্সাইড উৎপন্ন হয়, যেমন ক্যালসিয়াম অক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, তাহারা জলের সঙ্গে যেসব দ্রবণের সৃষ্টি করে তাহাদের ধর্ম অ্যাসিড-ধর্মী অক্সাইডের বিপরীত অর্থাৎ তাহারা লাল লিটমাসের রঙ নীল করিয়া থাকে। ইহাদিগকে **ক্ষারধর্মী অক্সাইড** বা **বেসিক অক্সাইড** বলে। ইহারা ক্ষারধর্মী বলিয়া ইহাদিগকে **ক্ষারক** বলা হয়। কতক গুলি ধাতব অক্সাইড, যেমন জিঙ্ক অক্সাইড এবং টিন অক্সাইডও ক্ষারধর্মী, কিন্তু লিটমাসের উপর ইহাদের ক্রিয়া খুব সামান্য। আবার কোন ক্ষারধর্মী অক্সাইডের সহিত রাসায়নিক ভাবে জল সংযুক্ত হইলে যে পদার্থ গঠিত হয় তাহাতে সংশ্লিষ্ট ধাতু, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন থাকে। ইহাকে **হাইড্রোক্সাইড** (**Hydroxide**) বলে। জলে দ্রবণীয় হাইড্রোক্সাইডকে **ক্ষার** বা **অ্যালক্যালি** (Alkali) বলে। কস্টিক সোডা (সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড), কস্টিক পটাস (পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড), ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও বেরিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্ষার বা অ্যালক্যালি। ক্ষারক বা বেস বলিলে ক্ষারধর্মী অক্সাইড ও অ্যালকালি উভয়ই বুঝায়।

ক্ষারক বা বেসের উৎপত্তি ও সাধারণ গুণ—

(১) ক্ষারক জাতীয় ধাতুর অক্সাইড গুলি প্রস্তুত করিতে হইলে ধাতুগুলিকে অক্সিজেনে উত্তপ্ত করা হয় বা ধাতুর হাইড্রোক্সাইড ও অন্যান্য যৌগিককে বায়ুতে খুব বেশি উত্তপ্ত করা হয়।

(২) ঐ জাতীয় ধাতুর অ্যালক্যালি বা ক্ষার প্রস্তুত হয়—

(ক) ধাতুর (যেমন সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, বেরিয়াম প্রভৃতি) উপর জলের বিক্রিয়া দ্বারা বা

(খ) পূর্বোক্ত ধাতুগুলির অক্সাইডের উপর জলের বিক্রিয়া দ্বারা। ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা চুনের সঙ্গে জলের বিক্রিয়ায় যে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন হয়, তাহাই কলিচুন বা খাওয়ার চুন।

ক্ষারকের সাধারণ গুণ—(১) ক্ষারক জলে দ্রবীভূত হইলে লিটমাসের রঙ নীল করিয়া থাকে।

(২) এই দ্রবণ মুখে দিলে খুব বিস্বাদ লাগে।

(৩) **ক্ষার বা অ্যালক্যালি হাতে ধরিলে সাবানের মত পিচ্ছিল বোধ** হয়।

(৪) **ক্ষারক** বা **বেস** এমন একটি পদার্থ (যাহা সাধারণত কোন ক্ষারধর্মী অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড) যাহা **অ্যাসিডকে** প্রশমিত করিয়া **লবণ** ও **জল** উৎপন্ন করে।

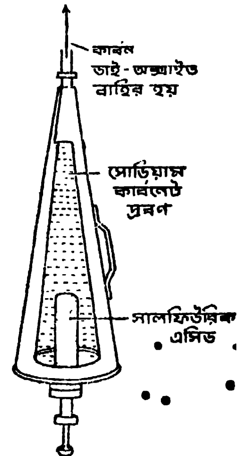
পরীক্ষা—অ্যাসিড প্রশমনের জন্য একটি পরীক্ষা কর। একটি বেসিনে কস্টিক সোডার জলীয় দ্রবণ লও। ইহা লাল লিটমাস পেপার নীল করিয়া দেয়। একটি বিউরেটের মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের লঘু দ্রবণ নিয়া উহা আস্তে আস্তে নীচের কস্টিক সোডার দ্রবণের উপর ফেলিতে থাক। বেসিনের তরলকে সরু কাচদণ্ড দিয়া অনবরত নাড়িতে থাক এবং ইহার লিটমাসের রঙ্গ পরিবর্তনের ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া যাও। এই ভাবে এমন অবস্থায় পৌছান যাইবে যখন লাল বা নীল কোন লিটমাসই তরল পদার্থের মধ্যে ডুবাইলে তাহার রঙ্গের পরিবর্তন হইবে না। তখন ঐ তরল পদার্থটি প্রশমিত (Neutral) হইয়াছে বলা যায়। তখন ইহার না আছে অম্ল, না আছে ক্ষারজাতীয় গুণ। তাপ দিয়া এই তরল পদার্থের জল শুকাইয়া ফেলিলে যে সাদা পদার্থ অবশিষ্ট থাকিবে তাহার স্বাদ গ্রহণ করিয়া এবং দানার আকৃতি দেখিয়া বুঝা যাইবে যে ইহা **খাদ্য-লবণ**। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি এইরূপ: **সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড+হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড=সোডিয়াম ক্লোরাইড+জল**। এই ভাবে অন্যান্য অ্যাসিড ও বেস (ক্ষারক) ব্যবহার করিয়া নানা রকমের লবণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সুতরাং দেখিতে পাইতেছ যে, **নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষারে নির্দিষ্ট পরিমাণ অম্ল মিশাইলে ক্ষার ও অম্ল উভয়েরই নিজ নিজ গুণ বিনিষ্ট হয় এবং তাহাদের বিক্রিয়ায় লবণ ও জল উৎপন্ন হয়।**

কয়েকটি লবণ, ক্ষার ও অম্লের গঠন ও ব্যবহার—(১) **সাধারণ লবণ**—সোডিয়াম ও ক্লোরিন, এই দুইটি মৌলের সমন্বয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইড যৌগ বা যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। সোডিয়াম ধাতুর একটি পরমাণু এবং ক্লোরিনের একটি পরমাণু দ্বারা লবণের একটি অণু গঠিত হয়। ইহা আমাদের খাদ্য-লবণ। সমুদ্রের জলে, লবণ-হ্রদে ও কোন কোন স্থানের খনিতে এই লবণ পাওয়া যায়। আমাদের

দেশে খাদ্য-লবণের প্রধান উৎস সমুদ্র। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সমুদ্রতীরে অগভীর, বিস্তৃত জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্রের জল দাঁড়াইতে দিলে বাষ্পীভবনের ফলে উহা ঘন হয় এবং তাহা হইতে লবণের দানা পৃথক্ হইয়া পড়ে।

সোডিয়াম ক্লোরাইডের ব্যবহার বহুবিধ। খাদ্য হিসাবে ইহার ব্যবহার অত্যাবশ্যক। ইহার সাহায্যে মাছ ও মাংস কিছু সময় অবিকৃত অবস্থায় রাখা হয়। ইহা হইতে সোডিয়াম ধাতু, সোডিয়াম কার্বনেট (কাপড় কাচার সোডা), কস্টিক সোডা, ক্লোরিন ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রস্তুত হয়। সোডিয়াম ক্লোরাইড হইতে যে সব রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করা হয় সাবান, কাচ, ব্লিচিং পাউডার (ক্লোরিন-সম্বলিত বিরঞ্জক) এবং আরও নানা শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য ঐসব রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার অপরিহার্য।

(২) সোডিয়াম কার্বনেট—ইহা কাপড় কাচার সোডা নামে প্রচলিত একটি লবণজাতীয় পদার্থ। ইহার ধাতব অংশ সোডিয়াম; আর অধাতব অংশ কার্বনেটে কার্বন ও অক্সিজেন রহিয়াছে। এই লবণের এক অণুতে দুইটি সোডিয়ামের পরমাণু, একটি কার্বনের পরমাণু ও তিনটি অক্সিজেনের পরমাণু রহিয়াছে। সোডিয়াম কার্বনেটের প্রতি অণুর সহিত দশটি জলের অণু সংযুক্ত থাকে। খুব গরম করিলে জলের ঐ সকল অণু উড়িয়া যায়।



১৩৬নং চিত্র—অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রের ভিতরের ব্যবস্থা

সোডিয়াম কার্বনেট একটি অতি প্রয়োজনীয় যৌগিক পদার্থ। ইহার উৎপাদন বৃহৎ শিল্পের অন্তর্গত। সেজন্য খাদ্য-লবণ, অ্যামোনিয়া ও চুনা-পাথর, এই তিনটি কাঁচা মালের প্রয়োজন।

সোডিয়াম কার্বনেট দ্বারা কাপড় কাচা হয়। কাচ প্রস্তুতের জন্য ইহা ব্যবহার করিতে হয়। সোডিয়াম কার্বনেট হইতে চুনের সাহায্যে কষ্টিক সোডা প্রস্তুত করা হয়।

সোডিয়াম কার্বনেট ও সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। কার্বন-ডাই-অক্সাইড জ্বলন ক্রিয়ার সহায়ক নহে, ইহা তোমরা জান। কাজেই কোন স্থানে আগুন

লাগিলে আগুনের উপর প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের ধারা প্রয়োগ করিলে বাহিরের বাতাস আর আগুনের সংস্পর্শে আসিতে পারে না। ফলে বায়ুর অক্সিজেনের অভাবে ঐ আগুন নিবিয়া যায়। এই তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া **অগ্নি-নির্বাপক-যন্ত্র** (Fire Extinguisher) তৈয়ারি করা হয়। তোমরা আফিস, সিনেমা হাউস প্রভৃতিতে এই অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র দেখিয়া থাকিবে। ইহা ধাতুনির্মিত; ইহার ভিতরে একটি কাচের বোতলে সালফিউরিক অ্যাসিড থাকে। আর ইহার বাকী অংশ ঘন সোডিয়াম কার্বনেটের দ্রবণে ভর্তি থাকে। ছোটখাট আগুন ধরিলে এই যন্ত্রের নীচের দিকের ডাটটি দিয়া মেজে, দেওয়াল প্রভৃতি কঠিন স্থানে ঘা দিতে হয়। ঘায়ের ফলে বোতলটি ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাহার অ্যাসিড সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণের সংস্পর্শে আসিয়া উচ্চ চাপে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে। তখন যন্ত্রের সরু দিকের মুখ দিয়া তরল পদার্থের ফেনা ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড জোরে বাহির হইয়া জ্বলন্ত বস্তুটিকে ঢাকিয়া ফেলে। ফলে আগুন নিবিয়া যায়।

(৩) কস্টিক সোডা—ইহার রাসায়নিক নাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড। ইহার এক অণুতে একটি সোডিয়াম পরমাণু, একটি অক্সিজেন পরমাণু ও একটি হাইড্রোজেন পরমাণু রহিয়াছে। ইহা সাদা, কঠিন পদার্থ, সহজেই জলে দ্রবণীয়। ইহা একটি তীব্র ক্ষার। ইহার দ্রবণ পিচ্ছিল; গায়ে লাগিলে চামড়ার ক্ষয় হয়। ইহা বায়ু হইতে জলীয় বাষ্প ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে।

বহু শিল্পে কস্টিক সোডা ব্যবহার করিতে হয়। সাবান, কাগজ, বস্ত্র ও কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা একটি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ বলিয়া ইহার উৎপাদন বৃহৎ শিল্পের অন্তর্গত।

সোডিয়াম কার্বনেটের দ্রবণের সহিত ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের (কলিচুন) দ্রবণ মিশাইয়া ঐ মিশ্রণকে উত্তপ্ত করিলে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কস্টিক সোডা পাওয়া যায়।

(৪) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড—ইহা একটি তীব্র অ্যাসিড। সোডিয়াম ক্লোরাইড ও ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড উত্তপ্ত করিলে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। ইহার গন্ধ উগ্র ও ঝাঁজালো। ইহা জলে অতিশয় দ্রবণীয়। এই দ্রবণকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বলে। ইহার

এক অণুতে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি ক্লোরিন পরমাণু রহিয়াছে।

রঙ, ঔষধ ও ফটোগ্রাফির প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুতের জন্য ও রঞ্জন-শিল্পে এই অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ধাতুর ক্লোরাইড শ্রেণীর লবণ ও ক্লোরিন প্রস্তুতের জন্য এবং বিজ্ঞানাগারের কাজে এই অ্যাসিড খুব বেশি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধাতুর ঝালা ও প্রলেপ দেওয়ার পূর্বে উহা পরিষ্কার করিবার জন্য এই অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়।

কৃষিকার্যে নাইট্রোজেন-যৌগিক

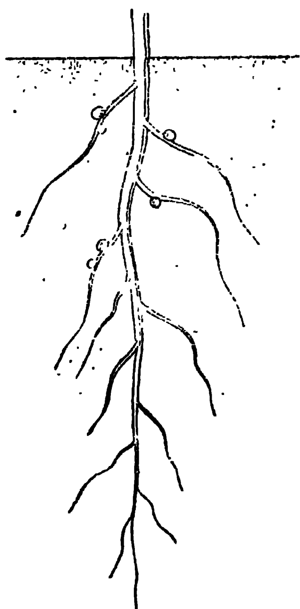
উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের দেহেই যে মৌলগুলি রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, পটাসিয়াম, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও সালফার প্রধান। ইহাদের মধ্য হইতে আবার ভিন্ন ভিন্ন রকমের মৌলের মিলনে জীবদেহের বিভিন্ন উপাদান, যেমন কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, সল্ট প্রভৃতি গঠিত হয়। গাছ সূর্যালোকে বায়ুর কার্বন-ডাই-অক্সাইড হইতে কার্বন সংগ্রহ করে। বাকী সমস্ত মৌলই গাছ মাটি হইতে মূলের সাহায্যে সংগ্রহ করিয়া থাকে।

মাটিতে অ্যামোনিয়া ও নাইট্রেট নামক নাইট্রোজেন-ঘটিত যে লবণ সমূহ থাকে তাহাই গাছের নাইট্রোজেন সংগ্রহের ভাণ্ডার। কোন ভাণ্ডারই অফুরন্ত হইতে পারে না। স্বভাবজাত ও কৃষিজাত উদ্ভিদ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করার ফলে মাটিতে নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্যের পরিমাণ কমিয়া যায়। বায়ুর নাইট্রোজেন নানা উপায়ে অন্যান্য মৌলের সহিত মিলিত হইয়া সেই ক্ষয় কতকাংশে পূরণ করিয়া থাকে। মুক্ত নাইট্রোজেনের এই মিলনকে **নাইট্রোজেন-বন্ধন** (**Fixation of Nitrogen**) বলে। ইহা নিম্নলিখিত উপায়ে হইয়া থাকে :

(১) বায়ুমণ্ডলে বিদ্যুৎ-ক্ষরণ (**Electric Discharge**) **দ্বারা**—ঊর্ধ্বে অবস্থিত বায়ুমণ্ডলে অহরহ বিদ্যুৎ-ক্ষরণ হইতেছে। ইহার ফলে বায়ুর কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন অক্সিজেনের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নাইট্রোজেনের অক্সাইড উৎপন্ন করে এবং পরে বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হইয়া নাইট্রিক অ্যাসিড রূপে মাটিতে পড়ে। সেখানে পটাসিয়াম বা সোডিয়াম

ক্ষারের সহিত বিক্রিয়ার ফলে নাইট্রেট উৎপন্ন হয়। এই দ্রাব্য নাইট্রেট উদ্ভিদ তাহার শিকড় দিয়া গ্রহণ করে এবং তাহা হইতে উপাদান নিয়া নিজ দেহে প্রোটিন উৎপাদন করে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর পক্ষে প্রোটিন অত্যাবশ্যক। নাইট্রোজেন অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় মৌল। সেইজন্য বায়ুস্থিত নাইট্রোজেন যদিও প্রশ্বাসের সহিত প্রাণীরা গ্রহণ করে তথাপি দেহের অন্য মৌলের সহিত ইহার মিলন ঘটাইয়া উহাকে নাইট্রোজেনের যৌগ প্রোটিনে পরিবর্তিত করিতে পারে না। এজন্য উদ্ভিদভোজী প্রাণী উদ্ভিদ হইতে প্রোটিন পাইয়া থাকে। আর মাংসাশী প্রাণী অন্য প্রাণী ভক্ষণ করিয়া প্রোটিন সংগ্রহ করিয়া থাকে।

(২) শিম্বজাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ে সংলগ্ন ব্যাকটিরিয়া দ্বারা—শিম, ছোলা, মটর প্রভৃতি গাছের শিকড়ে এক রকম গুটি থাকে। ঐ গুটিতে এক-প্রকার ব্যাকটিরিয়া বা জীবাণু জন্মে। ঐ জীবাণু বায়ুর নাইট্রোজেন সরাসরি গ্রহণ করিতে পারে এবং তাহা দ্বারা উদ্ভিদকে তাহার গ্রহণযোগ্য নাইট্রো-জেন-ঘটিত খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দেয়। ইহার পরিবর্তে সে উদ্ভিদ হইতে তাহার খাদ্য হিসাবে কার্বোহাইড্রেট পাইয়া থাকে। জীবাণুরা এই ভাবে গাছের সঙ্গে মিতালি করিয়া থাকে। বায়ু হইতে এই উপায়ে নাইট্রোজেন আহরণ খুব বেশি মাত্রায় হয় না। কারণ এই জাতীয় উদ্ভিদ সংখ্যায় কম। তবে বিদ্যুৎ-ক্ষরণ হইতে এই ভাবে নাইট্রোজেন আহরণ বেশিই হয়।

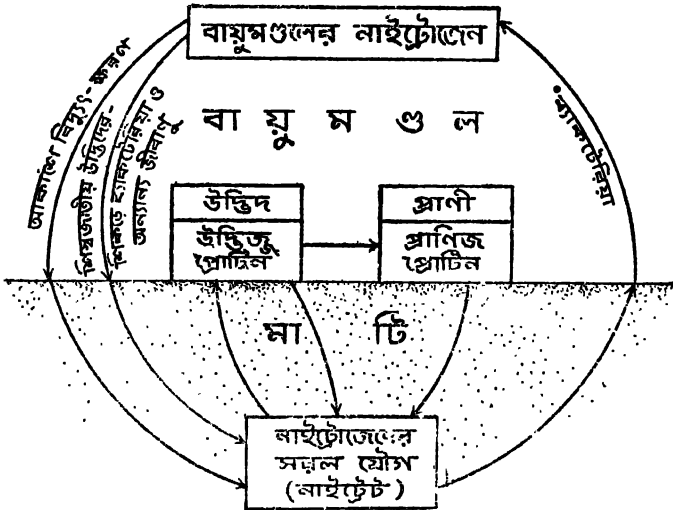


১৩৭নং চিত্র—শিম্বজাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ে গুটি

(৩) অ্যালজী (Algae) ও অন্যান্য ব্যাকটিরিয়া দ্বারা—মাটিতে অ্যালজী ও অন্যান্য ব্যাকটিরিয়া আছে যাহারা নিজেদের জীবনধারণের জন্য বায়ু হইতে সরাসরি নাইট্রোজেন নিয়া থাকে। মৃত্যুর পর ইহাদের দেহ হইতে নাইট্রোজেন মাটিতে আসে। অ্যালজী সম্বন্ধে

তোমরা দশম শ্রেণীতে আরও জানিতে পারিবে। অ্যালজী ও অন্যান্য জীবাণুরা সর্বত্র বিস্তৃত থাকায় ইহাদের দ্বারা নাইট্রোজেন আহরণ সব চেয়ে বেশি হয়।

পূর্বোক্ত তিনটি প্রাকৃতিক উপায়ে বায়ুমণ্ডলের মুক্ত নাইট্রোজেন মাটিতে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য খাদ্যে পরিণত হইয়া আবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহা চিত্রে দেখ।



১৩৮নং চিত্র—নাইট্রোজেন-চক্র

নাইট্রোজেনের মাটীতে বন্ধনের ফলে বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আবার মাটি হইতে উদ্ভিদ নাইট্রেট গ্রহণ করে বলিয়া মাটিতেও নাইট্রোজেনের মাত্রা কমিয়া যাইতে পারে মনে হয়। তবে ব্যাপারটি আসলে এইরূপ:

নাইট্রোজেন-চক্র (Nitrogen Cycle)—যে নাইট্রোজেন প্রোটিনের ভিতর দিয়া উদ্ভিদ হইতে প্রাণিদেহে প্রবেশ করে তাহার কতক ভাগ মলমূত্রের সহিত বাহির হইয়া মাটিতে মিশিয়া যায়। মলমূত্র এবং উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের পচনে ও প্রোটিনের বিশ্লেষণে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়। এই অ্যামোনিয়া মাটিতে অবস্থিত এক প্রকার ব্যাকটিরিয়া দ্বারা উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য নাইট্রেটে পরিবর্তিত হয়। সেই নাইট্রেটের কতকটা আবার উদ্ভিদেরা গ্রহণ করে এবং কতকটা হইতে আর এক প্রকার ব্যাকটিরিয়া দ্বারা পুনরায় মুক্ত নাইট্রোজেন উদ্ভূত হইয়া বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়া যায়।

এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া গুলির ফলে নাইট্রোজেন বায়ু হইতে মাটিতে, মাটি হইতে উদ্ভিদে, উদ্ভিদ হইতে প্রাণীতে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ হইতে পুনরায় মাটিতে যায় এবং মাটি হইতে তাহার কতক ভাগ পুনরায় বায়ুতে ফিরিয়া আসে। এই স্বতঃনিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়াকে **নাইট্রোজেন-চক্র** (Nitrogen Cycle) বলে। এই চক্রের ফলে বায়ুতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ সম্ভবত একই থাকে; কিন্তু পৃথিবীতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ক্রমবর্ধমান কৃষিকার্যের জন্য যে পরিমাণে নাইট্রোজেন মাটি হইতে ব্যয়িত হইতেছে সেই পরিমাণে বায়ুমণ্ডল হইতে ইহার পূরণ হইতেছে না। আর সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীর মলমূত্র মাটিতে আবদ্ধ না হইয়া নর্দমা দিয়া নদী ও সমুদ্রে চলিয়া যায়। এজন্য ভূভাগে অতি প্রয়োজনীয় নাট্রোজেনের ঘাটতি চলিয়াছে মনে হয়।

সার—উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় খাদ্যগুলি মৃত্তিকার মধ্যে কিছু না কিছু রহিয়াছে। কিন্তু ইহাতে শস্য জন্মাইলে অনেক খাদ্য বাহির হইয়া যায় এবং ফলে জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। যে সব পদার্থ জমিতে দিলে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাব পূরণ হয় এবং মাটির উর্বরতা ফিরিয়া আসে তাহাকে সার বলে। সার প্রধানতঃ দুই প্রকার, যথা—(১) **জৈব সার** ও (২) **অজৈব সার**।

(১) জৈব সার—(ক) **জীবজন্তুর মলমূত্র**, যেমন গোবর, গোমূত্র প্রভৃতি।

(খ) **সবুজ সার**—ধঞ্চে একটি শিম্বজাতীয় উদ্ভিদ। এই জাতীয় উদ্ভিদ ক্ষেতে জন্মাইয়া মাস দেড়েক পরে কাঁচা অবস্থায় লাঙ্গল দিয়া চাষ করিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া দিলে যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন মাটিতে যায়। ইহাকে **সবুজ সার** বলে। কোনও জমিতে ফসল জন্মাইবার অন্তত একমাস পূর্বে জমিতে সবুজ সার দিলে ভাল ফসল পাওয়া যায়।

কোন্ জমিতে প্রতি বৎসর একই ফসল, যেমন ধান চাষ করিলে ধানগাছ মাটি হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করার ফলে মাটির উৎপাদিকা শক্তি কমিয়া যায়। কিন্তু ঐ জমিতে যদি পর্যায়ক্রমে ধান এবং শিম্বজাতীয় উদ্ভিদ, যেমন মটর, খেসারি প্রভৃতির চাষ করা যায় তবে জমির উৎপাদিকা শক্তি কমে না; কারণ শিম্বজাতীয় উদ্ভিদ জমিতে নাট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ফসলবৃদ্ধির জন্য একই জমিতে পর্যায়ক্রমে ধান এবং কলাই বা মটরের চাষ করাকে **ফসলের আবর্তন** (Rotation of Crops) বলে।

(গ) **কমপোস্ট** (Compost)—কচুরি পানা, ঘাস, গাছপালা, বাড়ীর আবর্জনা, তরি-তরকারির খোসা, মাছের আঁইশ, জীবজন্তুর হাড়, রক্ত, মাংস প্রভৃতি একটি গর্তে তিন চারি মাস স্তূপাকারে রাখিলে অতি উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হয়। জৈব-আবর্জনার এই মিশ্রণ পচিয়া যে সার হয় তাহাকে **কমপোস্ট** বলে। জৈব সারে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় সব উপাদানই কমবেশি থাকে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যে অজৈব সার প্রস্তুত হয় তাহাতে একটি উপদানেরই আধিক্য থাকে।

(২) অজৈব বা রাসায়নিক সার—তোমরা জানিয়াছ স্বাভাবিক উপায়ে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনের বন্ধন হইতেছে। তাহা সত্ত্বেও জনসংখ্যার চাপে অধিক ফসল জন্মাইবার ফলে যে-কোন স্থানের ভূভাগে নাইট্রোজেনের ঘাটতি ঘটিয়া থাকে। এজন্য নাইট্রোজেন-ঘটিত সারের চাহিদা মিটাইবার জন্য কৃত্রিম উপায়ে নাইট্রোজেন-বন্ধন করিয়া সার প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ইহাকে **রাসায়নিক সার বলে। অ্যামোনিয়াম সালফেট** উদ্ভিদের একটি অতি প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন সার। ইহা অ্যামোনিয়া হইতে প্রস্তুত করা হয়। প্রথম যুদ্ধের সময় জার্মানিতে যুদ্ধের বিস্ফোরক তৈয়ারির জন্য স্বভাবজাত নাইট্রোজেন যৌগিকের অভাব দেখা দিলে **বৈজ্ঞানিক হেবারের** (Haber) আবিষ্কৃত প্রণালীতে হাইড্রোজেন ও বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন যুক্ত করিয়া অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল। বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইহা এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। ইহাকে অ্যামোনিয়ার সংশ্লেষণ (Synthesis) বলে। বিহারে সিন্ত্রিতে এই উপায়ে অ্যামোনিয়া উৎপাদনের প্রথম কারখানা এই দেশে স্থাপিত হইয়াছে। অ্যামোনিয়ার এক অণুতে নাইট্রোজেনের এক পরমাণু ও হাইড্রোজেনের তিনটি পরমাণু রহিয়াছে। অতি উত্তপ্ত কয়লার উপর দিয়া স্টীম চালনা করিয়া তাহা হইতে হাইড্রোজেন সংগ্রহ করা হয়। আবার উত্তপ্ত কয়লার উপর দিয়া বায়ুস্রোত চালনা করিয়া তাহা হইতে নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। তাহার পর হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেনের মিশ্রণকে অতি উচ্চ চাপে এবং অতি উচ্চ উষ্ণতায় যুক্ত করা হয়। ফলে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়। অ্যামোনিয়ার সঙ্গে ক্যালসিয়াম সালফেট ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড যোগ করিয়া অ্যামোনিয়াম সালফেট ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট পাওয়া যায়। অ্যামোনিয়া হইতে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটও তৈয়ারি করা যায়।

এপর্যন্ত নাইট্রোজেন সারের কথাই বলা হইল। কিন্তু মানুষের যেমন খাদ্য **সুষম** (Balanced) হওয়া চাই গাছের খাদ্যও সেইরূপ সুষম হওয়া দরকার। এজন্য উদ্ভিদের খাদ্যে আরও দুইটি অতি প্রয়োজনীয় মৌল, যথা, ফসফরাস ও পটাসিয়াম উপযুক্ত পরিমাণে থাকা আবশ্যক। এই দুইটি উপাদানের জন্য ক্যালসিয়াম সুপার ফসফেট ও পটাসিয়াম সালফেট প্রস্তুত করা হয়।

৩

চুন ও চুনজাত দ্রব্য

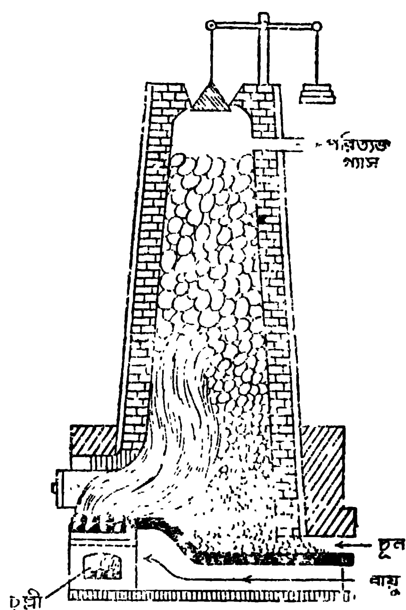
চুন—চুনের রাসায়নিক নাম **ক্যালসিয়াম অক্সাইড**। ইহার এক অণুতে একটি ক্যালসিয়াম পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু রহিয়াছে।

চুনা পাথর (Limestone), খড়িমাটি (Chalk), মার্বেল (Marble) প্রভৃতি খনিজ পদার্থ পৃথিবীর সর্ব দেশেই পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে কাটনি, বিসরা, জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানে এই সকল পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। ইহারা প্রত্যেকেই ক্যালসিয়াম, কার্বন ও অক্সিজেন মৌল দ্বারা গঠিত একটি যৌগ। ইহাদের রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট। শামুক ও ঝিনুকের খোলাতে ক্যালসিয়াম কার্বনেট আছে। ক্যালসিয়াম কার্বনেট খুব বেশি উত্তপ্ত করিলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড (চুন) ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডে বিশ্লিষ্ট হয়। চুন প্রস্তুত করিবার ইহাই সাধারণ পদ্ধতি।

চুন-প্রস্তুতি— (১) সবিরাম-পদ্ধতি—ইটের তৈয়ারি ভাটি বা বিশেষ রকমের চুলাতে চুনাপাথর ও কাঠ বা কয়লা স্তরে স্তরে সাজাইয়া তিন চারি দিন পুড়ানো হয়। প্রচণ্ড উত্তাপে চুনা পাথর পুড়িয়া বিশ্লিষ্ট হয়। ধোঁয়া ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড উপরের চিমনি দিয়া বাহির হইয়া যায়। ভাটি শীতল হইলে ইহার তলদেশে এক পার্শ্বে যে মুখ থাকে সেদিক দিয়া চুন বাহির করা হয়। তাহার পর ভাটি আবার চুনা পাথর ও জ্বালানি দিয়া ভর্তি করিতে হয়। এই পুরাতন প্রথা মতে চুন প্রস্তুতির কাজ অবিরাম চলিতে পারে না বলিয়া ইহাকে **সবিরাম পদ্ধতি** বলে।

(২) অবিরাম পদ্ধতি—বর্তমানে **অবিরাম পদ্ধতিতে** চুনা পাথর হইতে চুন তৈয়ারি করা হয়। এজন্য ইটের যে ভাটি তৈয়ারি করা

হয় তাহা দেখিতে উঁচু স্তম্ভের মত। নীচ হইতে উপরের দিকে ক্রমশ সরু এই ভাটির মাথায় যে ফাঁক থাকে, তাহা দিয়া ভিতরে চুনা পাথরের টুকরা ফেলিয়া ভাটিটি ভর্তি করা হয়। তাহার পর ফাঁকটি বিশেষ ভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ভাটির নীচ দিকে এক পার্শ্বে অবস্থিত উনানে কোক-কয়লা জ্বালানো হয়। অপর পার্শ্ব হইতে বায়ুস্রোত ঐ জ্বলন্ত কয়লার উপর দিয়া চালাইবার ফলে যে সব উত্তপ্ত গ্যাসের সৃষ্টি হয় তাহা চুনা পাথরের স্তূপের ভিতর দিয়া উপরের দিকে যায়। ভাটির ভিতরের উষ্ণতা প্রায় ১০০০° সেন্টিগ্রেড হইলে চুনা পাথর হইতে ক্যালসিয়াম অক্সাইড (চুন) এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। উত্তপ্ত গ্যাস-প্রবাহের



১৩৯নং চিত্র—অবিরাম পদ্ধতিতে চুন প্রস্তুতি

সহিত উৎপন্ন কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস উপরের নির্গম পথ দিয়া বাহির হইয়া যায়। ভাটির নীচে চুন আসিয়া জমা হয় এবং তাহা একটি দরজা দিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয়। চুন বাহির করিয়া নেওয়ার পর উপরের ঢাকনা সরাইয়া পুনরায় চুনা পাথর ভাটির ভিতর দেওয়া হয়। এজন্য ভাটিটি ঠাণ্ডা করিবার প্রয়োজন হয় না এবং চুন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস অবিরাম ভাবে উৎপন্ন হইতে থাকে।

চুনের ধর্ম—ইহা একটি সাদা কঠিন পদার্থ। ইহার গলনাঙ্ক খুব উচ্চ বলিয়া ইহাকে গলানো খুবই কঠিন। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণ প্রায় ২৪০০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় জ্বলিয়া থাকে। সেই জ্বলন্ত মিশ্রণের মধ্যেও চুন না গলিয়া ভাস্বর হইয়া উঠে এবং অত্যুজ্জ্বল আলোক দিতে থাকে।

চুন অনাবৃত অবস্থায় রাখিয়া দিলে ইহা বায়ু হইতে জলীয় বাষ্প ও

কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করিতে থাকে এবং কিছুকাল পরে ক্যালসিয়াম কার্বনেটে পরিণত হয়।

চুনের উপর জলের ক্রিয়া—জলের প্রতি চুনের আসক্তি খুব বেশি, কিন্তু সেজন্য চুন জলে খুব বেশি দ্রবণীয় নহে। চুন একটি ক্ষারক বা বেস। শুষ্ক চুনের একটা পিণ্ডের উপর সামান্য জল দিলে চুন উহা তৎক্ষণাৎ সশব্দে শোষণ করিয়া নেয়। তাহার পর জলের সঙ্গে চুনের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। এই বিক্রিয়ায় যথেষ্ট তাপের সৃষ্টি হয়, কিছু জল স্টীমের আকারে বাহির হইয়া যায়, পিণ্ডটি ফুলিয়া উঠে এবং আপনা-আপনি ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যায়। এই গুঁড়াকে **ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড** বা **স্লেক্‌ড লাইম** (Slaked Lime) বলে। ইহাই কলিচুন বা পানের সঙ্গে খাওয়ার চুন।

ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা কলিচুনের ধর্ম—ইহা একটি তীব্র ক্ষার। ইহা জলে অতি সামান্য মাত্রায় দ্রবণীয়। প্রায় ৪৫০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত করিলে ইহা শোষিত জল পরিত্যাগ করিয়া ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা চুনে পরিণত হয়।

চুনের জল (Lime Water)—কলিচুন অতিরিক্ত পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত করিলে যে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার দ্রবণ পাওয়া যায় তাহা হইলে চুনের জল। খোলা অবস্থায় থাকিলে ইহার উপরি ভাগে বায়ুর কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে মিলনে ক্যালসিয়াম কার্বনেট গঠিত হয়। কোন পাত্রে চুনের জল রাখিলে ঐ জলের উপর কয়েক দিনের মধ্যেই সাদা সরের মত পদার্থ দেখা যায়। তাহা ক্যালসিয়াম কার্বনেট।

চুনগোলা (Milk of Lime)—কলিচুন যদি কম জলের সহিত মিশ্রিত করা হয় তবে অল্প পরিমাণ কলিচুন জলে দ্রবীভূত হওয়ার পর বাকী কলিচুন জলে অবলম্বিত অর্থাৎ জলের মধ্যে সর্বত্র ভাসমান অবস্থায় থাকে। ইহা দেখিতে অনেকটা দুধের মত বলিয়া ইহাকে মিল্ক-অব-লাইম বলে। সস্তা ক্ষার বলিয়া ইহা শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

চুনের ব্যবহার—কলিচুন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইড প্রভৃতির কাজে চুন ব্যবহার করা হয়। ক্যালসিয়াম কার্বাইড জলের সঙ্গে বিক্রিয়ায় অ্যাসিটিলিন নামক দাহ্য গ্যাস উৎপন্ন করে। এজন্য গ্যাসের বাতিতে ক্যালসিয়াম কার্বাইড ব্যবহার করা হয়।

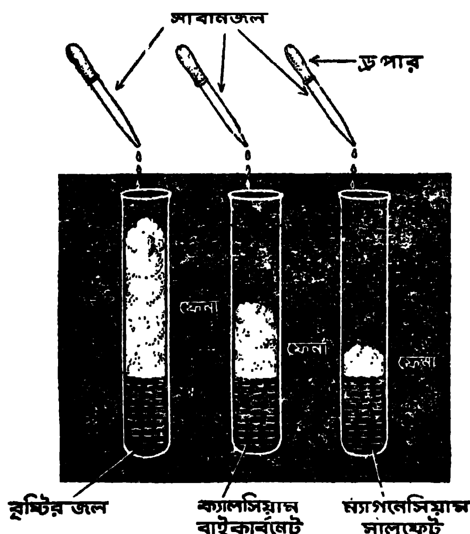
কলিচুন কস্টিক সোডা, কাচ, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি প্রস্তুতির জন্য ব্যবহার করা হয়। কলিচুন ও ক্লোরিন গ্যাসের বিক্রিয়ায় ব্লিচিং পাউডার (Bleaching Powder) উৎপন্ন হয়। ব্লিচিং পাউডার জীবাণুনাশক দ্রব্য হিসাবে এবং সুতা, বস্ত্র প্রভৃতির রঙ্গ দূর করিয়া সাদা করার কাজে ব্যবহৃত হয়। বাড়িঘর চুনকামের জন্য কলিচুন ব্যবহার করা হয়। কলিচুন ও বালি অল্প জল দিয়া মিশাইয়া চুনামর্টার (Lime Mortar) প্রস্তুত করা হয়। কলিচুন বালির ছিদ্রের ভিতর দিয়া বায়ু হইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করিয়া ক্যালসিয়াম কার্বনেটে পরিণত হয়। ফলে সমস্ত মিশ্রণটা জমাট বাঁধিয়া গাঁথনির ইট, পাথর প্রভৃতি শক্ত করিযা আটকাইয়া রাখে।

খর ও মৃদু জল
Hard and Soft Water

জলে সাবান ঘষিলে উহা হইতে ফেনা বাহির হয়, ইহা তোমরা জান। কিন্তু সকল কূপ, নদী বা প্রস্রবণের জলে সমান ফেনা হয় না। কোন কোন জলে সাবান ঘষিয়া ফেনা প্রায় পাওয়াই যায় না। তাহার পরিবর্তে সাবান হইতে ময়লা ছানার গুঁড়ার মত এক প্রকার পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই রূপে অনেক সাবান ক্ষয় হইবার পর ফেনা হইতে দেখা যায়। এই ভাবে জলকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যে জলে সহজে সাবানের ফেনা হয় তাহাকে **মৃদু জল** (Soft Water) এবং যাহাতে সহজে ফেনা হয় না তাহাকে **খরজল** (Hard Water) বলা হয়।

পরীক্ষা—খর ও মৃদু জল নিয়া এখন পরীক্ষা করা হইবে। তিনটি টেস্ট-টিউব লও। প্রথমটির (ছবির বাম দিকে) এক-তৃতীয়াংশ বৃষ্টির জল বা পাতিত জল (Distilled Water) দ্বারা পূর্ণ কর। দ্বিতীয়টির এক-তৃতীয়াংশ পরিষ্কার চুনের জল দিয়া এবং তৃতীয়টির এক-তৃতীয়াংশ বৃষ্টির জল বা পাতিত জলে পূর্ণ কর। বৃষ্টির জল বা পাতিত জল মৃদু, কারণ ইহাদের মধ্যে কোন খনিজ পদার্থ থাকে না। একটি ঔষধের ড্রপারের সাহায্যে প্রথম টেস্ট-টিউবের জলে পাঁচ ফোঁটা তরল সাবান ফেল। টেস্ট-টিউবের মুখ

বন্ধ করিয়া উহা জোরে ঝাঁকাও। দেখিবে সাদা ফেনায় টেস্ট-টিউব প্রায় ভর্তি হইয়া গিয়াছে।



১৪০ নং চিত্র—খর ও মৃদু জল নিয়া পরীক্ষা

একটা সরবত খাওয়ার নল বা সরু কাচের নল দিয়া দ্বিতীয় টেস্ট-টিউবের চুনের জলের মধ্যে ফুঁ দিতে থাক। জল ঘোলা হইয়া ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সৃষ্টি হইবে। পরে আরও কিছু ক্ষণ ফুঁ দিলে ক্যালসিয়াম কার্বনেট অতিরিক্ত কার্বনিক অ্যাসিডের সংযোগে জলে গুলিয়া যাইবে। এভাবে এই জলের মধ্যে গলিত লবণ থাকায় তাহা খর হইয়া যাইবে। এবার ইহার ভিতরে পাঁচ ফোঁটা সাবান দিয়া টেস্ট-টিউবটি ঝাঁকাইয়া ফেনা বাহির করিবার চেষ্টা কর। প্রথম টেস্ট-টিউবে যত ফেনা হইয়াছিল তাহার চার ভাগের এক ভাগ কি আরও কম হইতে পারে।

তৃতীয় টেস্ট-টিউবের মৃদু জলের মধ্যে এক চিমটি ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ফেলিয়া দাও। তাহার পর ইহার সহিত পাঁচ ফোঁটা সাবান মিশাইয়া টেস্ট-টিউবটি ঝাঁকাও। এবার ফেনা খুব সামান্যই হইবে।

এইরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে জলে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়ামের বাই-কার্বনেট বা সালফেট থাকিলে তাহাতে সাবান গুলিয়া সহজে ফেনা পাওয়া যায় না। এরূপ জলকে খর জল বলে।

খর জলে সাবানের ফেনা না হইয়া ছানার গুঁড়ার মত হয় কেন? ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম ধাতু-ঘটিত লবণের সহিত সাবানের উপাদানের রাসায়নিক সংযোগের ফলেই এরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং যত ক্ষণ জলে এই সব ধাতু-ঘটিত লবণ থাকিবে তত ক্ষণ সাবানের ফেনা না হইয়া উহা বৃথা নষ্টই হইবে।

ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর বাই-কার্বনেট অথবা উভয়েই যখন জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে তখন ঐ জল ফুটাইলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড জল হইতে বাহির হইয়া যায় এবং দ্রবীভূত বাই-কার্বনেট অদ্রবণীয় কার্বনেটে পরিবর্তিত হইয়া জল হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। ফলে জল আর খর থাকেনা, কোমল হইয়া পড়ে এবং সাবানের সহিত সহজেই ফেনা উৎপন্ন করে। কাজেই ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর বাই-কার্বনেট জলে থাকিলে জলের যে খরতা থাকে তাহা জল ফুটাইয়াই দূর করা যায়। এই প্রকারের খর জলকে **সাময়িক** বা **অস্থায়ী খর জল** বলা হয়।

জলে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর সালফেট বা ক্লোরাইড দ্রবীভূত অবস্থায় থাকিলে তাহাকে **স্থায়ী খর জল** বলে। কারণ ঐ জলকে ফুটাইলে তাহার খরতা দূর হয় না। স্থায়ী খর জলকে কোমল করিতে হইলে উহার সঙ্গে সোডিয়াম কার্বনেট বা কাপড় কাচার সোডা মিশাইলে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর ক্লোরাইড ও সালফেট রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে অদ্রবণীয় কার্বনেটে পরিবর্তিত হইয়া পৃথক্ হইয়া পড়ে। ফলে জল কোমল হইয়া যায় এবং তখন সাবানের সহিত সহজেই ইহার ফেনা হয়।

খর জলে সাবান দিয়া কাপড় কাচা চলে না। স্টীম এঞ্জিনে খর জল ব্যবহার করা উচিত নহে। কারণ ঐ জল ফুটাইবার ফলে উহা হইতে কার্বনেট পৃথক হইয়া বয়লারের গায়ে পাথরের মত শক্ত হইয়া জমিতে থাকে। ইহাতে বয়লারের বিশেষ ক্ষতি হয়। চায়ের কেটলির ভিতরে কঠিন পদার্থের আবরণ দেখা যায়। ইহা কি এবং কি ভাবে উৎপন্ন হয় বল।

প্রশ্ন

১। সাধারণত কি প্রকারে অক্সাইড উৎপন্ন হয়? কয়েকটি অধাতুর অক্সাইড ও ধাতুর অক্সাইডের নাম বল। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কি?

২। অ্যাসিড কাহাকে বলে? ইহার সাধারণ ধর্ম কি কি পরীক্ষা দ্বারা দেখানো যাইতে পারে?

৩। ক্ষারক কাহাকে বলে? ক্ষার ও ক্ষারকের মধ্যে পার্থক্য প্রত্যেকের দুইটি করিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া বল।

৪। লবণ কাহাকে বলে এবং সাধারণত কি ভাবে উৎপন্ন হয়? আমাদের নিত্যব্যবহার্য দুইটি লবণের উপাদান ও ব্যবহার সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৫। উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল ও মৃত্তিকা হইতে কিরূপে নাইট্রোজেন পাইয়া থাকে বুঝাইয়া বল।

৬। নাইট্রোজেন-চক্র কাহাকে বলে? চিত্রের সাহায্যে বুঝাইয়া বল।

৭। সার কত প্রকার ও কি কি, দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া বল।

৮। বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া কি সার কি ভাবে প্রস্তুত করা হয়?

৯। চুনের উপাদান কি কি এবং ইহা কি ভাবে প্রস্তুত করা যায়?

১০। চুন ও কলিচুন হইতে প্রধানত কি কি দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং তাহারা কি কি কাজে লাগে?

১১। খর জল ও মৃদু জল কাহাকে বলে? কি কারণে জল খর হয় এবং কি পরীক্ষা দ্বারা খরতা বুঝা যাইতে পারে?

১২। জলের খরতা কয় প্রকার ও কি কি? ইহা দূর করিবার উপায় বর্ণনা কর।

বিষয়গত প্রশ্ন

(নির্দেশ পূর্বের ন্যায়)

১। ঠিক উক্তি নির্বাচন

(ক) হাইড্রোজেন কি সকল অ্যাসিডেরই উপাদান? ——

(খ) নাইট্রোজেন কি উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের জন্যই অত্যাবশ্যক? ——

(গ) চুন কি ক্ষারক? ——

২। শূন্যস্থান পূরণ

(ক) কস্টিক সোডার দ্রবণ——(১) ——(১)

লিটমাসকে——(২) করিয়া দেয়। ——(২)

ইহা একটি——(৩)। ——(৩)

ইহাদ্বারা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রশমিত করিলে——(৪) ও ——(৪)

——(৫) উৎপন্ন হয়। ——(৫)

৩। কয়েকটি উত্তরের মধ্যে ঠিক উত্তর নির্বাচন

জীবের নাইট্রোজেন গ্রহণের ফলে বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কমিতে পারে না। কারণ—

(১) প্রাণী শ্বাসকার্যের জন্য যে বায়ু টানিয়া নেয় তাহা হইতে নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলে ফিরাইয়া দেয়।

(২) বিশাল বায়ুমণ্ডলের তুলনায় জীব যে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে তাহার পরিমাণ নগণ্য।

(৩) জীবের মলমূত্র ও জীবদেহের পচনে মাটিতে যে নাইট্রোজেন-সল্ট গঠিত হয়, তাহার এক অংশ হইতে ব্যাকটিরিয়া দ্বারা নাইট্রোজেন মুক্ত হইয়া বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়া যায়।

জীব-জগৎ

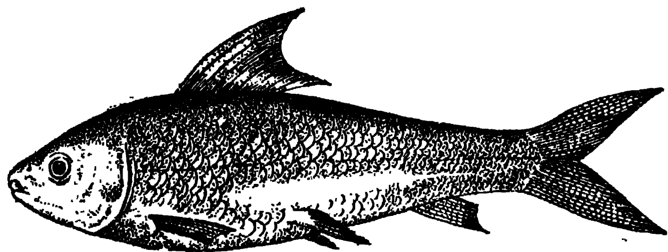
(Living Beings)

১

মাছ

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মাছ সর্বনিম্ন স্তরের প্রাণী। ইহারা জলচর। মাছের মধ্যে রুই ও কাতলা সুপরিচিত। তোমরা রুই মাছের বাহিরের ও ভিতরের গঠন কিরূপ এখন জানিবে।

রুই মাছঃ বাহিরের গঠন—একটি রুই মাছ ভাল করিয়া দেখ। ইহার শরীরের মধ্যভাগ চওড়া, মুখ ও লেজের দিক অপেক্ষাকৃত সরু এবং পার্শ্ব দিকে চাপা। এই রূপ গঠনের ফলে মাছ মাত্রই কম বাধা পাইয়া

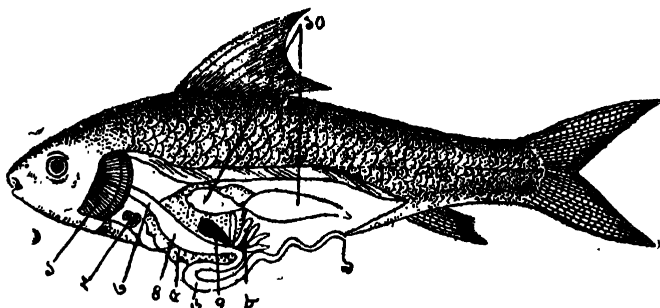


১৪১নং চিত্র—রুই মাছ

জলে বিচরণ করিতে পারে। রুই মাছের শরীর বড় বড় আঁশ দিয়া আগাগোড়া ঢাকা। আঁশের উপর এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ মাখানো থাকে; সেই জন্য ইহাদের দেহ পিচ্ছিল। মাথার সামনে দুইটি নাকের ছিদ্র আছে। **নাক** শ্বাসকার্যে কোন সাহায্য করে না, তবে আঘ্রাণের জন্য দরকার হয়। মাথার উপরে দুই পাশে এক জোড়া **চোখ** আছে, কিন্তু চোখের পাতা নাই। কাজেই ইহাকে চোখ খোলা রাখিয়াই ঘুমাইতে হয়। মাছের **কান** বাহির হইতে দেখা যায় না; তাহা মাথার মধ্যে লুকানো থাকে। মাথার দুই পাশে **কানকো** দিয়া ঢাকা লাল রঙের **ফুলকা** রহিয়াছে। শরীরের নানা স্থানে **পাখনা** রহিয়াছে। কানকোর দুই পাশে ও পেটের দুই পাশে এক এক জোড়া করিয়া পাখনা আছে। এই চারিটি পাখনা মানুষের হাত

পায়ের মত। ইহা ছাড়া পিঠের উপর ও পেটের পেছনে একটি করিয়া পাখনা থাকে। সব চেয়ে বড় ও শক্তিশালী পাখনা রহিয়াছে লেজে। এইটি মাছ চলিবার সময় নৌকার হালের মত দিক ঠিক রাখে বা চলিবার দিক ঘুরাইয়া দেয়। পাশের দুই জোড়া পাখনা নৌকার বৈঠার মত কাজ করে অর্থাৎ এই গুলির সাহায্যে মাছ জল কাটিয়া চলিতে পারে। মাছের দেহে কানকো হইতে আরম্ভ করিয়া লেজ পর্যন্ত দুই পাশে দুইটি রেখার মত দেখা যায়। এই রেখার ভিতরের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া মাছ বাহিরের অনুভূতি পায়। ইহাদের শরীরে মাংসপেশি ও পিঠের শিরদাঁড়ায় অনেক গুলি অস্থি থাকায় ইহারা জলে সহজে চলাফেরা করিতে পারে।

ভিতরের গঠন—একটি রুই মাছ পেটের দিকে লম্বালম্বি ভাবে ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখ। আর দুই পাশের কানকো তুলিয়া ফেলিয়া ফুলকা দুইটি দেখ।

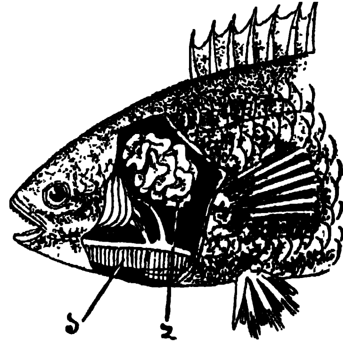


১৪২নং চিত্র—রুই মাছের ভিতরের গঠন

১। ফুলকা ২। হৃৎপিণ্ড ৩। খাদ্যনালী ৪। পাকস্থলী ৫। যকৃৎ
৬। অন্ত্র ৭। পিত্তস্থলী ৮। বৃক্কনালী পায়ু । পটকা

শ্বাসতন্ত্র—রুই মাছের ফুসফুস নাই; শ্বাসকার্য ফুলকার সাহায্যে সম্পাদিত হয়। ফুলকাগুলি দেখিতে বাঁকা চিরুনির মত; দুই পার্শ্বে ৪টি করিয়া ৮টি ফুলকা থাকে। ইহাদের মধ্যে অনেক রক্তনালী থাকায় ইহাদিগকে লাল দেখায়। শ্বাস গ্রহণের সময় মাছ মুখের মধ্যে খানিকটা জল টানিয়া লয়। ঐ জলে অক্সিজেন গোলা থাকে। জল লইবার আগে মুখ-গহ্বরের তলদেশ নীচু করিয়া গহ্বরটি বড় করে। জল টানিবার সময় উহাদের কানকো দুইটি বন্ধ থাকে। তাহার পর উহারা মুখ বন্ধ করিয়া মুখ-গহ্বরের তলদেশ উঁচু করে। ইহাতে মুখ-গহ্বরটি ছোট হওয়ার ফলে জলে খুব চাপ

পড়ে এবং ভিতরের জল ফুলকার মধ্যে চলিয়া যায়। জলের মধ্যে যে অক্সিজেন গোলা থাকে তাহা ফুলকার ভিতরের রক্তনালীর অতি পাতলা আবরণ ভেদ করিয়া রক্তের সহিত মিশিয়া যায় এবং ঐ রক্তের দ্বারা অক্সিজেন সমস্ত শরীরে সঞ্চালিত হয়। পূর্বের দূষিত রক্তে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছিল তাহাও রক্তনালীর সূক্ষ্ম আবরণের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হয় এবং কানকো দিয়া বাহির হইয়া যায়।



১৪৩নং ছবি—কই মাছের (১) ফুলকা (২) অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র

কাতলা, ভেটকি, পারশে প্রভৃতি মাছ রুই মাছের মতই ফুলকা দ্বারা শ্বাসকার্য চালায়। কই, মাগুর ও শিঙ্গি মাছের শ্বাসগ্রহণ প্রণালী আরও উন্নত ধরনের। এই সব মাছ ফুলকার সাহায্যে জলের মধ্যে শ্বাসকার্য চালায়। ডাঙ্গায় তুলিয়া আনিলেও উহারা অনেক ক্ষণ বাঁচিয়া থাকে। এজন্য ফুলকার উপরের দিকে তাহাদের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র রহিয়াছে। ইহা স্পঞ্জের মত মোলায়েম। কই মাছের মুড়া খাইবার সময় ইহা দেখিয়া থাকিবে। ইহার সাহায্যে কই মাছ ডাঙ্গাতেও আমাদের মত সরাসরি বাহিরের বায়ু গ্রহণ করিয়া বেশ কিছু কাল জীবিত থাকিতে পারে।

রক্ত-সঞ্চালন-তন্ত্র—দুই দিকের ফুলকার মাঝে একটু নীচে মাছের হৃৎপিণ্ড রহিয়াছে। হৃৎপিণ্ডের দুইটি প্রকোষ্ঠ, একটির নাম **অলিন্দ** (Auricle), অপরটির নাম **নিলয়** (Ventricle)। সমস্ত শরীর হইতে অক্সিজেনহীন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডপূর্ণ রক্ত শিরার সাহায্যে অলিন্দে যায়। ঐ রক্ত অলিন্দ হইতে নিলয়ে গেলে নিলয় তাহাকে ধমনি দিয়া দুই পাশের ফুলকায় পাঠাইয়া দেয়। পূর্বে বর্ণিত প্রণালী মতে ঐ রক্ত ফুলকাতে বিশোধিত হয় এবং সেখান হইতে ধমনি দিয়া সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হয়। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে মাছের হৃৎপিণ্ডে বিশুদ্ধ রক্ত থাকে না।

পরিপাক-তন্ত্র—রুই মাছের মুখের ভিতর ও পেট লম্বালম্বি ভাবে কাটিয়া পরিপাক-তন্ত্রের অংশগুলি বাহির করিয়া দেখ। মুখ-গহ্বর বেশ বড়। তাহাতে একটি ছোট জিহ্বা আছে। মুখ-গহ্বরের শেষের দিকে

দাঁতের মত যে অংশ আছে তাহা দিয়া মাছ খাদ্য চিবাইয়া নরম করে। ইহার পরের অংশের নাম **খাদ্যনালী**। ইহা **পাকস্থলীর** সঙ্গে সংযুক্ত। পাকস্থলীটি থলির মত। পাকস্থলী হইতে **অন্ত্র** বাহির হইয়াছে। ইহা বেশ লম্বা নলের মত, নানা রকম পাক খাইয়া গিয়া মলনালীতে পড়িয়াছে। মলনালী **পায়ুতে** শেষ হইয়াছে। পাকস্থলীর দুই ধারে **যকৃতের** দুইটি অংশ রহিয়াছে। এই দুই অংশের মধ্যে **পিত্তস্থলী**। মাছ কুটিবার সময় ইহা সাবধানের সহিত ফেলিয়া দিতে হয়, নতুবা মাছ পিত্তরসে তিক্ত হইয়া যাইতে পারে। অন্ত্র যে স্থল হইতে আরম্ভ হইয়াছে সেই স্থলে পাঁচটি **বদ্ধনালী** রহিয়াছে।

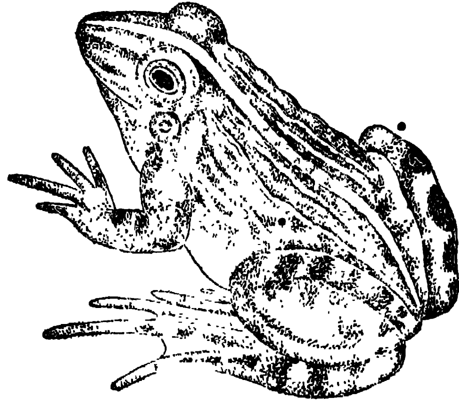
রুই মাছের পটকা তোমরা বোধ হয় দেখিয়াছ। ইহার ছোট ও বড় দুইটি থলি বায়ুপূর্ণ থাকে। মাছ জলে ভাসিবার সময় পটকার ভিতর গ্যাস প্রবেশ করিয়া শরীরকে হাল্কা করিয়া দেয় এবং ডুবিবার সময় ঐ গ্যাস পটকার বাহিরে যায় বলিয়া দেহের আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়িয়া যায়।

ব্যাঙ

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে ব্যাঙ যে শ্রেণীর অন্তর্গত তাহাকে **উভচর শ্রেণী** বলে। উভচর এই জন্য বলা হয় যে, ইহাদের জীবনের প্রথম অবস্থা জলের মধ্যে কাটে। পরিণত বয়সে ইহারা স্থলের জীব হইয়া দাঁড়ায়। জলচর অবস্থায় ইহাদের মাছের ন্যায় ফুলকা থাকে এবং স্থলচর অবস্থায় ইহাদের ফুসফুস থাকে। আমাদের দেশে নানা জাতির ব্যাঙ দেখা যায়। যে-দুই জাতির ব্যাঙ আমরা সাধারণত দেখিতে পাই, তাহাদের একটি হইল **কুনো ব্যাঙ**, আর একটি হইল **সোনা ব্যাঙ** বা কোলা ব্যাঙ। কুনো ব্যাঙ স্থলচর। ইহাদের চামড়া খসখসে। সমস্ত শরীরে আঁচিলের মত ছোট ছোট গুটি থাকে। ইহাদের তুলনায় সোনা ব্যাঙ আকারে বড় ও দেখিতে সুন্দর। সোনা ব্যাঙ সাধারণত জলে থাকে, সময় সময় জলাশয়ের নিকটে ডাঙ্গায় ঘুরিয়া বেড়াইতেও দেখা যায়।

বাহিরের গঠন—একটি ব্যাঙ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ। ইহার শরীরে দুইটি ভাগ—মাথা ও দেহকাণ্ড। ইহার ঘাড় নাই। মস্তকের

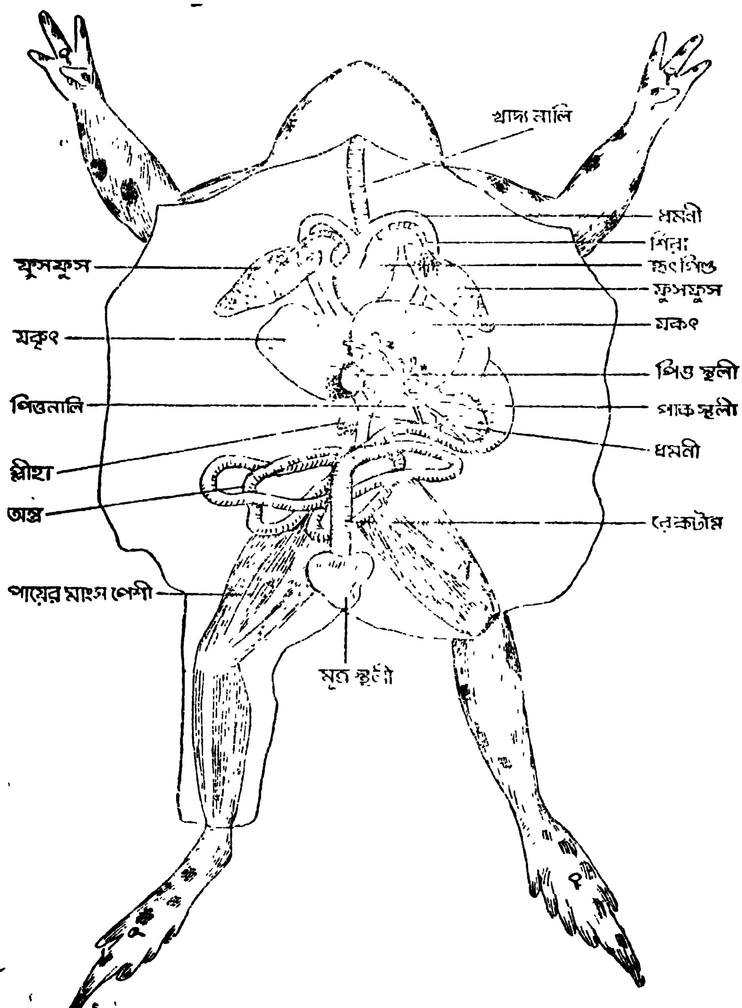
অগ্রভাগ সরু, চোখ দুইটি বড় ও গোলাকার এবং তাহাতে তিন প্রকার চোখের পাতা আছে। উপরের পাতা বড়, নীচের পাতা খুব ছোট। তৃতীয় পাতাটি খুব পাতলা। ইহা দ্বারা ব্যাঙ চক্ষু ঢাকিয়া রাখে। ইহাদের মুখের হাঁ মস্ত বড়। আমাদের মত ব্যাঙের নাকের দুইটি ছিদ্র আছে এবং তাহাতে দুইটি ঢাকনি লাগানো আছে। এই ঢাকনি দ্বারা তাহারা প্রয়োজন মত নাকের ছিদ্র খুলিতে বা বন্ধ করিতে পারে। ইহাদের চক্ষুর পিছনে পাতলা চামড়া দিয়া ঢাকা দুইটি কান আছে। ইহাদের সামনের পা ছোট এবং পিছনের পা বড়; এজন্য ইহারা লাফাইয়া দূরে যাইতে পারে। সামনের পায়ে চারিটি এবং পিছনের পায়ে পাঁচটি করিয়া আঙ্গুল আছে। সোনা ব্যাঙের পিছনের পায়ের আঙ্গুল গুলি হাঁসের আঙ্গুলের মত চামড়া দিয়া জোড়া বলিয়া ইহারা সহজেই জলে সাঁতার দিতে পারে। ব্যাঙের জিহ্বা নীচের চোয়ালের সম্মুখের দিকে আঁটা ও ভিতরে গোটানো। এজন্য লম্বা, আঠাল জিহ্বাটা বাহির করিয়া দূর হইতে পোকা মাকড় ধরিয়া আনিতে পারে।



১৪৪নং চিত্র—সোনা ব্যাঙ

ভিতরের গঠন ঃ ব্যাঙের ব্যবচ্ছেদ—ক্লোরোফর্মে তুলা ভিজাইয়া একটা কাচের পাত্রের মধ্যে ফেলিয়া দাও। একটা ব্যাঙ ইহার মধ্যে রাখিয়া পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দাও। নড়াচড়া বন্ধ হইয়া যাওয়ার পরও পনর মিনিট কাল ব্যাঙটাকে ঐ পাত্রেই রাখ। তাহার পর উহাকে বাহির করিয়া এক টুকরা তক্তার উপর চিৎ করিয়া রাখ এবং তাহার পা গুলি টানিয়া ধরিয়া পিন দিয়া আটকাও। হাল্কা ভাবে ছুরি চালাইয়া ঢিলা চামড়া তুলিয়া ফেলিলে মাংসপেশি দেখিতে পাইবে। ইহার মধ্যে একটি নীলাভ সরু সুতার মত জিনিস দেখা যাইবে। ইহা হইল পেটের সম্মুখ দিকের শিরা। ইহাকে সুতা দিয়া সিকি ইঞ্চি দূরে দুই স্থানে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ঐ দুই বাঁধনের মধ্যে শিরাটি কাটিয়া ফেল। তাহা হইলে ইহা

হইতে আর রক্ত বাহির হইবে না। পরবর্তী ব্যবচ্ছেদে এই শিরাটি আর কোথাও কাটিও না।



১৪৫নং চিত্র—ব্যাঙের ভিতরের গঠন

এখন দেহের মাংসপেশি গুলি কাঁচি দিয়া সাবধানে কাটিয়া তুলিয়া ফেল, যেন ভিতরের যন্ত্র গুলি অক্ষত থাকে। বক্ষের বেষ্টনীটি ধারাল কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেল যেন হৃৎপিণ্ডের কোন অনিষ্ট না হয়। এখন পাগুলি আরও

টান করিয়া আটকাও। এবার নীচের যন্ত্র গুলি ছাড়া হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস দেখিবার সুবিধা হইবে।

দেহের আভ্যন্তরিক গঠন মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের সাধারণ বিন্যাসের ন্যায়। দেহ-কঙ্কালের গঠনভঙ্গি মোটামুটি মনুষ্য-কঙ্কালেরই মত। মেরুদণ্ডটি কশেরুকা নামক ক্ষুদ্রাস্থি দ্বারা গঠিত। তবে উহাতে মানুষের মেরুদণ্ডের ন্যায় পাঁজরার হাড় নাই। ভিতরের যন্ত্র গুলি দেহের ভিতর একটি অবিচ্ছিন্ন গহ্বরের মধ্যে অবস্থিত। আরও উচ্চ স্তরের প্রাণীর বেলায় মধ্যচ্ছদা (Diaphragm) নামক একটি পুরু পর্দা হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসকে পাকস্থলী ও অন্ত্র প্রভৃতি হইতে পৃথক করিয়াছে। ব্যাঙের দেহ-গহ্বরে ঐ রূপ মধ্যচ্ছদা নাই।

শ্বাস-তন্ত্র—ব্যাঙের দেহে মধ্যচ্ছদা নাই বলিয়া ফুসফুসে বায়ু টানিয়া লইবার এক বিশেষ রকমের ব্যবস্থা রহিয়াছে। শ্বাস লইবার সময় ইহারা মুখ বন্ধ করিয়া গলার তলদেশ নামায়। ইহাতে মুখ-গহ্বরের আয়তন বাড়িয়া যায় বলিয়া বায়ু নাকের খোলা ছিদ্র দিয়া মুখ-গহ্বরে প্রবেশ করিয়া সেখানে জমা হয়। পরে নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া ঢোক গেলার মত করিলে মুখ-গহ্বর ছোট হয় এবং অতিরিক্ত চাপের ফলে মুখের ভিতরের বায়ু ফুসফুসে চলিয়া যায়। প্রশ্বাসের সময়ও ইহারা গলা ফোলায় এবং ফুসফুসের নিকটের মাংসপেশি দ্বারা ফুসফুসে চাপ দেয়। ফলে ফুসফুস হইতে বায়ু মুখ-গহ্বরে চলিয়া আসে এবং নাকের খোলা ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়। মুখের ভিতরে ও গলবিলে বহু রক্তবাহী নালী আছে; তাহাদের প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা। মুখে বায়ু লওয়াতে ঐ সকল নালীমধ্যস্থ রক্ত কিছু অক্সিজেন গ্রহণ করিতে পারে। ইহা ছাড়া ব্যাঙের পাতলা ত্বকের নীচে রক্ত-চলাচলের সময় ব্যাঙ বাহিরের বায়ু হইতে কিছু অক্সিজেন গ্রহণ করে।

হৃৎপিণ্ড—হৃৎপিণ্ডের আকৃতি অনেকটা শঙ্কুর (Cone) মত। ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড অন্যান্য উভচর প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের ন্যায় তিনটি কুঠরি বিশিষ্ট—দুইটি অলিন্দ ও একটি নিলয়। তোমরা পরে দেখিবে মানুষের হৃৎপিণ্ডে দুইটি অলিন্দ ও দুইটি নিলয় থাকায় ডান দিকের অলিন্দ দেহ হইতে সংগৃহীত দূষিত রক্ত ডান দিকের নিলয়ে পাঠায়, আর বাম দিকের অলিন্দ ফুসফুস হইতে আগত বিশুদ্ধ রক্ত বাম দিকের নিলয়ে পাঠাইয়া থাকে। নিলয়ের কাজ হইল রক্ত পাম্প করিয়া পাঠানো। ডান দিকের নিলয় দূষিত রক্ত শোধনের

জন্য ফুসফুসে পাঠায়, আর বাম দিকের নিলয় বিশুদ্ধ রক্ত সারা শরীরে বিতরণ করে। ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডে মাত্র একটি নিলয় থাকায় ইহার মধ্যে একটি অলিন্দ হইতে দূষিত রক্ত ও আর একটি অলিন্দ হইতে বিশুদ্ধ রক্ত, এই দুই প্রকারের রক্তই আসিয়া মিশ্রিত হয়। আবার এই মিশ্রিত রক্তের এক ভাগ নিলয় হইতে শোধনের জন্য ফুসফুসে পাঠান হয়। বাকী রক্ত নিলয় হইতে দেহের অন্যান্য স্থানে পরিচালিত হয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারিতেছ ব্যাঙের দেহে রক্ত-বিশোধন ক্রিয়া মানুষের দেহের বিশোধন ক্রিয়ার মত উন্নত নহে।

পরিপাক-তন্ত্র—পরিপাক তন্ত্রের যন্ত্রাদির গঠন ও বিন্যাস মূলত মনুষ্যদেহের মত। মুখে কোন লালাগ্রন্থি নাই, কাজেই এখানে খাদ্যের পরিপাক হইতে পারে না। প্রয়োজনও নাই, কারণ ব্যাঙ আস্ত গিলিয়া খায়। অন্যান্য যন্ত্রগুলির মধ্যে যকৃৎটি সবচেয়ে বড। ইহা তিনটি পিণ্ডে গঠিত, দেহ-গহ্বরের একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। যকৃতের বাম দিকের ছোট পিণ্ডটির নীচ দিয়া পাকস্থলীটি মোটা নলের মত বাহির হইয়াছে দেখা যায়। ইহার পিত্তকোষ, পাকানো অন্ত্র, মলনালী প্রভৃতির গঠন ও বিন্যাসে মনুষ্য দেহের সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে।

প্রশ্ন

১। একটি ছোট রুই মাছের দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া ইহার ভিতরের অংশগুলি দেখ এবং ছবি আঁকিয়া ঐ অংশ গুলির নাম লিখ।

২। মাছের শ্বাসকার্য বর্ণনা কর।

৩। একটি সোনা ব্যাঙের দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া ভিতরের অংশ গুলি দেখ এবং ছবি আঁকিয়া ঐ অংশ গুলির নাম নির্দেশ কর।

৪। ব্যাঙের শ্বাসকার্য কিরূপে সম্পন্ন হয়?

৫। ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের গঠন কিরূপ? ইহা দ্বারা কিরূপে রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়?

৬। ব্যাঙের গঠনের বৈশিষ্ট্য এবং উহার জীবনধারণের জন্য ঐ বৈশিষ্ট্যের উপযোগিতা বুঝাইয়া বল।

৭। মাছ ও ব্যাঙের শ্বাসগ্রহণ-প্রণালীর তুলনা কর।

৮। মাছ জলচর ও ব্যাঙ উভচর প্রাণী—এজন্য ইহাদের দেহের গঠনে যে সব পার্থক্য রহিয়াছে তাহার বিবরণ দাও।

১৪২ নং চিত্রের নীচের বর্ণনাগুলি না দেখিয়া চিহ্নিত অংশ গুলির নাম লিখ।

মানবদেহ /ঃ

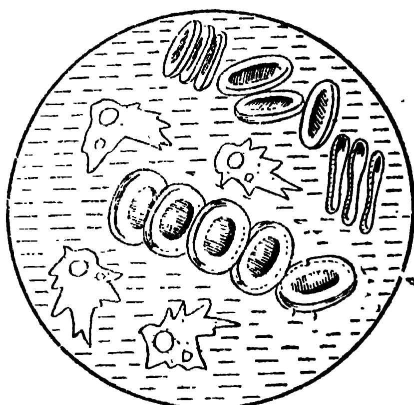
১

রক্তসঞ্চালন-তন্ত্র

রক্ত, হৃৎপিণ্ড এবং রক্তনালী, যেমন—ধমনি, শিরা ও রক্তজালক রক্ত-সঞ্চালন-তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

রক্ত—রক্তের উপাদান তিনটি—রক্তরস (Plasma), লোহিত কণিকা (Red Corpuscle) ও শ্বেত কণিকা (White Corpuscle)।

রক্তরস—রক্ত দেখিতে লালবর্ণ, কিন্তু মাইক্রোস্কোপ দ্বারা পরীক্ষা করিলে ইহার মধ্যে অসংখ্য লোহিত ও শ্বেত কণিকা দেখা যায়। ইহা ছাড়া রক্তের যে তরল ভাগ তাহাকে রক্তরস বলে। ইহা প্রধানত জল এবং ইহার রঙ খড়ের মত হরিদ্রাভ। পরিপাক-তন্ত্র দ্বারা খাদ্যদ্রব্য তরল হইয়া রক্তরসের সহিত মিশ্রিত হয়। রক্ত সেই খাদ্যরস জীবকোষের মধ্যে বিতরণের জন্য শরীরের সর্বত্র প্রবাহিত হয়। রক্তরসের মধ্যে এপর্যন্ত অন্তত পাঁচ রকম পদার্থ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের এক শ্রেণীর পদার্থ কোন কোন রোগের জীবাণু নষ্ট করিতে পারে। আর এক রকমের পদার্থের রক্তের মধ্যে জমাট বাঁধানোর ক্ষমতা রহিয়াছে। কোন স্থান সামান্য পরিমাণে কাটিয়া গেলে এই উপাদানের জন্যই রক্ত-পড়া আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যায়।



১৪৬নং চিত্র—লোহিত ও শ্বেত কণিকা—১৫০০ গুণ বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে

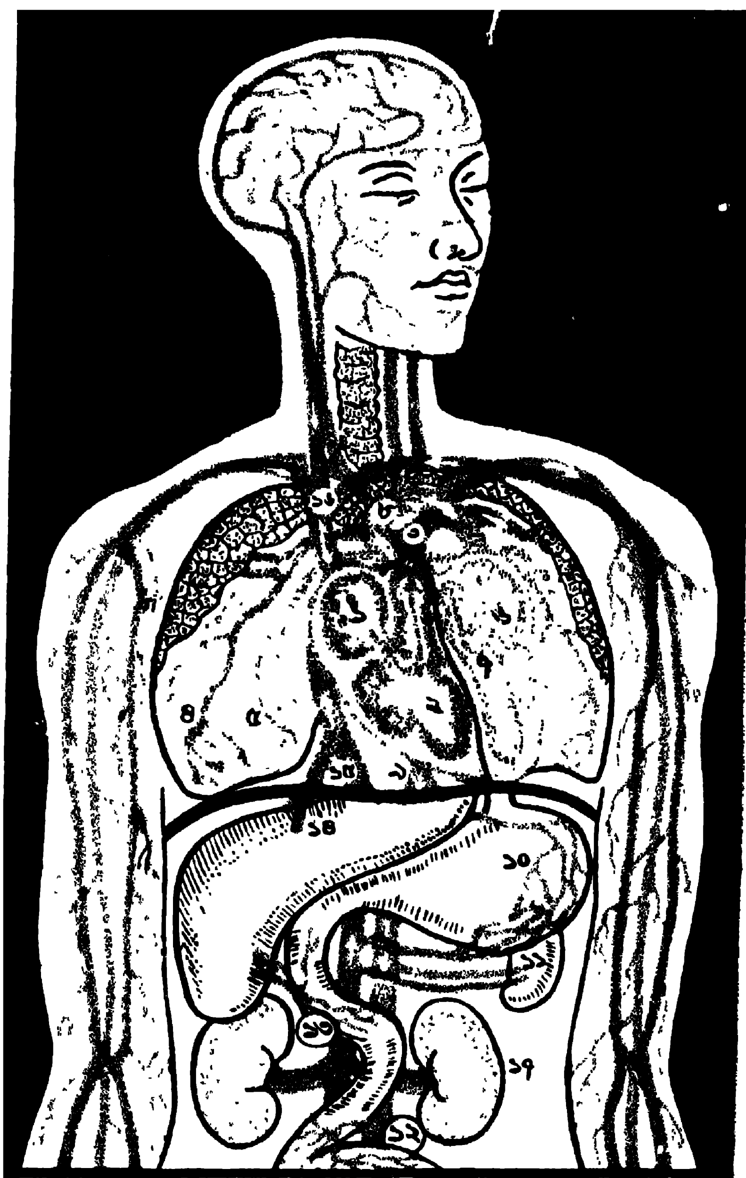
লোহিত কণিকা—রক্তের মধ্যে লোহিত কণিকার সংখ্যা খুব বেশি। এক ফোঁটা রক্তের মধ্যে প্রায় ৫০ লক্ষ লোহিত কণিকা রহিয়াছে। লোহিত কণিকা গুলি আকারে এত ক্ষুদ্র যে, উহাদের ৩৫০০টি পাশাপাশি সাজাইলে মাত্র এক ইঞ্চি হয়। ইহারা আকৃতিতে ' 'কৃতির

মত। ছবিতে লোহিত কণিকার চ্যাপ্টা দিক এবং কয়েকটির কিনারা দেখানো হইয়াছে। লোহিত কণিকাতে হিমগ্লোবিন নামক একটি পদার্থ আছে। ইহা বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হইলে উজ্জ্বল লাল হয়। ইহার জন্যই সমস্ত রক্তকে লাল দেখায়। লোহিত কণিকাগুলি ফুসফুসের বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া শরীরের সর্বত্র বহন করিয়া নিয়া যায়।

শ্বেত কণিকা—শ্বেত কণিকা গুলি সাধারণত আকারে লোহিত কণিকার চেয়ে বড়। সংখ্যায় ইহারা লোহিত কণিকার চেয়ে অনেক কম। রক্তের মধ্যে যত গুলি শ্বেত কণিকা আছে তাহার প্রায় ছয় শত গুণ লোহিত কণিকা রহিয়াছে। ছবিতে চারিটি শ্বেত কণিকা দেখানো হইয়াছে। কতক গুলি শ্বেত কণিকা শরীরের রক্ষিস্বরূপ কাজ করে। শরীরের ভিতর বাহিরের দুষ্ট জীবাণু প্রবেশ করিলেই শ্বেত কণিকা গুলি ইহাদিগকে আক্রমণ করে। যদি শ্বেত কণিকা গুলি জীবাণুদলকে পরাস্ত করিতে পারে, তাহা হইলে আর রোগের আক্রমণ হইতে পারে না।

হৃৎপিণ্ড (Heart)—মানুষের হৃৎপিণ্ড আকারে মোটামুটি তাহার বদ্ধমুষ্টির সমান। দুই পার্শ্বের ফুসফুসের সহিত রক্তনালীদ্বারা সংযুক্ত হইয়া ইহা মধ্যচ্ছদা (Diaphragm) নামক পেশির উপর বসানো থাকে। ১৪৭ নং ত্রিবর্ণ চিত্রে হৃৎপিণ্ডের আকৃতি ও অবস্থান লক্ষ্য কর। উপরের দিকে উহা স্থুল, নীচের দিকে স্থুলতা ক্রমশ কমিয়া আসিয়াছে। ইহা খুব দৃঢ় পেশিদ্বারা গঠিত একটি ফাঁপা যন্ত্র। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সর্বক্ষণ ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া শরীরের সর্বত্র রক্ত-চালনার জন্য ইহা পাম্পের ন্যায় কাজ করিতেছে। ইহার অভ্যন্তর লম্বালম্বি একটি পর্দা দ্বারা দক্ষিণে ও বামে দুইটি প্রধান অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশ আবার উপরে ও নীচে দুইটি কুঠরিতে বিভক্ত। উপরের কুঠরিটি ছোট, তাহার নাম **অলিন্দ** (Auricle)। নীচের কুঠরিটি অপেক্ষাকৃত বড়, তাহার নাম **নিলয়** (Ventricle)। অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যে পর্দার কপাট বা ভাল্‌ভ (Valve) রহিয়াছে। এই কপাট কেবল নীচের দিকেই খুলিতে পারে। ফলে উপরের কুঠরি হইতে নীচের কুঠরিতে রক্ত প্রবেশ করিতে পারে এবং বিপরীত দিকে রক্ত চলিতে পারে না। চিত্রে হৃদয়ের দুই দিকের চারিটি প্রকোষ্ঠ ১, ২, ৬ এবং ৭ সংখ্যা দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে।

রক্তনালী (Blood Vessels)—ধমনি, শিরা এবং রক্তজালক দিয়া রক্ত [illegible] হইয়া থাকে : এই জন্য ইহাদিগকে রক্তনালী বলে।



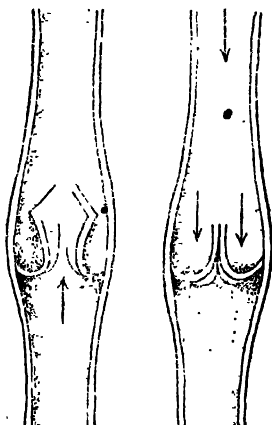
১৪৬নং চিত্র—মানবদেহে রক্তসঞ্চালন

লাল রেখা—বিশুদ্ধ রক্ত; নীল রেখা—দূষিত রক্ত

। দক্ষিণ অলিন্দ ২। দক্ষিণ নিলয় ৬। বাম অলিন্দ ৭। বাম নিলয়

ধমনি (Artery)—হৃদয়ের বাম দিকের নিম্ন প্রকোষ্ঠ হইতে একটি বৃহৎ রক্তনল বাহির হইয়াছে (চিত্রে ৮-চিহ্নিত)। ইহাকে এয়োর্টা বা মহাধমনি বলে। এই ধমনি হৃৎপিণ্ড হইতে বিশুদ্ধ রক্ত বহন করিয়া বহু শাখা-প্রশাখার সাহায্যে শরীরের সর্বত্র বিতরণ করিতেছে। চিত্রে ধমনি গুলি লাল বর্ণে নির্দেশ করা হইয়াছে।

শিরা (Veins)—ইহাদের দ্বারা সমস্ত শরীর হইতে অপরিষ্কার রক্ত সংগৃহীত হইয়া হৃদয়ের দক্ষিণ দিকে উপরের কক্ষে নীত হয়। চিত্রে ১৫-চিহ্নিত শিরাটি শরীরের নিম্ন অংশের এবং ১৬-চিহ্নিত শিরাটি শরীরের উপরের অংশের দূষিত রক্ত বহন করিয়া হৃৎপিণ্ডে আনিতেছে। শিরাগুলি চিত্রে নীল বর্ণদ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে।

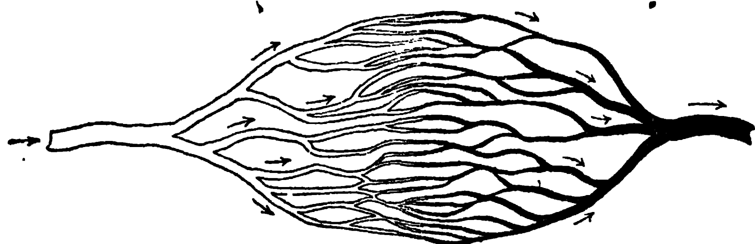


১৪৮নং চিত্র—শিরার মধ্যে ভাল্‌ভ

ধমনিতে রক্তের গতি হৃৎপিণ্ড হইতে শরীরের বিভিন্ন অংশের দিকে; শিরার মধ্যে রক্তের গতি হৃৎপিণ্ডের অভিমুখে। হৃৎপিণ্ড রক্ত পাম্প করিয়া ধমনিতে চালিত করে। শ্বাসক্রিয়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনার ফলে শিরার ভিতর দিয়া রক্ত হৃৎপিণ্ডের অভিমুখে ফিরিয়া আসে। শিরার ভিতর রক্ত যাহাতে একই দিকে ধাবিত হয়, যাহাতে উল্টা দিকে না যাইতে পারে, সেই জন্য ইহার মধ্যে কয়েক আঙ্গুল অন্তর অন্তর ভালভ্ থাকে। চিত্রে শিরার ভিতরের ছেদ দেখান হইল। বাম দিকের চিত্রে রক্ত উপরের দিকে হৃৎপিণ্ডের অভিমুখে যাওয়ার সময় শিরার মধ্যে কপাটের মত সংলগ্ন ভাল্‌ভ-গুলির মধ্যে ফাঁক হইয়া যায়। ডান দিকের ছবিতে দেখ, রক্ত উল্টা দিকে বহিবার চেষ্টা করিলে ভাল্‌ভ দুইটি রক্তে ভর্তি হইয়া পরস্পরের গায়ে লাগিয়া পড়ে। ফলে ঐ দিকে আর রক্ত চলিতে পারে না।

রক্তজালক (Capillaries)—হৃৎপিণ্ডের দিক হইতে ধমনি ও শিরাগুলি ক্রমশঃ বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ঐ শাখা-প্রশাখা গুলি সর্বশেষে মাকড়সার জালের মত দেহের সমস্ত অংশে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহাদিগকে রক্তজালক বলে। এই নাড়িগুলি যেমন সূক্ষ্ম তাহা ... ম্বর

আবরণ ততোধিক পাতলা। ইহাদের ভিতর দিয়া রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় রক্ত ও দেহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড



১৪৯নং চিত্র—ধমনি, শিরা এবং ধমনি ও শিরার রক্তজালকের সংযোগস্থল

প্রভৃতির আদান-প্রদান অতি সহজেই হইতে পারে। চিত্রে ধমনির রক্ত তাহার জালকের ভিতর দিয়া কি ভাবে শিরার জালকে প্রবেশ করে এবং শিরার জালক হইতে মিলিত হইয়া শিরাতে গিয়া পড়ে তাহা দেখানো হইয়াছে।

রক্তসঞ্চালন ঃ (১) ক্ষুদ্রতর সঞ্চালন-প্রণালী (Lesser Circulation)—১৪৭নং চিত্রে হৃৎপিণ্ডের সম্মুখের দিকটা কাটিয়া চারিটি প্রকোষ্ঠ দেখানো হইয়াছে। বিশুদ্ধ রক্তবহা ধমনি লাল বর্ণে ও দূষিত রক্তবহা শিরা নীল বর্ণে প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৫ ও ১৬-চিহ্নিত শিরা দুইটির সাহায্যে শরীরের নীচের ও উপরের দিক হইতে দূষিত রক্ত হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে প্রবেশ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রকোষ্ঠটি রক্তে ভর্তি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ইহার নীচের কপাটটি বন্ধ থাকে। দক্ষিণ অলিন্দ রক্তে ভর্তি হইলে ইহার গায়ের মাংসপেশি সঙ্কুচিত হয় এবং সেই সঙ্গে নীচের ভাল্‌ভ খুলিয়া যায়। ফলে রক্ত দক্ষিণ নিলয়ে প্রবেশ করে। নিলয়ে পূর্ণ মাত্রায় রক্ত প্রবেশ করিলেই তাহা তৎক্ষণাৎ সঙ্কুচিত হয়। এই সঙ্কোচনের ফলে রক্ত ৩-চিহ্নিত ধমনি পথে ফুসফুসের দিকে ধাবিত হয়। হৃৎপিণ্ডের ভিতর রক্তের প্রবাহ শরচিহ্নদ্বারা দেখানো হইয়াছে।

ফুসফুসের দুইদিকে ধমনির দুইটি বড় বড় শাখা গিয়াছে। ফুসফুস কাটিয়া তাহার ভিতর দেখানো হইল। অক্সিজেনবিহীন কাল্‌চে দূষিত রক্ত ধমনির শাখা-প্রশাখা এবং সর্বশেষে রক্তজালকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ফুসফুসের চারিদিকে বিস্তৃত হয় (চিত্রে ৪-চিহ্নিত স্থান)। জালকগুলি ফুস) ায়ুকোষের গায়ে জড়ানো থাকে। দূষিত রক্ত বায়ুকোষের দিকে

দেহে দহন-ক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প ও উত্তাপ ছাড়িয়া দেয় এবং লোহিত কণিকার সাহায্যে বায়ুকোষ হইতে অক্সিজেন টানিয়া নেয়। এই শোধন-ক্রিয়ার ফলে কৃষ্ণাভ রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ ধারণ করিয়া ৫-চিহ্নিত রক্তপথ দিয়া বাম অলিন্দে প্রবেশ করে (৬-চিহ্নিত স্থান দেখ)। বাম অলিন্দটি পূর্ণ হইলে রক্ত সেই প্রকোষ্ঠের সঙ্কোচনের ফলে নিলয়ে নামিয়া যায়।



১৫০নং চিত্র—ফুসফুসের বায়ুকোষের গুচ্ছ ও গায়ে জড়ানো রক্তজালক

হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ দিক হইতে দূষিত রক্তের ফুসফুসে প্রেরণ, সেখানে রক্তের শোধন এবং শোধিত রক্তের পুনরায় হৃৎপিণ্ডের বাম দিকে প্রত্যাবর্তন, রক্ত-সঞ্চালনের এই তিন অবস্থাকে নিয়া রক্তের **ক্ষুদ্রতর সঞ্চালন**।

(২) বৃহত্তর সঞ্চালন-প্রণালী (Greater Circulation)—বাম পাশের নিলয়টি সবচেয়ে শক্তিশালী প্রকোষ্ঠ। ফুসফুস হইতে আগত বিশুদ্ধ রক্তে পূর্ণ হইলেই এই প্রকোষ্ঠটি জোরে সঙ্কুচিত হয়। ফলে রক্ত এয়োর্টা নামক মহাধমনির দিকে চালিত হয় এবং সেই পথ দিয়া সমস্ত শরীরে সঞ্চালিত হয়। চিত্রে ৭-চিহ্নিত স্থান হইতে ৮-চিহ্নিত স্থান পর্যন্ত ইহা শরচিহ্নদ্বারা দেখানো হইয়াছে। এই মহাধমনিটি হৃৎপিণ্ডের পিছনে খিলানের মত বাঁকিয়া নীচে নামিয়াছে (৯-চিহ্নিত স্থান দেখ)। এই পথ দিয়া দেহকাণ্ড ও নিম্ন অঙ্গে রক্ত চালিত হয়। মহাধমনি হইতে বিভিন্ন শাখা মস্তক ও বাহুর দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। শরীরের সর্বত্র জালকের ভিতর দিয়া রক্ত চালিত হইবার পর ইহার অক্সিজেন ভাগ কমিয়া যায় এবং দেহ হইতে সংগৃহীত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও জলীয় বাষ্প মিশ্রণের ফলে ইহা দূষিত হয়। সেই দূষিত, কৃষ্ণাভ রক্ত আবার জালকদ্বারা সংগৃহীত হইয়া হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দের দিকে চালিত হয়। ফুসফুস ব্যতীত সমস্ত শরীরে যে রক্ত সঞ্চালন হয় তাহাকে রক্তের **বৃহত্তর সঞ্চালন** বলে।

নিম্নগামী মহাধমনি হইতে এক শাখা পাকস্থলীর দিকে (১০), আর এক শাখা প্লীহার দিকে গিয়াছে (১১)। প্রত্যেক ধমনির পাশে শিরা রহিয়াছে। ধমনির আর এক শাখা ক্ষুদ্রান্ত্রের দিকে গিয়াছে (১২)।

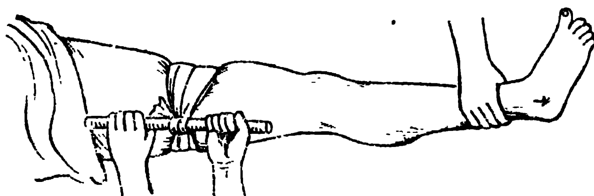
ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে যে সব শিরা বাহির হইয়াছে সেগুলি খাদ্যরস সংগ্রহ করিয়া থাকে। তাহারা একটি শিরাতে (১৩) মিলিত হইয়া যকৃতের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। যকৃত হইতে রক্ত আর একটি শিরার (১৪) সাহায্যে ঊর্ধ্বগামী বড় শিরাতে (১৫) পতিত হয় এবং সেখান হইতে হৃৎপিণ্ডে চলিয়া যায়। ধমনি এবং শিরার শাখা দুই দিকেই বৃক্ক বা কিডনির (১৭) সহিত সংযুক্ত।

নাড়ির স্পন্দন (Pulse Beat)—শরীরের মধ্যে রক্ত-সঞ্চালনের ক্রিয়া অবিরাম চলিতেছে। হৃৎপিণ্ডের উভয় দিকের কক্ষেই এক সঙ্গে কাজ চলিতে থাকে। ডান ও বাম দিকের অলিন্দ এক সঙ্গেই যথাক্রমে দেহ হইতে দূষিত রক্ত এবং ফুসফুস হইতে বিশুদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে; আর ডান ও বাম নিলয় একই সময়ে যথাক্রমে দূষিত রক্ত ফুসফুসে এবং বিশুদ্ধ রক্ত দেহের মধ্যে পাম্প করিয়া পাঠায়। হৃৎপিণ্ড এক মিনিটে প্রায় ৭০ বার রক্ত পাম্প করিয়া দেহের সর্বত্র পাঠাইতেছে। ধমনির প্রাচীর স্থিতিস্থাপক। কপালের পার্শ্বদেশে, ঘাড়ে, গোড়ালিতে, বাহুতে ও হাতের কব্জিতে ধমনি হাড়ের উপর দিয়া গিয়াছে। কাজেই সেই সব স্থানে দুই আঙুল দিয়া ধমনি চাপিয়া ধরিলে রক্তস্রোতের স্পন্দন অনুভব করা যায়। এই স্পন্দনের উৎস হইল প্রায় তিন ফুট দূরের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। রক্ত পাম্প করার ফলে হৃৎপিণ্ডে এক মিনিটে প্রায় ৭০ বার স্পন্দন হয়। সেজন্য শরীরের অন্যস্থানেও ধমনিতে স্পন্দন মিনিটে প্রায় ৭০ বার হইয়া থাকে। ইহাই নাড়ির স্পন্দন।

রক্তপাত বন্ধ করিবার উপায়—আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে অনেক সময় রক্তপাত হইয়া থাকে। আহত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া যদি রক্তস্রোত বন্ধ না করা যায় তবে বুঝিতে হইবে, কোনও প্রধান শিরা বা ধমনি ছিন্ন হইয়াছে। ধমনির রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ, থামিয়া থামিয়া পিচকারির ধারার মত বাহির হয়; আর শিরার রক্ত কৃষ্ণাভ লালবর্ণ, ধীরে ধীরে একটানা স্রোতের ন্যায় আসিতে থাকে। ধমনির রক্ত হৃদয় হইতে আসে; আর শিরার রক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে হৃদয়ে ফিরিয়া যায়। সুতরাং হাতের বা পায়ের ধমনি ছিন্ন হইলে আহত স্থানের উপরের দিকে (হৃৎপিণ্ডের দিকে) চাপ দিতে হয়; আর শিরা ছিন্ন হইলে আহত স্থানের নীচে (হৃৎপিণ্ড হইতে বিপরীত দিকে) চাপ প্রদান করিবে।

শিরার রক্ত সহজেই বন্ধ করা যায়। ধমনির রক্ত বন্ধ করিতে হইলে

কোথায় প্রধান ধমনি আছে জানা থাকিলে তাহার উপর আঙ্গুল দিয়া চাপিয়া ধরিতে হয়; জানা না থাকিলে আহত স্থান যদি হাতে বা



১৫১নং চিত্র—ধমনির রক্ত বন্ধ করিবার প্রণালী

পায়ে হয়, তাহা হইলে তাহার উপরে ব্যাণ্ডেজ আঁটিয়া সজোরে চাপ দিতে হয়। উরু বা বাহুর ধমনি ছিন্ন হইলে রক্ত বন্ধ করিবার এক বিশেষ প্রণালী চিত্রে দেখ। একজন পা উপরের দিকে তুলিয়া ধরিবে; আর একজন আহত স্থান হইতে উপরে একখানা রুমাল বা কাপড় বাঁধিয়া উহাতে এক খণ্ড কাঠির সাহায্যে অনবরত পাক দিবে। ইহাতে ধমনির উপর চাপ পড়িয়া রক্ত বন্ধ হইবে। এরূপ বন্ধন বেশি ক্ষণ রাখিলে রক্ত-চলাচল বন্ধ হইয়া বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে। এই জন্য চিকিৎসক না আসা পর্যন্ত অল্প সময়ের জন্যই এই বন্ধন রাখিতে হয়।

২

পরিপাক-তন্ত্র

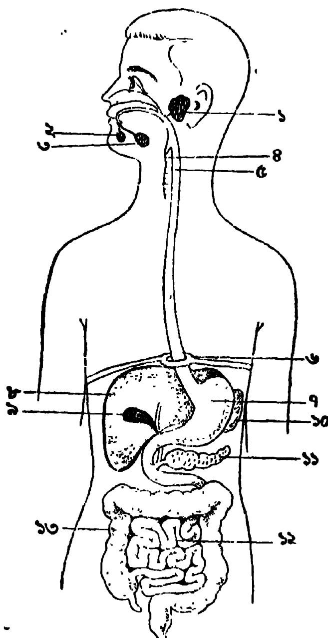
আমরা খাদ্যদ্রব্য যে অবস্থায় আহার করি, শরীরের জীবকোষগুলি সেই অবস্থায় উহা গ্রহণ করিতে পারে না। পরিপাক-তন্ত্রের সাহায্যে তাহার সরলতর পদার্থে পরিবর্তন আবশ্যক। এই পরিবর্তনকে খাদ্যের পরিপাক বলে। পরিপাক-তন্ত্র মুখ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পরিপাক-তন্ত্র প্রায় ২৮ ফুট লম্বা। ইহাতে প্রধানত ৫টি অংশ; যথা—(১) **মুখ**, (২) **অন্ননালী**, (৩) **পাকস্থলী**, (৪) **ক্ষুদ্রান্ত্র** ও (৫) **বৃহদন্ত্র**।

(১) মুখ—মুখের মধ্যে দাঁত, জিহ্বা ও লালাগ্রন্থি রহিয়াছে।

দাঁত—দাঁতের সাহায্যে আমরা খাদ্য চিবাইয়া অর্থাৎ কাটিয়া ছিন্ন ভিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া থাকি। খাদ্য ভাল করিয়া না চিবাইলে বড় বড় খাদ্যের টুকরা সহজে জীর্ণ হয় না।

জিহ্বা—খাদ্য চিবাইবার সময় জিহ্বা মুখের এক পাশ হইতে খাদ্য অন্য পাশে লইয়া যায় এবং চর্বিত খাদ্য ডেলার আকারে অন্ননালীর দিকে ঠেলিয়া দেয়। জিহ্বার সাহায্যে আমরা খাদ্যের আস্বাদ গ্রহণ করি। ইহার ফলেই পাকস্থলীতে পাচকরস নিঃসৃত হয়।

লালাগ্রন্থি—খাদ্য চিবাইবার সময় উহার সহিত যে লালা মিশ্রিত হয়, তাহার উৎপত্তি স্থান তিন জোড়া লালাগ্রন্থি। প্রথম জোড়া দুই কর্ণমূলের নীচে অবস্থিত। দ্বিতীয় জোড়া জিহ্বার নীচে এবং তৃতীয় জোড়া নিম্ন চোয়ালের গায়ে অবস্থিত। খাদ্য ভাল রূপে চিবাইলে উহার সহিত যথেষ্ট পরিমাণ লালা মিশিতে পারে। লালার মধ্যে টায়ালিন নামক এক প্রকার জীর্ণক বা এন্‌জাইম (Enzyme) রহিয়াছে। ইহার সাহায্যে অদ্রবণীয় শ্বেতসার খাদ্য রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে ক্রমশ দ্রবণীয় যব-শর্করায় (Maltose) পরিণত হয়। এক টুকরা রুটি বা এক মুঠা চিড়া যদি পাঁচ-ছয় মিনিট ধরিয়া চিবাইতে থাক তবে উহার মিষ্ট আস্বাদ হয়। ইহার কারণ জীর্ণকের সাহায্যে শ্বেতসার কতক পরিমাণে চিনিতে পরিবর্তিত হয়।



১৫২নং চিত্র—পরিপাক-তন্ত্র
১, ২ ৩। লালাগ্রন্থি ৪। শ্বাসনল ৫। অন্ননালী ৬। মধ্যচ্ছদা ৭। পাকস্থলী ৮। যকৃৎ ৯। পিত্তকোষ ১০। প্লীহা ১১। অগ্ন্যাশয় ১২। ক্ষুদ্রান্ত্র ১৩। বৃহদন্ত্র

পরিপাক-তন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন জীর্ণকের কাজ হয়।

(২) **অন্ননালী**—ইহা মুখ-গহ্বর ও শ্বাসনলের পিছন হইতে আরম্ভ হইয়া পাকস্থলীতে শেষ হইয়াছে। অন্ননালীটি লম্বায় নয় ইঞ্চি। খাদ্যকে শ্বাসনলের মুখ অতিক্রম করিয়া অন্ননালীতে প্রবেশ করিতে হয়। শ্বাসনলের মুখে একটি ঢাকনা থাকে। ব্যস্ততা সহকারে খাইলে বা খাওয়ার সময়

অসাবধান হইয়া কথা বলিলে খাদ্যের কণা শ্বাসপথে প্রবেশ করে। ইহাকে 'বিষম লাগা' বলে।

(৩) **পাকস্থলী** (Stomach)—অন্ননালিটি মধ্যচ্ছদা নামক পর্দার ভিতর দিয়া গিয়া পাকস্থলীর সঙ্গে মিশিয়াছে। পাকস্থলীটি একটি থলি বিশেষ। পরিপাক কার্যের জন্য বিভিন্ন খাদ্য পাকস্থলীতে অল্প সময় হইতে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত অবস্থান করে। খাদ্য পরিপাকের জন্য পাকস্থলীর গা হইতে পাচক রস (Gastric Juice) নামক এক প্রকার রস নির্গত হইয়া খাদ্যের সঙ্গে মিশিতে থাকে। মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে পাকস্থলীর ভিতরের দিক মৌচাকের মত ছিদ্রযুক্ত দেখায়; ঐ ছিদ্রগুলি অসংখ্য গ্রন্থির মুখ। এই গ্রন্থিগুলি হইতেই পাচক রস ক্ষরিত হয়। পাচক রসের প্রধান উপাদান পেপসিন (Pepsin) নামক জীর্ণক এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। এই অ্যাসিডের সাহায্যে পেপসিন খাদ্যের প্রোটিন বা আমিষ উপাদানকে সরলতর প্রোটিনে পরিবর্তিত করিয়া থাকে। খাদ্যের উপর পাকস্থলীর কাজ শেষ হইলে উহার নীচের দিকের মুখ খুলিয়া যায় এবং খাদ্য ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্রান্ত্রের দিকে নামিতে থাকে।

(৪) **ক্ষুদ্রান্ত্র** (Small Intestine)—ইহা প্রায় বিশ ফুট লম্বা কুণ্ডলী-পাকানো একটি নল বিশেষ। নাড়িভুঁড়ি বলিলে প্রধানত ইহাই বুঝায়। পাকস্থলীর পরেই ক্ষুদ্রান্ত্রের আট-দশ ইঞ্চি স্থান ইংরেজী U অক্ষরের মত বাঁকা; এই অংশের নাম গ্রহণী (Duodenum)। পাকস্থলীতে খাদ্য কাদার মত অবস্থায় পরিবর্তিত হইয়া গ্রহণী নলে নামিয়া আসিলে ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে আকুঞ্চন ও আলোড়ন আরম্ভ হয়। তখন যকৃৎ (Liver) হইতে পিত্তরস (Bile), আর অগ্ন্যাশয় (Pancreas) হইতে তিন প্রকারের জীর্ণক আসিয়া খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয় গ্রহণী নলের দুই দিকে অবস্থিত—দুইটি গ্রন্থি বিশেষ। শ্বেতসার ও আমিষ-খাদ্যের পরিপাক-ক্রিয়া যথাক্রমে মুখে ও পাকস্থলীতে আরম্ভ হয়, কিন্তু অগ্ন্যাশয়-রস ব্যতীত সেই ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইতে পারে না। পিত্তরস মাখনজাতীয় খাদ্যের পরিপাকে প্রাথমিক সাহায্য করে, কিন্তু অগ্ন্যাশয়-রসের সাহায্য ব্যতীত সেই ক্রিয়াও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। ইহা ছাড়া ক্ষুদ্রান্ত্র হইতেও এক প্রকার জীর্ণক নিঃসৃত হয়। এই রসদ্বারাই খাদ্যের অবশিষ্ট পরিপাক-ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতরের গাত্র মাইক্রোস্কোপ দ্বারা পরীক্ষা করিলে তাহাতে আঙ্গুলের মত অসংখ্য অংশ দেখা যায়। এই গুলিকে ভিলাই (Villi) বলে। খাদ্যরস যখন ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতরে আলোড়িত হইতে থাকে, তখন ঐ ভিলাই তাহা হইতে খাদ্যরস শোষণ করিয়া লয়। ভিলাই হইতে খাদ্যরস তাহার মধ্যস্থিত রক্ত-জালকের মধ্য দিয়া দেহের রক্তের সঙ্গে মিশিয়া যায়।



১৫৩নং চিত্র—ক্ষুদ্রান্ত্রের গায়ে ভিলাই

(৫) **বৃহদন্ত্র (Large Intestine)**—ইহা পাঁচ ফুট লম্বা এবং ক্ষুদ্রান্ত্র অপেক্ষা আকারে স্থূল। এই শেষোক্ত কারণে ইহার নাম বৃহদন্ত্র। উহা উদরের ডান দিকে নীচ হইতে আরম্ভ হইয়া উপরে উঠিয়াছে। সেস্থান হইতে উদরের বাম দিকে ঘুরিয়া নিম্নাভিমুখে মলদ্বারের সহিত মিলিত হইয়াছে। খাদ্যের যেসব অংশ হজম হয় না বা হজম ক্রিয়ার সময় যেসব দূষিত পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা বৃহদন্ত্রে গিয়া জমা হয়। বৃহদন্ত্র খাদ্যের জলীয় অংশ অনেক পরিমাণে শোষণ করিয়া থাকে। ইহার ফলে খাদ্যের অসার ভাগ অপেক্ষাকৃত কঠিন মলে পরিণত হইয়া মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়।

আমাদের খাদ্য

জীবনধারণ ব্যাপারে খাদ্য কি কি ভাবে সাহায্য করে তাহা এখন দেখা যাইবে।

(১) **শরীরের শক্তি উৎপাদন**—আমাদের মাংসপেশি সমূহ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া নানা কাজ করিতেছে। যখন আমরা ঘুমাই বা চুপ করিয়া বসিয়া থাকি তখনও ফুস ফুস এবং হৃৎপিণ্ড কাজ করিয়াই চলে। তোমরা জান কাজ করিবার জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। তাহা হইলে আমাদের মাংসপেশি গুলি কোথা হইতে সেই শক্তি পায়? আমাদের খাদ্যই সেই শক্তি জোগাইয়া থাকে। এখন প্রশ্ন হইল মাংসপেশি কি ভাবে খাদ্য হইতে শক্তি পাইয়া থাকে। কয়লা পুড়াইবার ফলে তাহার অন্তর্নিহিত

স্থৈতিক শক্তি (Potential Energy) তাপশক্তিতে পরিবর্তিত হয় এবং ঐ তাপশক্তিকে গতীয় শক্তিতে পরিবর্তিত করিয়া স্টীম এঞ্জিন চালানো হয়। কাঠ বা কয়লা হইতে তাপ উৎপাদন না করিয়া এঞ্জিন চালানো যায় না। সেইরূপ খাদ্য হইতে তাপশক্তি উৎপন্ন না করিলেও মাংসপেশি কাজ করিতে পারে না। পরিপাক-তন্ত্র খাদ্য দেহের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পরিবর্তিত করিলে তাহা রক্তের সঙ্গে মিশিয়া যায় এবং রক্ত ঐ খাদ্য দেহের সর্বত্র বিতরণ করে। প্রত্যেক কাজের জন্যই মাংসপেশিতে সঞ্চিত খাদ্যের কিছু না কিছু অংশ অক্সিজেনের সঙ্গে মৃদু দহনের ফলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জল এবং তাপের সৃষ্টি করে। এই তাপশক্তি হইতেই পেশির গতীয় শক্তি আসে। মাংসপেশি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল শরীরের প্রত্যেক কোষ সম্বন্ধেই তাহা খাটে। প্রত্যেক কোষকেই কিছু না কিছু নড়াচড়া করিতে হয় এবং সেজন্য প্রত্যেক কোষেরই কিছু না কিছু তাপের প্রয়োজন।

(২) **শরীরের ক্ষয়-পূরণ**—প্রত্যেক কোষের ভিতর অল্প বা বেশি মৃদু দহন হইয়া কিছু সামগ্রী পুড়িয়া যাইতেছে এবং উহার ওজন কমিয়া যাইতেছে। এই দহন যে কেবল গৃহীত খাদ্য নিয়াই হয় তাহা নহে। যখন গৃহীত খাদ্যের টান পড়ে তখন কাজ করিবার তাপ উৎপাদনের জন্য দেহের উপাদান নিয়াই দহন ক্রিয়া সাধিত হয়। জীবের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে প্রতিনিয়ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জল এবং উহার প্রস্রাবের সহিত জল ও দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়। একটি বিড়াল বা খরগোশকে ওজন করিয়া একটা খাঁচার মধ্যে কোন খাদ্য-পানীয় না দিয়া আট-দশ ঘণ্টা বন্ধ করিয়া রাখ। ঐ সময়ের পরে উহাকে ওজন করিয়া দেখিবে ওজন কমিয়া গিয়াছে। এই ক্ষয়-পূরণের জন্যও শরীরকে খাদ্য দিতে হয়।

(৩) **শরীরের বৃদ্ধিসাধন ও গঠন**—জন্মের সময় একটি শিশুর ওজন প্রায় চার সের এবং দৈর্ঘ্য এক হাত পরিমাণ থাকে। খাদ্যের সাহায্যেই তাহার শরীর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর বয়সের সময় যখন সে পূর্ণ মানবে পরিণত হয়, তখন তাহার ওজন দেড় মন এবং দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন হাত হইতে দেখা যায়।

শরীর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গঠন কার্যও চলিতে থাকে। জন্মের সময় একটি শিশুর মস্তক শরীরের তুলনায় বড় এবং হাত পা ছোট ছোট থাকে। উপযুক্ত খাদ্যের সাহায্যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীর এবং হাত পা গুলি

মস্তকের তুলনায় বড় হইয়া উঠিলে সে পরিণত বয়সের আকৃতি পাইয়া থাকে।

বিভিন্ন জাতীয় খাদ্য এবং তাহাদের প্রয়োজনীয়তা—আমরা যে সব খাদ্যগ্রহণ করিয়া থাকি তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ছয়টি উপাদানের কোন না কোন একটি বা অধিক বর্তমান আছে :—

(১) প্রোটিন (Proteins) বা আমিষজাতীয় উপাদান

(২) কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrates)—শ্বেতসার বা শর্করাজাতীয় উপাদান

(৩) স্নেহজাতীয় উপাদান (Fats)

(৪) লবণজাতীয় উপাদান (Salt)

(৫) জল (Water)

(৬) ভাইটামিন (Vitamins)

শরীরপোষণের জন্য খাদ্যে এই ছয়টি উপাদানই উপযুক্ত পরিমাণে থাকা আবশ্যক। একমাত্র দুগ্ধ ছাড়া এমন কোন খাদ্য নাই যাহাতে এই ছয় প্রকার উপাদানই আছে। এজন্য কেবল দুগ্ধ দ্বারাই কিছু কাল পর্যন্ত শিশুর শরীর পোষণ হইতে পারে। প্রত্যেক খাদ্যেই কোন না কোন একটি উপাদান অধিক পরিমাণে থাকে। উপাদানের আধিক্য হিসাবে খাদ্য সমূহকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। নিম্নে বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্যের উপযোগিতার কথাও বলা হইবে।

(১) প্রোটিনজাতীয় খাদ্য—মাছ, মাংস, ডিম, ছানা, ডাল প্রভৃতিতে প্রোটিন বা আমিষ উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে আছে বলিয়া ইহাদিগকে প্রোটিনজাতীয় খাদ্য বলে। বাদাম, পেস্তা প্রভৃতি তৈলপ্রধান ফল, আটা, যবের ছাতু, ঢেকিছাঁটা চাউল, আলু ও তরি-তরকারির মধ্যে অন্যান্য উপাদানের সহিত অল্পাধিক পরিমাণে প্রোটিন-উপাদান থাকে। প্রাণিজাত খাদ্যের মধ্যেই এই উপাদান বেশি থাকে। আর প্রাণিজাত প্রোটিন উদ্ভিদজাত প্রোটিন অপেক্ষা সহজে হজম হয়। গরুর দুধে শতকরা চারি ভাগ প্রোটিন-উপাদান আছে। এই তরল প্রোটিন-খাদ্যই জীবনের প্রথম অবস্থায় মানুষের একমাত্র অবলম্বন। **প্রোটিনজাতীয় খাদ্য দ্বারা শরীরের পেশি ও যন্ত্রাদির গঠন ও ক্ষয়পূরণ হইয়া থাকে।**

(২) **কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য**—চাউল, চিঁড়া, ময়দা, আটা, সুজি, সাগু, আলু, মানকচু, কাঁচকলা প্রভৃতিতে কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার নামক উপাদান যথেষ্ট আছে বলিয়া ইহারা কার্বোহাইড্রেটজাতীয় খাদ্য। গুড়, চিনি, মধু ও নানাবিধ মিষ্ট ফলের রসে শর্করাজাতীয় উপাদান বেশি আছে বলিয়া ইহারা কার্বোহাইড্রেটজাতীয় খাদ্যের অন্তর্গত।

কার্বোহাইড্রেটজাতীয় খাদ্যদ্বারা শরীরে তাপ ও শক্তির উৎপাদন হয়। স্নেহজাতীয় খাদ্যের ইহা অপেক্ষা অধিক তাপ-উৎপাদন করিবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু কার্বোহাইড্রেটজাতীয় খাদ্য শরীরের মধ্যে সহজে দগ্ধ হয় বলিয়া তাপ ও শক্তি উৎপাদনের জন্য অধিক উপযোগী।

(৩) **স্নেহজাতীয় খাদ্য**—মাখন, ঘৃত, চবি, মৎস্যের তৈল, নানা প্রকার উদ্ভিজ্জাত তৈল, নারিকেল, বাদাম, পেস্তা, আখরোট প্রভৃতি ফল স্নেহজাতীয় খাদ্যের অন্তর্গত। কার্বোহাইড্রেটজাতীয় খাদ্যের ন্যায় **ইহাদেরও কাজ শরীরে তাপ ও শক্তি-উৎপাদন করা।** তবে আমরা শরীরের তাপ ও কার্যকরী শক্তি কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য হইতেই বেশি পাইয়া থাকি। শীতপ্রধান দেশের লোকে দেহের উষ্ণতা রক্ষার জন্য অধিক পরিমাণে স্নেহজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। শরীররক্ষার জন্য এই দুই জাতীয় খাদ্যেরই আবশ্যকতা রহিয়াছে। স্নেহ জাতীয় খাদ্য অন্যান্য খাদ্য পরিপাকের বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে।

(৪) **লবণ**—আমরা তরকারির সহিত যে লবণ ব্যবহার করি তাহা ছাড়াও অন্যান্য খাদ্যের মধ্যে নানা জাতীয় লবণ আছে। তবে ইহাদের স্বাদ সাধারণ লবণের মত নহে। খাদ্যের অন্যান্য উপাদানের তুলনায় এই জাতীয় উপাদানের পরিমাণ এত কম যে ইহা দ্বারা সামান্য পরিমাণেও আমাদের উদর পুরণ হইতে পারে না, অথচ **শরীরের হাড়, রক্ত, রস প্রভৃতির গঠনের জন্য নানা প্রকার লবণের নিতান্ত প্রয়োজন।** দুধ, ডিম, ভাত প্রভৃতিতে **ক্যালসিয়াম-ঘটিত লবণ** রহিয়াছে। দাঁত ও হাড়ের গঠনের জন্য এই লবণ বিশেষ প্রয়োজনীয়। **ফসফরাস-ঘটিত লবণ** দুধ, ডিম, মাছ, মাংস ও ডাল হইতে পাওয়া যায়। হাড় ও মস্তিষ্কের গঠনের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন। **লৌহ-ঘটিত লবণ** রক্তের লোহিত কণিকার একটি প্রধান উপাদান। প্রাণীর যকৃৎ, মাংস, ডিম ও শাকসব্জিতে এই লবণ থাকে। **সোডিয়াম-ঘটিত**

লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড) আমরা খাদ্যের সহিত সর্বদা ব্যবহার করি। এই লবণ রক্তের জলীয় অংশের ও শরীরের অন্যান্য রসের একটি উপাদান।

(৫) **জল**—মানুষের শরীরে শতকরা ৬৪ ভাগ জল। মলমূত্র, ঘর্ম, নিঃশ্বাস প্রভৃতির সহিত শরীর হইতে প্রত্যহ প্রায় তিন সের পরিমিত জল বাহির হইতেছে। শরীররক্ষার জন্য বায়ুর পরেই জলের প্রয়োজন। **জলের সাহায্যেই আমাদের খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ হইয়া তরল হয় এবং রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া শরীরের সর্বত্র পরিচালিত হয়। জলের সাহায্যেই মলমূত্র ও ঘর্ম শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়।** প্রত্যহ অন্তত ছয় গ্লাস বিশুদ্ধ জল পান করা উচিত।

(৬) **ভাইটামিন**—খাদ্যের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পূর্বোক্ত উপাদানগুলি থাকিলেই যে শরীরের রীতিমত পুষ্টি হয় এবং তাহা সুস্থ ও কার্যক্ষম থাকে তাহা নহে। জীবনধারণের উপযোগী খাদ্যের মধ্যে আরও একটি উপাদান থাকা অত্যাবশ্যক। ইহার নাম ভাইটামিন। এই উপাদান কতকগুলি খাদ্যবস্তুর মধ্যে খুব সামান্য পরিমাণেই আছে, অথচ ইহার অভাব ঘটিলে নানা রোগের সৃষ্টি হয় এবং দেহের কর্মশক্তি বজায় থাকে না। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে **স্বাভাবিক পরিপাক ও কর্মশক্তি বজায় রাখিতে, শিশুদের দন্ত ও অস্থির সুগঠনের জন্য এবং নিরোগ জীবনযাপনের জন্য ভাইটামিন অত্যাবশ্যক।** এপর্যন্ত কতকগুলি ভাইটামিনের সম্বন্ধে জানা গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটির কথা বলা হইবে।

ভাইটামিন-এ—সবুজ তরিতরকারি, দুধ, মাখন, ডিম প্রভৃতিতে ইহা আছে। **খাদ্যে ইহা থাকিলে রাতকানা নামক চক্ষুরোগ ও সাধারণ সর্দির আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।**

ভাইটামিন-বি$_1$—ঢেঁকিছাটা চাউল, যাঁতাভাঙ্গা আটা, টাটকা শাকসব্জিতে ইহা আছে। **ইহার অভাবে বেরিবেরি নামক রোগ হইয়া থাকে।**

ভাইটামিন-বি$_2$—টাটকা শাকসব্জি, মাংস, যকৃৎ, ডিম, দুধ প্রভৃতিতে ইহা আছে। **ইহার অভাবে এক প্রকার মারাত্মক চর্মরোগ হইয়া থাকে।**

ভাইটামিন-সি—নানাজাতীয় নেবু, টমাটো ও সবুজ শাকসব্জিতে ইহা আছে। **ইহার অভাবে স্কার্ভি নামক রোগ হইয়া থাকে।**

ভাইটামিন-ডি—কডলিভার অয়েল, ডিমের কুসুম ও মাখনে ইহা আছে। ইহার অভাবে হাড়ের পুষ্টি হয় না। **ইহা শিশুদের রিকেট্স নামক হাড়ের রোগ নিবারণ করে।**

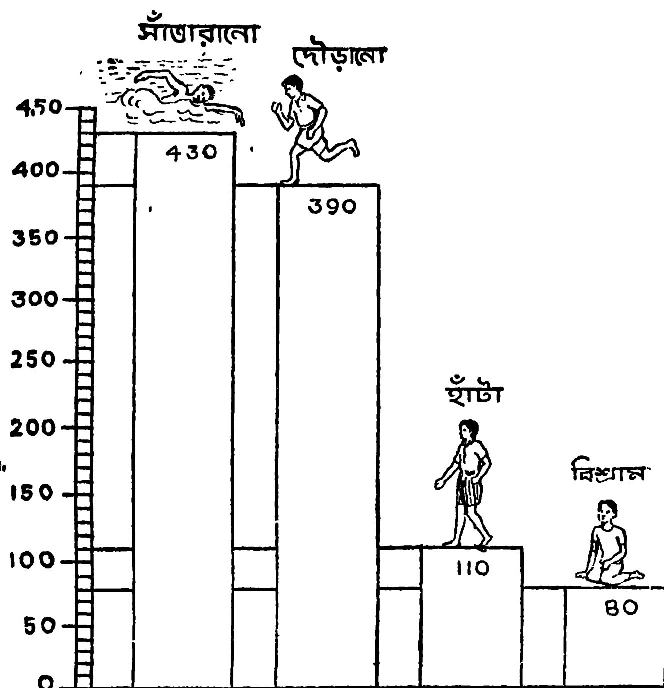
এসব ছাড়া আরও কয়েকটি ভাইটামিনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তোমরা জানিতে পারিয়াছ দুধ, মাংস, ডিম, টাটকা তরকারি প্রভৃতিতে এক বা অধিক প্রকারের ভাইটামিন আছে। খাবার জিনিস বেশি ক্ষণ রন্ধন করিলে উত্তাপে কোন কোন ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য প্রত্যহ কিছু কিছু খাবার জিনিস না রাঁধিয়া কাঁচা খাইলে ভাল হয়। আজকাল কাহারও ভাইটামিনের বিশেষ অভাব হইলে ইহার জন্য স্বভাবজাত খাদ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া সংশ্লেষণ (Synthesis) প্রণালীতে প্রস্তুত ভাইটামিনই বেশি ব্যবহার করা হয়।

আঁশযুক্ত পদার্থ (Roughage)—খাদ্যে পূর্বোক্ত উপাদানগুলি ছাড়া কিছু পরিমাণে আঁশযুক্ত পদার্থও থাকা দরকার। শাকপাতা, তরি-তরকারি এবং ফলের খোসা ও আঁশ প্রভৃতিতে খাদ্যগুণ বিশেষ নাই। ইহারা সহজে হজম হয় না, মলবৃদ্ধি করিয়া থাকে। আমাদের দৈনিক খাদ্যে কতক পরিমাণে এই জাতীয় খাদ্য থাকিলে কোষ্ঠ-কাঠিন্য হইতে পারে না।

খাদ্য হইতে উৎপন্ন তাপের মাপ—তোমরা জানিয়াছ খাদ্যের তাপশক্তি হইতে আমরা কর্মক্ষমতা লাভ করি। তাপের পরিমাণ ক্যালরিতে (Calorie) প্রকাশ করা হয়। তোমরা পূর্বে জানিয়াছ এক ক্যালরি তাপ এক গ্রাম জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়াইতে পারে। এই হিসাবে ক্যালরি খুব সামান্য পরিমাণের তাপ। সেজন্য খাদ্যবিজ্ঞানে তাপের যে মাপক ব্যবহার করা হয় তাহা হইল **বড় ক্যালরি (Big Calorie)**। যে পরিমাণ তাপ ১০০০ গ্রাম জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়াইতে পারে তাহাই হইল বড় ক্যালরি। তবে ইহাকে ক্যালরিই বলে। এখন দেখা যাইবে বিভিন্ন কাজ করিতে কি পরিমাণ ক্যালরির প্রয়োজন হয়।

১৫৪নং চিত্রে সাঁতারকাটা, দৌড়ানো, হাঁটা ও বিশ্রাম, এই চারি অবস্থায় প্রতি ঘণ্টায় একজন যুবকের কত ক্যালরির কাছাকাছি তাপশক্তির প্রয়োজন হয় দেখ। চিত্রের খাড়া দিকে প্রতি ঘণ্টায় প্রয়োজনীয় ক্যালোরি

দেখানো হইয়াছে। দিবারাত্রির ২৪ ঘণ্টায় কত ঘণ্টা বিশ্রাম, কত ঘণ্টা ছাটাহাঁটি ও কত ঘণ্টা পরিশ্রমের কাজ করিতে হয় ধরিয়া নিয়া একদিনে



১৫৪নং চিত্র—বিভিন্ন কাজে প্রতিঘণ্টায় ক্যালরির পরিমাণ

মোট কত ক্যালরির প্রয়োজন হয় হিসাব করিয়া বাহির করা যায়। সেই ক্যালরি খাদ্য হইতে আসিবে।

তোমরা পূর্বেই জানিয়াছ শরীরের গঠন, বৃদ্ধিসাধন, ক্ষয়পূরণ ও শক্তি-উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন উপাদানের খাদ্য আবশ্যক। সেই মিশ্র খাদ্যে বিবিধ উপাদানের মধ্যে দেহের প্রয়োজন অনুপাতে সমতা রক্ষা করিতে হইবে। এরূপ মিশ্র খাদ্যকে **সুষম খাদ্য** (Balanced Diet) বলে। বাঙ্গালী কিশোর ছাত্রদের জন্য দৈনিক সুষম খাদ্যের একটি তালিকা দেওয়া হইতেছে। কোন্ খাদ্য হইতে কত ক্যালরি তাপ পাওয়া যায় তাহাও পৃথক পৃথক ভাবে দেখানো হইয়াছে।

খাদ্য	পরিমাণ (গ্রাম)	১০০ গ্রাম হইতে ক্যালরি	(২)-এ প্রদত্ত খাদ্য হইতে ক্যালরি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
চাউল	২০০	৩৭৫	৭৫০
আটা	২০০	৩৭৫	৭৫০
ডাল	৭০	৩৫০	২৪৫
মাছ-মাংস-ডিম	১০০ (গড়ে)	১৩৩	১৩৩
তৈল-মাখন-ঘি	৬০ (গড়ে)	৭০০	৪২০
তরকারি	৩০০ (গড়ে)	১০০	৩০০
দুগ্ধ ও দধি	২৫০	৭০	১৭৫
ফল ও মিষ্টদ্রব্য	১২০	১০০	১২০
			২৮৯৩

দৈনিক তোমার মোটামুটি কত ক্যালরির প্রয়োজন তাহা আর একটি সহজ নিয়মে বাহির করা যায়। কিশোর ও যুবকদের প্রতি পাউণ্ড ওজনের জন্য দৈনিক প্রায় ২৫ ক্যালরির প্রয়োজন হয়। তোমার ওজন যদি ১১২ পাউণ্ড হয় তবে প্রতিদিন তোমার ১১২ × ২৫ বা ২৮০০ ক্যালরির প্রয়োজন হইবে।

প্রশ্ন

১। রক্তের বিভিন্ন উপাদান ও তাহাদের কার্য কি ?

২। চিত্রের সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের গঠন বর্ণনা কর।

৩। রক্তের ক্ষুদ্রতর ও বৃহত্তর সঞ্চালন-প্রণালী বলিলে কি বুঝায় ?

৪। ধমনি হইতে রক্তপাত বিপজ্জনক কেন এবং তাহা বন্ধ করিবার জন্য কি বিশেষ প্রতিবিধান করা যাইতে পারে ?

৫। পরিপাক-তন্ত্র বলিলে কি বুঝায় ? ইহার চিত্র আঁকিয়া বিভিন্ন অংশ দেখাও।

৬। পরিপাক ক্রিয়ার জন্য পরিপাক-তন্ত্রে কি কি জীর্ণকের সঞ্চার হয় ? ইহারা কিভাবে পরিপাক ক্রিয়া সম্পাদন করে ?

৭। খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলি কি ? উহারা কোন্ কোন্ খাদ্যে আছে এবং তাহাদের বিশেষ উপযোগিতা কি ?

৮। খাদ্যে বেশি পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট উপাদানের আবশ্যকতা কি?

৯। খাদ্যের ক্যালরি বলিলে কি বুঝায়? এক জন কিশোরের খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান হইতে কত ক্যালরি পাওয়া আবশ্যক?

১০। ভাইটামিন কয় প্রকার? কি কি পদার্থে বিভিন্ন রকমের ভাইটামিন আছে এবং তাহাদের উপকারিতা কি?

বিষয়গত প্রশ্ন

(নির্দেশ পূর্ববৎ)

১। ঠিক উক্তি নির্বাচন

(ক) রক্ত কি তাহার উপাদানসমূহ খাদ্য হইতে পায়? ——

(খ) বৃহত্তর গণ্ডির রক্ত-সঞ্চালন কি ফুসফুসের ভিতর দিয়া হইয়া থাকে? ——

(গ) বৃহদন্ত্র কি ক্ষুদ্রান্ত্র অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে বড়? ——

(ঘ) খাদ্য-বিজ্ঞানের ক্যালরি কি তাপ-বিদ্যার ক্যালরির চেয়ে বড়? ——

২। শূন্যস্থান পূরণ

খাদ্যের পরিপাক-ক্রিয়া——(১) আরম্ভ হয়। পাকস্থলীতে উহার ——(১)

উপর——(২) রস ক্রিয়া করে। ——(২)

ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে——(৩) রস ও ——(৩)

——(৪) রস পরিপাক-ক্রিয়া সম্পূর্ণ করে। ——(৪)

৩। কয়েকটি উত্তরের মধ্যে ঠিক উত্তর নির্বাচন

মানুষের খাদ্যে বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণ আবশ্যক। কারণ ——

(১) মিশ্রিত খাদ্য সহজে হজম হয়।

(২) বিভিন্ন উপাদান দেহের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইতে পারে।

(৩) বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণে বেশি শক্তি উৎপন্ন হয়।

(৪) মিশ্রিত খাদ্যে ভাইটামিন থাকার সম্ভাবনা বেশি।

বিজ্ঞান-বিচিত্রা

(দশম শ্রেণী)

শব্দ (Sound)

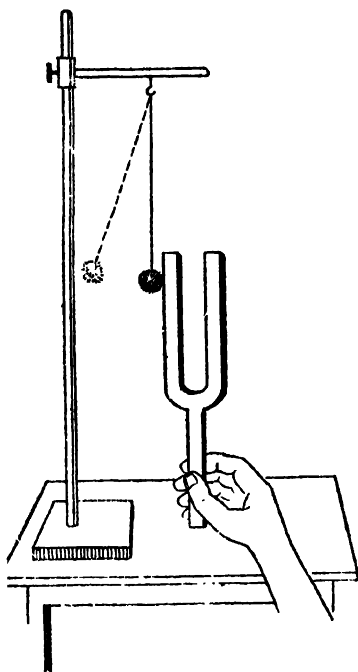
কম্পমান বস্তু শব্দের উৎস

তোমরা সর্বদাই কত রকমের শব্দ শুনিতে পাও। নিজেরা কথা বল, অন্যের কথা শোন। স্কুলের ঘণ্টা বাজিলে, উৎসবের বাড়িতে বাজনা বাজিলে, মন্দিরে কাঁসার-ঘণ্টা বাজিলে শুনিতে পাও। রেডিও এবং গ্রামোফোন হইতে গান শোনা আজকাল একটা সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃতিতেও শব্দের অন্ত নাই। ঝাউবনে বাতাস বহিলে সোঁ সোঁ আওয়াজ হয়। অনেক সময় বনে ফাটা বাঁশের ভিতর হাওয়া ঢুকিয়া বংশীধ্বনি করে। তোমাদের পরিবেশে জীবজন্তু, পাখী ও কীট-পতঙ্গের নানা রকমের শব্দ শুনিতে পাও। এত রকমের শব্দের কিরূপে উৎপত্তি হয় ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ?

কম্পমান বস্তুই শব্দের উৎস—হাত হইতে একটা কাঁসার বাটি পাকা মেঝেতে পড়িলে ঝন ঝন শব্দ হয়। তখন বাটির কানা ছুঁইলে ইহা কাঁপিতেছে অনুভব করা যায়। বাটিটি চাপিয়া ধরিলে কম্পন বন্ধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে শব্দও বন্ধ হইয়া যায়। এবার শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইবে।

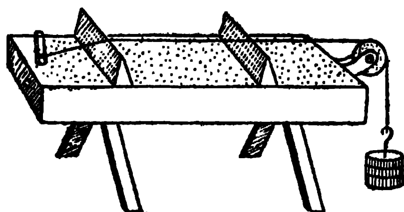
প্রথম পরীক্ষা : টিউনিং ফর্ক (Tuning Fork)—একটি টিউনিং ফর্ক বা সুর-শলাকা নিয়া পরীক্ষা কর। ইহা স্থিতিস্থাপক ইস্পাতের তৈয়ারি, আকৃতিতে U-র মত। ইহাকে ধরিবার একটি হাতল আছে। টেবিলের উপর এক টুকরা পিজবোর্ড বা পশমের মোটা টুকরা রাখিয়া হাতলে ধরিয়া টিউনিং ফর্কের যে কোন বাহু দ্বারা তাহার উপর ঘা দাও। এখন ফর্কটি কানেব কাছে আনিলে সুমিষ্ট মৃদু আওয়াজ শোনা যাইবে। হাতলের নীচ দিক টেবিলের উপর চাপিয়া ধরিলে ঐ শব্দের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইবে।

চিত্রে প্রদর্শিত উপায়ে সরু সুতা দিয়া একটি পিথ-বল ঝুলাও। ইহা সোলার মত হালকা, গাছের মজ্জা হইতে প্রস্তুত একটি ক্ষুদ্র বল। শব্দায়মান অবস্থায় টিউনিং ফর্কের যে-কোন একটি বাহু পিথ-বলের সংস্পর্শে আনিলে দেখা যাইবে যে বলটি দূরে ছিটকাইয়া যাইতেছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে টিউনিং ফর্কের বাহু কম্পমান অবস্থায় আছে। টিউনিং ফর্কের শব্দ বন্ধ হইয়া গেলে দেখিবে বলটি উহার সংস্পর্শে আসিলে আর সরিয়া যায় না। ইহা হইতে প্রমাণিত হইল **কম্পমান টিউনিং ফর্কই শব্দ সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে।**



১৫৫নং চিত্র—কম্পমান টিউনিং ফর্ক

দ্বিতীয় পরীক্ষা: সনোমিটার (Sonometer) বা স্বনমাপক যন্ত্র— একটি লম্বা, ফাঁপা, আয়তাকৃতি ও পায়া-লাগানো কাঠের বাক্সের উপর তার টানা দিয়া লাগাইয়া সনোমিটার তৈয়ারি করা হয়। বাক্সের উপরে এক কিনারায় আবদ্ধ এক ধাতুদণ্ডে পিতল বা স্টীলের তার বাঁধিয়া তারের অন্য প্রান্ত বাক্সের অন্য কিনারায় আটকানো একটি মসৃণ পুলির উপর দিয়া নেওয়া হয়। হুকের সাহায্যে ঐ প্রান্ত হইতে বিভিন্ন ওজন ঝুলাইয়া তারের উপর টান বাড়ানো কমানো যায়। টানা দেওয়া তারের নীচে দুইটি গোঁজের মত আকৃতির কাষ্ঠ-ফলক বসানো থাকে। ইহাদের মধ্যেকার দূরত্ব বাড়াইয়া বা কমাইয়া তারের কম্পমান অংশের দৈর্ঘ্য বাড়ানো বা কমানো যায়। এখন তারের



১৫৬নং চিত্র—সনোমিটার

মাঝখানে আঙ্গুল দিয়া তারটিকে টানিয়া ছাড়িয়া দিলে একটি শব্দের উৎপত্তি হইবে। ঐ শব্দ-সৃষ্টির কারণ হইল তারের কম্পন। তারের কম্পন বাক্সের ভিতরের বায়ুতেও কম্পনের সৃষ্টি করে বলিয়া উৎপন্ন শব্দের প্রাবল্য বাড়িয়া যায়। সনোমিটার হইতে যখন শব্দ বাহির হইতে থাকে তখন তারের গায়ে আঙ্গুল দিলেই বুঝিতে পারিবে তারটি কাঁপিতেছে।

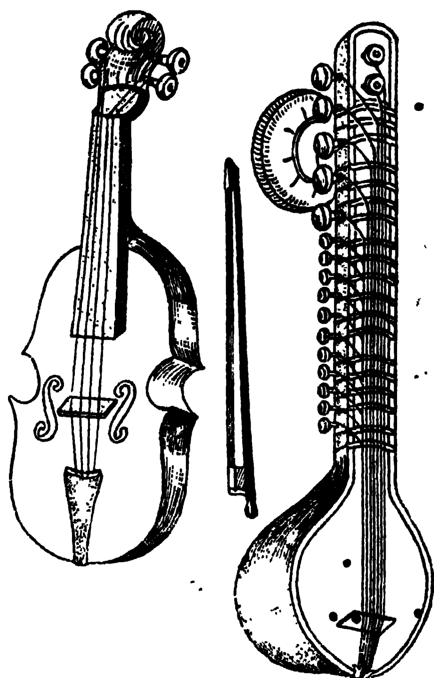
তারটি বাজাইলে যে স্বরের সৃষ্টি হয় তাহার স্বরূপ নির্ভর করে :

(১) যতটা তার বাজানো হয় তাহার দৈর্ঘ্যের উপর ;

(২) যতটা ওজন দিয়া তারটিকে টানা দেওয়া হয় তাহার পরিমাণের উপর ;

(৩) নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের তারের ভরের উপর।

হুকে একই ওজন রাখিয়া যদি কম্পমান তারের দৈর্ঘ্য কমানো যায় তবে সুর মিহি হইবে, আর দৈর্ঘ্য বাড়াইলে সুর মোটা হইবে। দৈর্ঘ্য ঠিক রাখিয়া যদি ওজন বাড়ানো যায় তবে সুর মিহি হইবে, আর ওজন কমাইলে সুর মোটা হইবে। আবার তারের দৈর্ঘ্য ও টানার ওজন ঠিক রাখিয়া যদি কম ভরের (সাধারণত সরু) তার লাগানো যায় তাহা হইলে সুর মিহি হইবে এবং বেশি ভরের তার লাগাইলে সুর মোটা হইবে।

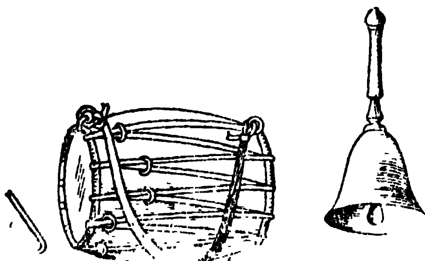


১৫৭ নং চিত্র—বেহালা ও সেতার

বাদ্যযন্ত্র—বাদ্যযন্ত্র সাধারণত তিন প্রকারের, যেমন :—(১) তারযন্ত্র, (২) সংঘাত যন্ত্র ও (৩) বায়ুযন্ত্র।

(১) তারযন্ত্র—ইহাদের মধ্যে সেতার, তানপুরা, একতারা প্রভৃতির তারে আঙ্গুল দিয়া টান দিয়া বাজাইতে হয়। বেহালা, এসরাজ ও সারঙ্গি তারের উপর

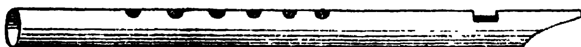
ছড় টানিয়া বাজাইতে হয়। আর তারের উপর ছোট হাতুড়ি দিয়া আঘাত করিয়া পিয়ানো বাজানো হয়।



১৫৮নং চিত্র—ঢোল ও কাঁসর ঘণ্টা

(২) সংঘাত যন্ত্র—কাঁসর ঘণ্টা, খোল, মৃদঙ্গ, ঢাক-ঢোল, ডুগি-তবলা ইত্যাদি যন্ত্রে আঘাত করিলে সুরের উৎপত্তি হয়। ঘণ্টার ধাতব পদার্থের কম্পনে এবং ঢাক-ঢোল প্রভৃতির চামড়ার পর্দার কম্পনে সুরের সৃষ্টি হয়।

(৩) বায়ু-যন্ত্র—এই জাতীয় যন্ত্রের মধ্যে বায়ুস্তম্ভকে ফুঁ দিয়া বা অন্য প্রকারে কম্পিত করিয়া সুরের সৃষ্টি করা হয়। বায়ুস্তম্ভের দৈর্ঘ্যের উপর



১৫৯নং চিত্র—বাঁশের বাঁশি

সুরের মাত্রা নির্ভর করে। ক্লারিওনেট, ফ্লুট, বাঁশি, প্রভৃতির গায়ে যে সব ফুটা থাকে তাহা বন্ধ করিয়া বা খুলিয়া বায়ুস্তম্ভের দৈর্ঘ্য কমানো বা বাড়ানো হয়। হার্মোনিয়াম ও অর্গান বায়ু-যন্ত্র।

ভোক্যাল কর্ড (Vocal chords) বা স্বরতন্ত্রী—কম্পমান বস্তুই যখন শব্দের উৎস তখন তোমরা স্বভাবতই ভাবিতে পার আমরা যে

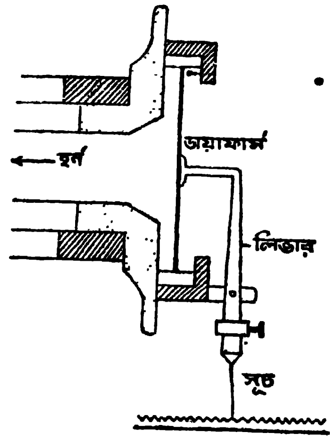


১৬০—ভোক্যাল কর্ড

শব্দ করি তাহা কি ভাবে, কাহার কম্পনে হইয়া থাকে। আমাদের

শ্বাসনালীর উপরে ল্যারিংক্স্ (Larynx) নামক যে অংশটি রহিয়াছে তাহা হইল বাগ্‌যন্ত্র। সেই খানে শ্বাসনালীর দুই পাশে ভোক্যাল কর্ড বা স্বরতন্ত্রী নামক দুইখানা পাতলা পর্দা রহিয়াছে। যখন আমরা কথা বলি না, কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ করিয়া যাই তখন ঐ পর্দা দুইটির মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক থাকে। যখন আমরা কথা বলি তখন পর্দা দুইটি সংলগ্ন পেশির টানে কাছে আসিয়া পড়ে এবং তাহাদের মধ্যের ফাঁক খুব কমিয়া যায়। তখন ফুসফুস হইতে জোরে বায়ু নির্গত হইয়া ঐ ফাঁক দিয়া বাহির হইবার সময় পর্দা দুইটি কাঁপাইয়া দেয়। ঐ পর্দার কম্পনের ফলে শব্দ উচ্চারিত হয়। মিহি সুরে গান করিবার সময় পর্দার ফাঁক আরও বেশি কমিয়া যায়। শিশু ও স্ত্রীলোকদের স্বরতন্ত্রী পুরুষদের চেয়ে খাটো বলিয়া তাহাদের স্বর মিহি।

সাউণ্ড-বক্স (Sound-Box)—একটি গ্রামোফোনের সাউণ্ড-বক্স ভাল রূপে দেখ। ইহা আকৃতিতে কিনারার দিক দিয়া গোল, কিন্তু পাশাপাশি ভাবে চ্যাপ্টা অর্থাৎ বাহিরের দিকে ইহা একটি চ্যাপ্টা গোলকের মত। ইহার ভিতরে একটি গোলাকার ও খুব পাতলা স্টীলের বা অভ্রের ডায়াফ্রাম বা চাকতি থাকে। উহার কেন্দ্রে একটি লিভারের এক প্রান্ত আটকানো থাকে। লিভারের অপর বাহুটির নীচের প্রান্তে পিন পরাইয়া রেকর্ড বাজানো হয়।



১৬১নং চিত্র—সাউণ্ড-বক্স

তোমরা জান গ্রামোফোনের একটি হাতল ঘুরাইয়া ভিতরের স্প্রিংয়ে চাবি দেওয়া হয়। তাহার পর ঐ স্প্রিং আস্তে আস্তে খুলিয়া রেকর্ডটি ঘুরায়। রেকর্ডে বাহিরের দিক হইতে ভিতরের দিকে পেঁচানো, খুব সূক্ষ্ম দাগ কাটা থাকে। ঐ দাগের ভিতরের গর্ত সর্বত্র সমান নহে, ঢেউয়ের মত উঁচুনীচু। রেকর্ডের দাগের উপর মানুষের কথা বা গানের ছাপ থাকে। তোমরা পূর্বেই জানিয়াছ ভোক্যাল কর্ডের কম্পনে শব্দের উৎপত্তি হয়। সেই কম্পন বায়ুর ভিতর দিয়া ঢেউয়ের আকারে চলিয়া (এ বিষয় পরে জানিতে পারিবে) রেকর্ড প্রস্তুতির সময় একটি ঘূর্ণায়মান পাতের উপর উঁচুনীচু দাগ

কাটে। এই পাত হইতে যে-রেকর্ড প্রস্তুত হয় তাহার উপর অনুরূপ উঁচুনীচু ছাপ পড়ে।

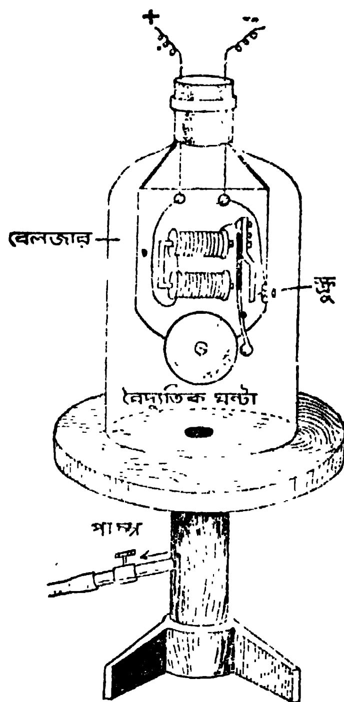
সাউণ্ড-বক্সের পিনটি ঘূর্ণায়মান রেকর্ডের উপর চাপাইয়া দিলে রেকর্ডের দাগের ভিতরের উঁচুনিচু ছাপের জন্য পিনটি উপর নীচ করিয়া কাঁপিতে থাকে। এই কম্পন লিভারের সাহায্যে ডায়াফ্রাম বা চাকতিতে অনুরূপ কম্পনের সৃষ্টি করে। এই কম্পন হইতেই হর্নের সাহায্যে বর্ধিত আকারে যে বিষয়টি রেকর্ডে তোলা হইয়াছিল তাহার শব্দের পুনরাবৃত্তি হয়।

শব্দ-বিস্তারের জন্য জড় মাধ্যমের প্রয়োজন

শব্দ-অনুভূতির জন্য প্রথমে প্রয়োজন একটি কম্পমান বস্তুর। ইহা হইতে শব্দের সৃষ্টি হয়। আর ঐ শব্দ শুনিবার জন্য প্রয়োজন কর্ণের। কর্ণ হাত দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিলে শব্দ হইতে থাকিলেও তাহা প্রায় শোনাই যাইবে না। এখন বিবেচ্য, কম্পমান বস্তু হইতে কর্ণে শব্দ আসিয়া কি ভাবে পৌঁছে। তোমরা জান আলোক ও তাপরশ্মি কোন জড় মাধ্যমের সাহায্য ছাড়াই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিতে পারে। শব্দ-বিস্তারের জন্য জড় মাধ্যমের প্রয়োজন আছে কিনা এখন পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইবে।

পরীক্ষা : বায়ুর ভিতর দিয়া শব্দবিস্তার—একটি বায়ু-নিষ্কাশক পাম্পের ছিদ্রযুক্ত আসনের উপর একটি বেলজার (Bell-jar) বায়ুরুদ্ধ ভাবে বসাইতে হইবে। বেলজার হইল বেল বা ঘণ্টার আকৃতির, নীচ দিকে খোলা কাচের পাত্রবিশেষ। বেলজারের মুখে রবারের ছিপি লাগাইয়া মোটা তারের সাহায্যে একটি ছোট বৈদ্যুতিক ঘণ্টা (Electric Bell) বেলজারের মধ্যে আটকাইয়া রাখা হয়। বৈদ্যুতিক ঘণ্টার গঠন ও কার্যপ্রণালী তোমরা পরে জানিতে পারিবে। বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজাইবার জন্য তাহার সহিত বাহিরের বৈদ্যুতিক সেলের, যেমন ড্রাই সেলের (Dry cell) যোগ করিয়া দিতে হইবে। বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরিচালিত হইলে বৈদ্যুতিক ঘণ্টাটি বাজিবে। এবার পাম্পের সাহায্যে বেলজারের ভিতরের বায়ু নিষ্কাশন করিতে আরম্ভ করিলে ঘণ্টার শব্দ ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে

থাকিবে। যখন বেলজারটি প্রায় বায়ুশূন্য হইবে তখন ঘণ্টার শব্দ আর প্রায় শোনাই যাইবে না; কিন্তু তখনও ঘণ্টার হাতুড়ি ঘণ্টার বাটির উপর আঘাত করিতেছে ইহা কাচের ভিতর দিয়া দেখা যাইবে। বেলজারে বায়ু প্রবেশ করিতে দিলে ঘণ্টার শব্দ পূর্বের ন্যায় শোনা যাইবে। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে বায়ুর ভিতর দিয়া শব্দ চলিতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে



১৬২নং চিত্র— বায়ুশূন্য স্থানের ভিতর দিয়া শব্দ চলিতে পারে না

১৬৩নং চিত্র—জলের ভিতর দিয়া শব্দ চলিতে পারে

অন্যান্য গ্যাসের ভিতর দিয়াও শব্দ চলিতে পারে। **শব্দ গ্যাসীয় পদার্থের ভিতর দিয়া চলিতে পারে। শূন্যস্থান দিয়া চলিতে পারে না।**

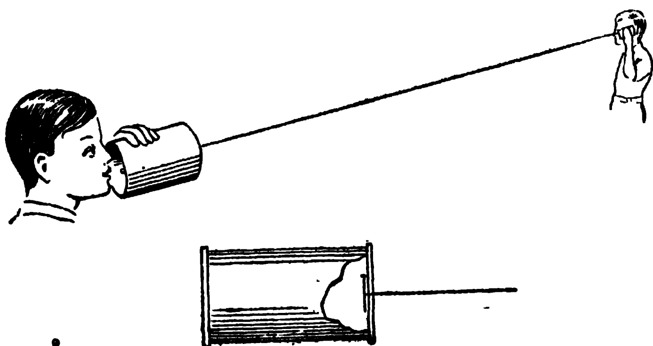
পরীক্ষাঃ তরল পদার্থের ভিতর দিয়া শব্দ-বিস্তার—(১) একটি পকেট ঘড়ি কান হইতে একটু দূরে রাখ, যেখানে ইহার টিক্ টিক্ শব্দ খুব সামান্যই শোনা যায়। তাহার পর একটি জলভর্তি রবারের বেলুন কানের উপর চাপিয়া ধরিয়া ঘড়িটি জলভরা বেলুনের অপর দিকে চাপিয়া ধর। এবার টিক্‌টিক্ শব্দ আর একটু জোরে শোনা

যাইবে। ইহা হইতে বুঝা গেল বায়ুর চেয়ে জলের ভিতর দিয়া শব্দ আর একটু ভাল রূপেই চলিতে পারে।

(২) পুকুরের জলে তোমরা দুইজন কিছু দূরে ডুব দিয়া থাকিয়া এক জন যদি বাম হাতের তালুর উপর ডান হাত দিয়া কিল মারিতে থাক তবে ইহার শব্দ অপর জন বেশ ভাল রূপে শুনিতে পাইবে। অন্যান্য তরল পদার্থ নিয়া পরীক্ষা করিয়াও দেখা গিয়াছে শব্দ তাহাদের মধ্য দিয়া চলিতে পারে। কাজেই বুঝা গেল **শব্দ তরল পদার্থের ভিতর দিয়া চলিতে পারে।**

পরীক্ষাঃ কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়া শব্দ-বিস্তার—(১) একটি রুলারের এক কোনা কানের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া রুলারের অপর প্রান্তে আস্তে আস্তে আঁচড় বা টোকা দাও। তুমি আঁচড় বা টোকার শব্দ বেশ ভাল রূপেই শুনিতে পাইবে। এবার রুলারের কোনা তোমার কান হইতে সরাইয়া পূর্বের ন্যায় অপর প্রান্তে আঁচড় বা টোকা দাও। আঁচড়ের শব্দ শোনাই যাইবে না, টোকার শব্দ সামান্য শুনিতে পার। ইহা হইতে বুঝা যায় বায়ুর চেয়ে কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়া শব্দ আরও ভাল রূপে চলিতে পারে।

(২) তোমরা সূতার টেলিফোন দিয়া বেশ কিছু দূর পর্যন্ত কথা বলিতে পার। দুইটি টিনের বা পিজবোর্ডের কৌটা নিয়া তাহাদের তলায় একটি



১৬৪নং চিত্র—সূতার টেলিফোন

করিয়া ছিদ্র কর। ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়া ৫০ হইতে ১০০ ফুট লম্বা সূতা গলাইয়া দিয়া সূতার এক এক কিনারায় একটি করিয়া সরু পেরেক বাঁধিয়া দাও (ইহা চিত্রের নীচ অংশে দেখান হইয়াছে)। এখন তোমরা দুই জন দুই কৌটা নিয়া দূরে গিয়া সূতাটি বেশ টান করিয়া ধর। এক জন এক কৌটাতে মুখ

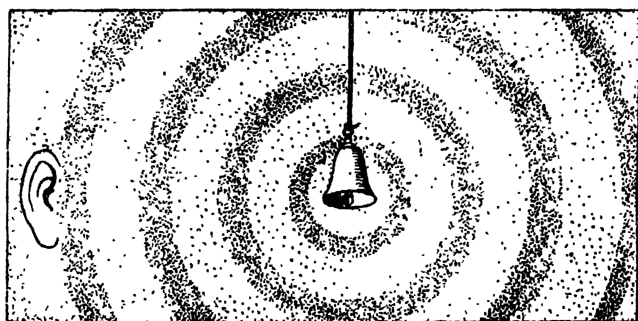
দিয়া কথা বলিলে অপর জন কৌটা কানে লাগাইয়া কথা বেশ স্পষ্ট রূপেই শুনিতে পাইবে। এই পরীক্ষা হইতে বুঝা যাইতেছে **শব্দ কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়া চলিতে পারে।**

রেল লাইনের রেলের উপর নীচু হইয়া কান পাতিয়া রাখিলে বহু দূর হইতেই ট্রেন আসার শব্দ শোনা যায়, অথচ তখন পর্যন্ত বায়ুর ভিতর দিয়া ট্রেনের শব্দ শোনা যায় না।

পূর্বের পরীক্ষা গুলি হইতে দেখা যায় **কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় তিন রকমের পদার্থের মধ্য দিয়াই শব্দের বিস্তার হইয়া থাকে।**

বায়ুতে শব্দ-তরঙ্গ—একটি ঢিল উপরের দিকে তুলিয়া পুকুরের স্থির জলে ফেলিয়া দিলে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং ঐ তরঙ্গ চক্রাকারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ঢিলের ঘায়ে এক স্থানের জল আলোড়িত হয় এবং আলোড়িত জলের কম্পন ঢেউ তুলিয়া চারিদিকে বিস্তৃত হয়। বায়ুর মধ্যেও সেই রূপ কোন স্থানে আলোড়নের সৃষ্টি করিলে তাহার কম্পন ঢেউয়ের আকারে চারি দিকে বিস্তৃত হইবে এরূপ মনে করা যাইতে পারে।

ছবিতে দেখ একটি ঘণ্টা বাজার ফলে বায়ুতে কিরূপ তরঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে। ঘণ্টাটি কাঁপিতেছে অর্থাৎ ইহার যে কোন অংশ অতি দ্রুত বাহিরের



১৬৫নং চিত্র—বায়ুতে শব্দ-তরঙ্গের বিস্তার

দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং পর মুহূর্তেই পিছাইতেছে। মনে কর ঘণ্টার একটি অংশ অগ্রসর হইয়া সম্মুখের বায়ুস্তরকে ঠেলিয়া দিল। বায়ুস্তর চাপ পাইয়া সঙ্কুচিত হইবে। বায়ুর স্থিতিস্থাপকতা গুণের জন্য এই সঙ্কুচিত স্তর বিস্তৃত হইতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু সঙ্কুচিত স্তরের পিছনে ঘণ্টা বাধা থাকায় উহা পিছন দিকে বিস্তৃত হইতে পারিবে না। সঙ্কুচিত স্তরটি সম্মুখ দিকে বিস্তৃত হইতে

গিয়া তাহার সম্মুখের স্তরকে ঠেলিয়া সঙ্কুচিত করিবে। এই ভাবে একটা ঘন স্তর সৃষ্টির পর মুহূর্তেই ঘণ্টার ঐ স্থানটি পিছনে যাইবে। ফলে সংলগ্ন বায়ুস্তরে চাপ কমিয়া যাইবে এবং ইহা প্রসারিত হইয়া পিছন দিকে সরিয়া যাইবে। এভাবে একটি প্রসারিত স্তরের সৃষ্টি হইবে। ঘণ্টার ঐ অংশটি আবার সম্মুখের দিকে আসিলে সঙ্কুচিত স্তরের সৃষ্টি হইবে এবং তাহার পরেই আসিবে প্রসারিত স্তর। এভাবে পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত স্তরের সৃষ্টি করিয়া শব্দ-তরঙ্গ যে প্রবাহিত হয় তাহা চিত্রে দেখানো হইয়াছে। এই তরঙ্গ আসিয়া কানের পর্দায় লাগিলে পর্দা কাঁপিয়া উঠিবে। ইহা হইতে কি ভাবে শব্দের অনুভূতি হয় পরে জানিবে।

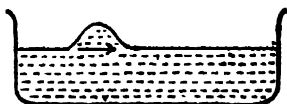
সব কম্পনজাত শব্দ শোনা যায় না—কম্পমান বস্তু হইতে শব্দের উৎপত্তি হয় জান। একটি বস্তু যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ে অপর একটি বস্তু হইতে বেশি বার কম্পিত হয় তবে প্রথম বস্তুটি হইতে উদ্ভূত স্বর দ্বিতীয় বস্তু হইতে উদ্ভূত স্বরের চেয়ে মিহি হয়। খুব বেশি মাত্রায় মিহি বা মোটা স্বর আমাদের কর্ণে অনুভূতি জাগাইতে পারে না। নীচ দিকে আটকানো একটি ধাতুর লম্বা শলাকায় ঘা দিলে উহা কাঁপিবে বটে, কিন্তু তাহার ফলে যে-শব্দ উৎপন্ন হইবে তাহা আমরা শুনিতে পাই না। যে-শব্দের কম্পন প্রতি সেকেণ্ডে ১৬ বারের কম অথবা ২০,০০০ বারের বেশি তাহা আমরা শুনিতে পাই না। কুকুর ও বিড়াল মানুষের তুলনায় আরও উচ্চ কম্পন-মাত্রার শব্দ শুনিতে পারে।

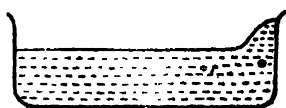
শব্দ-তরঙ্গের রূপ—শব্দমাত্রই কম্পন হইতে উদ্ভূত হয়। আর তাহা প্রবাহিত হয় তরঙ্গের আকারে। এই দুই কারণেই বুঝা যাইতেছে শব্দের উৎপত্তি ও বিস্তারের মূলে রহিয়াছে গতীয় শক্তি। শব্দের গতীয় শক্তি টেলিফোনের প্রেরক-যন্ত্রের পর্দা কাঁপাইয়া থাকে, আর প্রচণ্ড গতীয় শক্তিসম্পন্ন বজ্রের শব্দে জানালার ঢিলা কাচ হইতে কম্পনের শব্দ শোনা যায়। **তাপ ও আলোকের মত শব্দও শক্তি।**

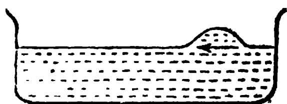
শব্দের বেগ—তোমরা পূর্বেই জানিয়াছ আমাদের দেশের সাধারণ উষ্ণতায় বায়ুতে শব্দের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১১২৬ ফুট। জলে শব্দের বেগ ইহার প্রায় সাড়ে চার গুণ। কঠিন পদার্থে শব্দের বেগ আরও বেশি।

সর মধ্যে শব্দের বেগ খুব বেশি, বায়ুর চেয়ে চৌদ্দ গুণ। বায়ুতে শব্দের বেগ মোটামুটি এক মাইলের পাঁচ ভাগের এক ভাগ ধরিয়া নিয়া মেঘের বিদ্যুৎ-স্ফুরণ দেখিয়া তাহার দূরত্ব বাহির করা যায়। আলোকের বেগ সেকেণ্ডে ১,৮৬,৩২৬ মাইল। মেঘ হইতে শব্দ আসিতে যে সময় লাগে সেই তুলনায় আলোক আসিতে প্রায় কোন সময়ই লাগে না। সেজন্য একটি মেঘে বিদ্যুৎ-স্ফুরণ দেখিবার ৮ সেকেণ্ড পরে যদি বজ্রের শব্দ শোনা যায় তবে ঐ মেঘের দূরত্ব হইবে $\frac{8}{5}$ বা ১.৬ মাইল।

প্রতিধ্বনি (Echoes)—তোমরা জানিয়াছ তাপ ও আলোক তরঙ্গের আকারে প্রসারিত হয়। শব্দের গতিও তরঙ্গের আকারে। সেজন্য তাপ ও আলোকের মত শব্দও প্রতিফলিত হয়। তরঙ্গমাত্রই যে প্রতিফলিত হয় তাহা বুঝিবার সহজ উপায় হইল জলের উপর তরঙ্গ বা ঢেউয়ের প্রতিফলন দেখা। জলভরা একটা লম্বা গামলার এক কিনারায় একটি ঢেউয়ের সৃষ্টি করিলে তাহা গামলার অপর প্রান্তে গিয়া পাত্রের গায়ে উঁচু হইয়া উঠিবে। ঐ ঢেউ পাত্রের গা ঠেলিয়া একই দিকে আর যাইতে পারে না বলিয়া সেখান হইতে ধাক্কা খাইয়া উল্টা পথে ফিরিয়া আসিবে। ইহাই হইল জলে ঢেউয়ের প্রতিফলন।







১৬৬নং চিত্র—জলে ঢেউয়ের প্রতিফলন

পাকাবাড়ি, দেওয়াল, পাহাড়ের গা, বৃক্ষের সারি প্রভৃতি হইতে শব্দ প্রতিফলিত হয়। শব্দের প্রতিফলন হইতে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হয়। শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই শব্দ শেষ হয় না। হাতুড়ি দিয়া লোহাতে ঢুম করিয়া এক বার আঘাত করা হইল। ঐ আঘাতের সময়ের পরেও শব্দের রেশ কানে অতি অল্প সময়ের জন্য রহিয়া যায়। ঐ রেশ এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময় পর্যন্ত থাকিতে পারে। শব্দের বেগ সেকেণ্ডে ১১২৬ ফুট। সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে শব্দ ১১২ ফুট যায়। কাজেই তুমি যদি "হাল্লু" বলিয়া চিৎকার কর এবং ঐ শব্দ যদি ৫৬ ফুট দূরের কোন বাড়ি হইতে প্রতিফলিত হইয়া আসে তবে প্রতিফলিত শব্দ আসিয়া আর শব্দের

রেশ পাইবে না। ফলে প্রতিফলিত শব্দটিকে উচ্চারিত শব্দ হইতে পৃথক ভাবে প্রতিধ্বনি রূপে শুনিতে পাইবে। বাড়ি হইতে ৫৬ ফুট দূরে শব্দ হইল। শব্দ-তরঙ্গ ৫৬ ফুট দূর গিয়া প্রতিফলিত হইয়া আবার ৫৬ ফুট অতিক্রম করিয়া ফিরিল; মোট ১১২ ফুট যাওয়া আসা করিল। সেজন্য সময় লাগিল দশ ভাগের এক সেকেণ্ড। ততক্ষণে উচ্চারিত শব্দের রেশ শেষ হইয়া গিয়াছে। কাজেই প্রতিধ্বনি স্পষ্ট শোনা গেল।

শয়নগৃহে বা স্কুলের শ্রেণিকক্ষে প্রতিধ্বনি হয় না কারণ এই সব ছোট ছোট ঘরের দেওয়াল হইতে প্রতিফলিত শব্দ দশ ভাগের এক সেকেণ্ডের পূর্বেই আসিয়া উচ্চারিত শব্দের সহিত মিশিয়া যায়। বড় হলে উচ্চারিত শব্দ হইতে প্রতিফলনকারী দেওয়ালের দূরত্ব ৫৬ ফুটের বেশি হইলেই প্রতিধ্বনি হইতে পারে। দেওয়ালে কাপড়ের ঢিলা পর্দা ঝুলাইলে শব্দ-তরঙ্গ বিভিন্ন দিকে প্রতিফলিত হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়, ফলে প্রতিধ্বনি গঠিত হইতে পারে না।

মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ-মোক্ষণ হইলে যে ঝলক দেখা যায় তাহার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ উত্তাপে বায়ুর প্রসারণের ফলে প্রচণ্ড শব্দের উৎপত্তি হয়। ক্ষণকালে উৎপন্ন শব্দটি কিন্তু বেশ কিছু কাল মেঘের গুরু গুরু ডাক রূপে শোনা যায়। মেঘের বিভিন্ন স্তরে বিদ্যুৎ-মোক্ষণের শব্দের প্রতিফলনের ফলেই এরূপ কিয়ৎকালব্যাপী শব্দ শোনা যায়।

প্রতিধ্বনির সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা যায়। জাহাজ হইতে সমুদ্রের নীচে শব্দ পাঠানো হয়। শব্দ কত ক্ষণে ফিরিয়া আসে ঘড়ির সাহায্যে দেখা হয়। জলের মধ্যে শব্দের বেগ জানা আছে। তাহা হইতে সমুদ্রের গভীরতা হিসাব করা যায়।

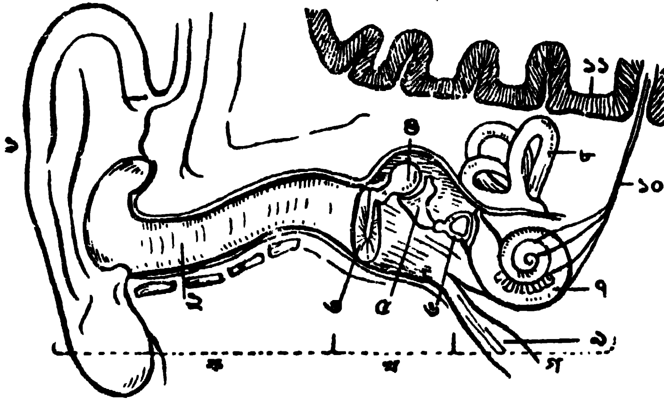
৩

আমরা কি ভাবে শুনি

আমরা চক্ষুদ্বারা আলোকের অনুভূতি পাই, চর্মের নীচের নার্ভ বা স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা তাপ অনুভব করি, আর কর্ণ দ্বারা শব্দের অনুভূতি পাইয়া থাকি। আমরা কি করিয়া শব্দের অনুভূতি পাই অর্থাৎ শব্দ শুনিতে পাই বুঝিতে হইলে কর্ণের গঠনপ্রণালী জানিতে হইবে।

কর্ণ—কর্ণের তিনটি অংশ—(**ক**) **বহিঃকর্ণ** (Outer Ear)—বাহিরের ফাঁদলের মত অংশ এবং সুড়ঙ্গের মত পথটি ইহার অন্তর্গত। ইহার কাজ শব্দ গ্রহণ করা।

(**খ**) **মধ্যকর্ণ** (Middle Ear)—চিত্রে মধ্যকর্ণের বিভিন্ন অংশ দেখ। মধ্যকর্ণের বাহিরের দিকে সুড়ঙ্গের গায়ে একটি পর্দা আটকানো আছে; ইহাকে **কর্ণপটহ** (Ear Drum) বলে। ইহাই মধ্যকর্ণকে



১৬৭নং চিত্র—কর্ণ

(ক) বহিঃকর্ণ (খ) মধ্যকর্ণ (গ) অন্তঃকর্ণ

১। বাহিরের অংশ ২। সুড়ঙ্গ ৩। কর্ণপটহ ৪। হাতুড়ি ৫। নেহাই

৬। পাদান ৭। কক্‌লিয়া ৮। তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নল

৯। ইউস্টেকিয়ান নল। শব্দবাহী নার্ভ ১১। মস্তিষ্ক

বহিঃকর্ণ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। বাহিরে কোন শব্দ হইলে বায়ুতে তাহার তরঙ্গ উত্থিত হয়। সেই তরঙ্গ সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করিয়া পটহে আঘাত করে এবং উহাতে স্পন্দনের সৃষ্টি করে। মধ্যকর্ণের মধ্যে তিনটি ক্ষুদ্র অস্থি আছে। ইহারা দেহের মধ্যে সবচেয়ে ছোট অস্থি। ইহাদের সাহায্যে পটহ হইতে উহার স্পন্দন অন্তঃকর্ণে চলিয়া যায়। একটি অস্থি পটহের গায়ে সংযুক্ত থাকিয়া হাতুড়ির মত কাজ করে। কম্পনের তালে তালে ইহা দ্বিতীয় অস্থি নেহাইকে আঘাত করে। নেহাইর সঙ্গে পাদানের মত তৃতীয় অস্থিটি সংলগ্ন। এই পাদানের অপর প্রান্ত অন্তঃকর্ণের সহিত সংযুক্ত। মধ্যকর্ণটি সর্বদা বায়ুপূর্ণ থাকা আবশ্যক; কারণ পটহের দুই দিকে বায়ুর চাপ সমান না থাকিলে উহা শব্দতরঙ্গে ভাল রূপে কাঁপিয়া

উঠিতে পারে না। মধ্যকর্ণে বায়ুর চাপ যাহাতে ঠিক থাকে, সেইজন্য উহা ইউস্টেকিয়ান নলের সাহায্যে গলবিলের সহিত সংযুক্ত।

(গ) অন্তঃকর্ণ (Inner Ear)—ইহা শামুকের খোলের মত পাকানো ও তরলপদার্থপূর্ণ। মস্তিষ্ক হইতে যে শব্দবাহী নার্ভ নামিয়া আসিয়াছে তাহা অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হইয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং পিয়ানোর চাবির মত পাশাপাশি সজ্জিত রহিয়াছে। কর্ণপটহের কম্পন অস্থি তিনটির সাহায্যে অন্তঃকর্ণের মধ্যে চালিত হয়। ইহার ফলে অন্তঃকর্ণের তরল পদার্থের মধ্যে তরঙ্গ উত্থিত হয়। সেই তরঙ্গ শব্দবাহী নার্ভের চাবি গুলিকে ধাক্কা দেয় এবং তাহাই নার্ভের সাহায্যে মস্তিষ্কে গিয়া শব্দরূপে গৃহীত হয়।

বহিঃকর্ণ দিয়া শব্দ ভিতরে প্রবেশ করে, মধ্যকর্ণ তাহার চালনা করে, আর অন্তঃকর্ণ তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে। শব্দের উৎপত্তি হয় মস্তিষ্কে।

অন্তঃকর্ণে তিনটি অর্ধ-বৃত্তাকার নল (Semicircular canal) আছে। ঐগুলি তরল পদার্থে পূর্ণ এবং পরস্পর তিন সমকোণে থাকে, যেমন ঘরের এক কোণে দুই দেওয়াল ও মেঝে রহিয়াছে। রাজমিস্ত্রী যেমন স্পিরিট-লেভেল (Spirit-level) দ্বারা কোন স্থান উঁচু কি নীচু বুঝিতে পারে তরল পদার্থপূর্ণ নল তিনটিও তিন দিকে থাকিয়া আমাদের দেহের স্পিরিট-লেভেলের মত কাজ করিয়া থাকে। মস্তক বা দেহ সম্মুখে-পশ্চাতে, ডানে-বায়ে বা উপরে-নীচে, যে দিকেই চালিত হউক না কেন, এই তিনটি নলের একটির তরল পদার্থের তলের পরিবর্তন হয় এবং সংলগ্ন নার্ভের সাহায্যে ঐ পরিবর্তনের সংবাদ মস্তিষ্কে চলিয়া যায়। সেখান হইতে দেহের ভারসাম্য রক্ষার প্রেরণা আসে।

প্রশ্ন

১। শব্দ যে কম্পনের দ্বারা উৎপন্ন হয় তাহা অন্তত তিনটি পরীক্ষা দ্বারা বুঝাইয়া বল।

২। বাদ্যযন্ত্র কত প্রকার, দৃষ্টান্ত দ্বারা বল। ইহাদের মধ্যে কিরূপে স্বরের উৎপত্তি হয় ?

৩। আমরা যে শব্দ করি তাহা কোথায়, কি ভাবে উৎপন্ন হয় ?

৪। গ্রামোফোনের সাউণ্ড-বক্সের গঠন ও কার্যপ্রণালী চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

৫। শব্দ-বিস্তারের জন্য যে বায়ুর প্রয়োজন তাহা পরীক্ষার বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়া বল।

৬। শব্দ যে জলের ভিতর দিয়া চলিতে পারে তাহা কিরূপে পরীক্ষা দ্বারা দেখানো যায় ?

৭। কঠিন পদার্থে শব্দ-বিস্তারের সহজ পরীক্ষা বর্ণনা কর।

৮। বায়ুতে শব্দ কি ভাবে প্রসারিত হয় বুঝাইয়া বল।

৯। প্রতিধ্বনি কাহাকে বলে এবং ইহা কি ভাবে উৎপন্ন হয় দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাও।

১০। কর্ণের বিভিন্ন অংশ কি কি এবং ইহা দ্বারা আমরা কি ভাবে শুনিতে পাই ?

বিষয়গত প্রশ্ন

(নির্দেশ পূর্বের ন্যায়)

১। ঠিক উক্তি নির্বাচন

(ক) কোন বস্তু কাঁপিলেই আমরা শব্দ নাও শুনিতে পারি। ——

(খ) আমাদের জিহ্বার কম্পনের সাহায্যে আমরা কথা বলিয়া থাকি। ——

(গ) বায়ু একমাত্র জড় পদার্থ যাহার ভিতর দিয়া শব্দের বিস্তার হয়। ——

(ঘ) কানের ভিতরে শব্দের অনুভূতি জন্মে না। ——

(ঙ) শব্দ কি এক প্রকার শক্তি ? ——

২। শূন্যস্থান পূরণ

উৎপত্তি স্থলে শব্দের প্রতিধ্বনি ভাল রূপে শোনা যায় যখন

শব্দের উৎস——(১) কম্পিত হয়, ——(১)

শব্দের প্রতিফলক অন্তত——(২) ফুট দূরে থাকে ——(২)

এবং পরিবেশ——(৩) হয়। ——(৩)

৩। কয়েকটি উত্তরের মধ্যে ঠিক উত্তর নির্বাচন

কোন কোন আকাশযান চলিবার শব্দ আকাশযাত্রী শুনিতে পান না। কারণ

(ক) ঐ আকাশযানের বেগ শব্দের বেগের চেয়ে বেশি।

(খ) আকাশযান চলার পথে বায়ু প্রায় থাকেই না।

(গ) আকাশযাত্রীর কান বাঁধা থাকে।

(ঘ) আকাশযান চলিবার শব্দ প্রতিফলিত হইয়া আসার সম্ভাবনা নাই।

বিদ্যুৎ

১

স্থির বিদ্যুৎ (Statical Electricity)

তোমরা সকলেই তড়িৎ বা বিদ্যুতের নাম শুনিয়াছ। ইহাকে সাধারণত ইলেকট্রিসিটি বলা হয়। আকাশে বিদ্যুৎ-ঝলক দেখিয়া থাকিবে। তবে বিদ্যুৎ জিনিসটা কি তোমাদের সঠিক ধারণা করা কঠিন। ইহার সাহায্যেই বর্তমান সভ্য জীবনের উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। তাপ, আলোক, শব্দ ও চুম্বক শক্তির ন্যায় বিদ্যুৎও এক রকমের শক্তি। বিদ্যুৎকে নানা উপায়ে তাপ, আলোক, শব্দ ও চুম্বক-শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। বিদ্যুৎকে আলোকে রূপান্তরিত করিয়া আমরা বাড়িঘর, রাস্তাঘাট প্রভৃতি আলোকিত করি। ইহাকে তাপে পরিবর্তিত করিয়া জল গরম, রান্নার কাজ প্রভৃতি করা যায়। ইহাকে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিবর্তিত করিয়া পাখা, নানা যন্ত্রপাতি, গাড়ি প্রভৃতি চালানো হইয়া থাকে।

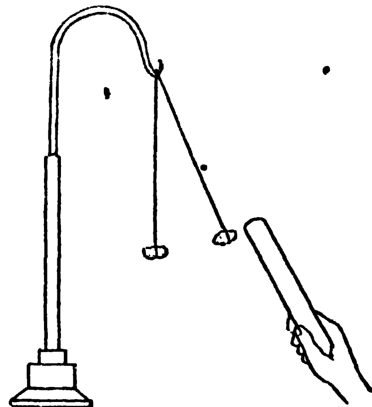
সৃষ্টির আদি যুগে মানুষ যখন বর্ষার কালো মেঘে বিদ্যুতের ঝলক দেখিতে পায় এবং পর ক্ষণেই কড়্-কড়্ শব্দে বাজ পড়ার আওয়াজ নামিয়া আসে তখন বিদ্যুতের প্রথম সাক্ষাতে তাহার মনে ভয় ও বিস্ময়ের উদয় হয়। তখন সে ভাবিতেও পারে নাই একদিন বিদ্যুৎ মানুষেব আয়ত্তে আসিয়া সভ্যতার নানা উপাদান যোগাইবে।

বিদ্যুতের উৎপত্তি—শীতের দিনে সেলুলয়েড বা গাটা-পার্চারের চিরুনি দিয়া মাথার শুকনা চুল ক্ষিপ্র হস্তে আচড়াইয়া চিরুনিটি ছোট ছোট কাগজের টুকরার উপর ধরিলে দেখা যায় টুকরা গুলি লাফাইয়া লাফাইয়া উঠিয়া চিরুনির সহিত লাগিয়া যায়। চুলের সহিত ঘর্ষণে চিরুনিতে এক প্রকার শক্তির সঞ্চার হয়, যাহা কাগজকে আকর্ষণ করিতে পারে। বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষায় জানা গিয়াছে ঘর্ষণে চিরুনিতে বিদ্যুৎ বা তড়িৎ উৎপন্ন হয়।

শুকনা এক টুকরা রেশমের কাপড় দিয়া একটি কাচের দণ্ড বেশ কয়েক বার জোরে ঘষিয়া পূর্বের মত কাগজের টুকরার উপর ধর। দেখিবে কাচদণ্ডটি টুকরা গুলিকে আকর্ষণ করিয়াছে। একটি শোলার বল বা একটি খই

রেশমের সূতা দিয়া ঝুলাও। কাচদণ্ডটি পূর্বের ন্যায় ঘষিয়া ঝুলানো জিনিসটির নিকট নিলে উহা দণ্ডটির দিকে আকৃষ্ট হইবে।

এক খণ্ড সীল করিবার গালা পশমের টুকরা দিয়া ঘষিলেও গালাতে আকর্ষণ করিবার শক্তি উৎপন্ন হয়। আর পূর্বের পরীক্ষা গুলি হইতে ইহাও দেখা যায় যে শুধু কাচ ও গালা নয়, ঘষিবার ফলে রেশম এবং পশমেরও হালকা জিনিস আকর্ষণ করিবার শক্তি জন্মে। এইরূপে দেখা গিয়াছে, কতকগুলি জিনিসকে অপর কতকগুলি জিনিস দিয়া ঘষিলে তাহাদের হালকা জিনিস আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা জন্মে। ঘর্ষণের ফলে তাহারা তড়িতাহিত বা তড়িদ্‌গ্রস্ত (electrified) হয় বলিয়াই তাহাদের মধ্যে আকর্ষণশক্তি জন্মে।



১৬৮নং চিত্র—খইটিকে কাচদণ্ড আকর্ষণ করে

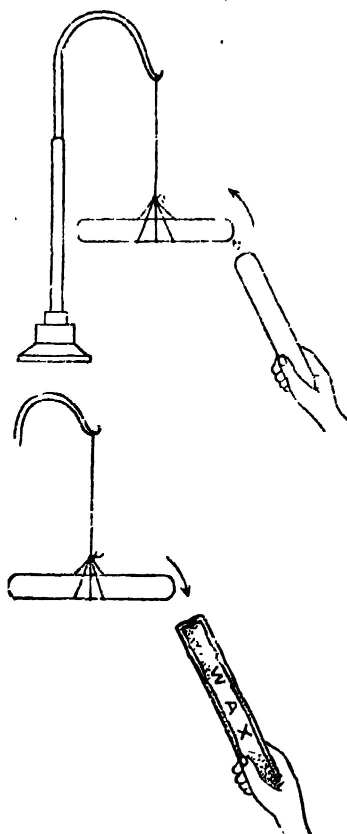
আড়াই হাজার বৎসরেরও কিছু বেশি পূর্বে গ্রীস দেশীয় পণ্ডিতগণ দেখিতে পান এম্বার (Amber) নামক আঠাজাতীয় পদার্থ ঘষিলে উহা হাল্‌কা জিনিস আকর্ষণ করিতে পারে। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে রানী এলিজাবেথের চিকিৎসক উইলিয়াম গিলবার্ট এ বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান করেন এবং দেখিতে পান যে এম্বার ছাড়া অন্যান্য জিনিসেরও ঐরূপ গুণ আছে।

বিদ্যুৎ দুই প্রকার—একটি কাচদণ্ডের এক প্রান্ত রেশম দিয়া ঘষিয়া রেশমী সূতায় ঝুলানো একটি দোলনায় বসাও। আর একটি কাচদণ্ডের এক প্রান্ত একই ভাবে ঘষিয়া ঝুলানো দণ্ডের ঘষা প্রান্তের নিকট ধরিলে দেখা যাইবে উহা দূরে সরিয়া যাইতেছে অর্থাৎ উহারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করিতেছে।

এবার সীল করার গালার একটি কাঠি পশমের টুকরা দিয়া ঘষিয়া ঝুলানো কাচদণ্ডের নিকট ধরিলে উহাদের মধ্যে আকর্ষণ ঘটিতে দেখা যাইবে।

এই পরীক্ষা দুইটি হইতে দেখা যায় ঘষা কাচ ও ঘষা গালার বিদ্যুতের

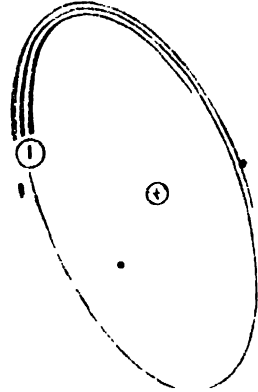
মধ্যে আকর্ষণ হয়, কিন্তু ঘষা কাচের বিদ্যুৎ ঘষা কাচের বিদ্যুৎকে বিকর্ষণ করে। তোমরা জান দুইটি চুম্বকের সম মেরুতে বিকর্ষণ এবং বিসম বা বিপরীত মেরুতে আকর্ষণ হয়। সেইরূপ সমধর্মী বিদ্যুতের মধ্যে বিকর্ষণ এবং বিপরীত ধর্মী বিদ্যুতের মধ্যে আকর্ষণ হয়। ইহা হইতে আরও বুঝা গেল ঘর্ষণে দুই প্রকারের বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ইহার একটির নাম দেওয়া হইয়াছে ধনাত্মক বা পজিটিভ (positive) এবং আর একটির নাম ঋণাত্মক বা নেগেটিভ (nager-tive) বিদ্যুৎ। ঘর্ষণে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহার সম্বন্ধে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে যে উহা উৎপত্তি স্থলেই আবদ্ধ থাকে; যেমন কাচ বা গালার যে প্রান্ত ঘষা যায় বিদ্যুৎ সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকে। এজন্য এই বিদ্যুতের নাম **স্থির বিদ্যুৎ** (Statical Electricity)। আর এই বিদ্যুৎ দুইটি পদার্থের ঘর্ষণে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে **ঘর্ষণজাত বিদ্যুৎও** বলে।



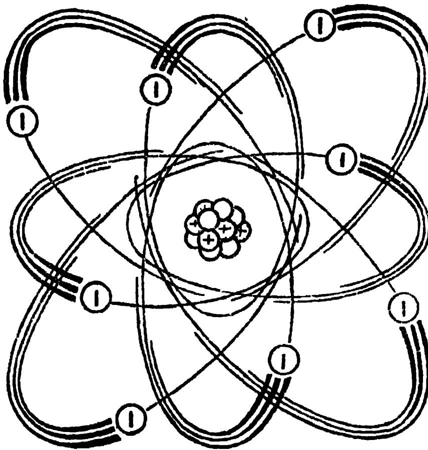
১৬১নং চিত্র—ঘর্ষণজাত বিদ্যুতের বিকর্ষণ ও আকর্ষণ

ইলেকট্রন ও তড়িৎ আধান—পদার্থে তড়িৎসঞ্চার বা তড়িৎ আধানের রহস্য পরমাণুর গঠন হইতে জানা যায়। পরমাণুকে একটি অতি ক্ষুদ্র সৌর জগতের সঙ্গে তুলনা করা হয়। ইহা সাধারণ মাইক্রোস্কোপের দৃষ্টির বাহিরে। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে পজিটিভ আধান (Charge)-যুক্ত একটি অতিক্ষুদ্র কণিকা রহিয়াছে। ইহার নাম **প্রোটন** (Proton)। তাহার চারি দিকে নেগেটিভ আধানযুক্ত আরও অনেক ক্ষুদ্র, আকারে প্রায়

দুই হাজার ভাগের এক ভাগ, একটি বিদ্যুৎ-কণিকা ঘুরিতেছে। ইহার নাম **ইলেকট্রন** (Electron)। আর প্রতি প্রোটনে যতটুকু পজিটিভ তড়িৎ আছে প্রতি ইলেকট্রনে ঠিক সেই পরিমাণ নেগেটিভ তড়িৎ রহিয়াছে। ফলে একটি সমগ্র পরমাণুতে প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান বলিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় ইহাতে তড়িৎধর্ম প্রকাশ পায় না। হিলিয়াম-পরমাণুর কেন্দ্রে দুইটি পজিটিভ প্রোটন ছাড়া সম ওজনের আরও দুইটি কণিকা রহিয়াছে। তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে **নিউট্রন** (Neutron)। নিউট্রনের কোন তড়িৎ-আধান নাই, ইহা উদাসীন (Neutral)। কেন্দ্রের চারিদিকে দুইটি ইলেকট্রন ঘুরিতেছে। এইটি অক্সিজেন-পরমাণুর কেন্দ্রে আটটি প্রোটন ও আটটি নিউট্রন রহিয়াছে। ইহার বাহিরের কক্ষগুলিতে আটটি ইলেকট্রন ঘুরিতেছে। আরও বেশি ওজনের পরমাণুতে প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা ক্রমশ বাড়িয়া গিয়াছে; তবে বিদ্যুৎ-আধানযুক্ত প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সর্বদাই সমান।



১৭০নং চিত্র—হাইড্রোজেন পরমাণু



১৭১নং চিত্র—অক্সিজেন-পরমাণু

ঘর্ষণজাত তড়িৎ কিরূপে উৎপন্ন হয়—পজিটিভ-আধানযুক্ত কেন্দ্রীয় প্রোটনগুলির আকর্ষণে বাহিরের নেগেটিভ-আধানযুক্ত ইলেকট্রনগুলি পরমাণুতে আবদ্ধ থাকে। কোন পদার্থে ইলেকট্রন সমূহের বেশি পরিমাণে সমাবেশ হইলেই সেখানে তড়িৎ উৎপন্ন হয়। পরমাণুর ভিতর

হইতে প্রোটন বা নিউট্রন বাহির করা খুবই কঠিন, কিন্তু বাহিরের দিক হইতে ইলেকট্রন ছাড়াইয়া নেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। যেখানে বেশি পরিমাণে ইলেকট্রন ছাড়াইয়া তাহাদের সমাবেশ করা যায় সেখানেই বেশি পরিমাণে তড়িৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিভিন্ন পদার্থে প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন; তাহা ছাড়া ইহারা ভিন্ন ভিন্ন রকমে সাজানোও থাকে। এজন্য সকল পদার্থের প্রোটন ও ইলেকট্রনের মধ্যে আকর্ষণ সমান নহে। দুইটি পদার্থ একত্রে ঘষিলে যেটিতে ইলেকট্রনের বন্ধন অপেক্ষাকৃত শিথিল সেইটি হইতে ইলেকট্রন অপরটিতে চলিয়া যায় এবং বস্তু দুইটি বিপরীত তড়িদ্‌গ্রস্ত হয়। এক বস্তু হইতে মুক্ত ইলেকট্রন অপর বস্তুতে যুক্ত হয় বলিয়া দ্বিতীয় বস্তুর নেগেটিভ আধান প্রথম পদার্থের পজিটিভ আধানের সমান হইবে। কাচদণ্ডকে রেশম দিয়া ঘষিলে কাচ হইতে ইলেকট্রন মুক্ত হইয়া রেশমের মধ্যে যায়। ফলে কাচ পজিটিভ ও রেশম নেগেটিভ তড়িদ্‌গ্রস্ত হয়। পশম বা ফ্লানেল দিয়া গন্ধক বা গালা ঘষিলে ফ্লানেল হইতে ইলেকট্রন গন্ধক বা গালাতে স্থানান্তরিত হয়। ইহাতে গন্ধক বা গালার তড়িতাধান হয় নেগেটিভ, আব ফ্লানেলের তড়িতাধান হয় পজিটিভ।

বিদ্যুৎ পাইতে হইলে ইলেকট্রনের সমাবেশ করিতে হইবে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ইলেকট্রনই পদার্থের পরমাণুর মধ্যে রহিয়াছে; কাজেই পরমাণু হইতেই বিদ্যুৎ সংগ্রহ করিতে হইবে। দুইট পদার্থের ঘর্ষণে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার সময় যান্ত্রিক শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিবর্তিত করা হয়। এই সহজ প্রণালীতে খুব বেশি সংখ্যক ইলেকট্রন ছাড়ানো যায় না; সেজন্য তড়িৎ সমাবেশও বেশি হয় না। তবে অল্প জায়গায় ইলেকট্রনের সমাবেশ সীমাবদ্ধ থাকে বলিয়া এভাবে উচ্চ চাপে তড়িৎ উৎপাদন করিয়া তাহা হইতে ক্ষণিকের জন্য প্রবল শক্তি উৎপন্ন করা যায়। কোন যন্ত্রের দুইটি অংশে উচ্চ চাপে পজিটিভ ও নেগেটিভ বিদ্যুতের সমাবেশ ঘটাইয়া তাহা হইতে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ উৎপাদন করা যায়। আকাশে মেঘের মধ্যে আহিত বিদ্যুৎ খুব উচ্চ চাপের হইলে তাহা হইতে ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎ-মোক্ষণ হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমেরিকান বৈজ্ঞানিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন আকাশে রেশমনির্মিত ঘুড়ি উড়াইয়া উহার সাহায্যে ঝড়ো মেঘ হইতে বিদ্যুৎ পৃথিবীতে নামাইয়া আনেন। ঐ বিদ্যুৎ ও ঘর্ষণে উৎপাদিত বিদ্যুৎ যে এক

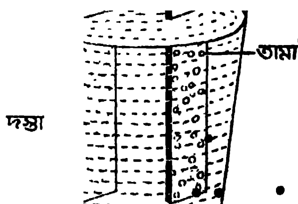
তাহা তিনি প্রমাণ করেন। কিন্তু তিনি এবং পরবর্তী কালে মানুষ চেষ্টা করিয়াও আকাশের বিদ্যুৎ কাজে লাগাইতে পারিল না। ঘর্ষণে বেশি পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা খুব পরিশ্রমসাধ্য। আর ইহার স্থান সীমাবদ্ধ বলিয়া ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ সার্থক হয় নাই।

প্রবাহী বিদ্যুৎ (Current Electricity)

তড়িৎ-শক্তিকে বাস্তব জীবনে ব্যবহার করিতে হইলে উহার প্রবাহ সৃষ্টি করিতে হয়; যেমন খুব উঁচু জায়গায় সঞ্চিত অনেকটা জল হঠাৎ নীচে ফেলিয়া দিলে তাহা দিয়া কোন কাজই হয় না, অথচ সেই জলটা যদি নলের ভিতর দিয়া উপর হইতে নীচে নামাইবার ব্যবস্থা করিয়া জলের ধারার সৃষ্টি করা হয় তবে তাহা দ্বারা ছোট-খাট যন্ত্রপাতি চালানো যাইতে পারে।

স্থির বিদ্যুৎ আবিষ্কারের অনেক পরে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীদেশীয় ভোল্টা নামক এক জন বিজ্ঞানী প্রবাহী বিদ্যুৎ সৃষ্টি করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন। তাঁহার প্রণালী মত সহজে প্রবাহী বিদ্যুৎ সৃষ্টির জন্য যে তড়িৎ কোষ বা সেল (Cell) তৈয়ারি করা হয় তাহার নাম সরল ভোল্টীয় সেল (Simple Voltaic Cell)।

সরল ভোল্টীয় সেল— একটি কাচ পাত্রের মধ্যে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড রাখিয়া তাহার মধ্যে একটি দস্তার ও একটি তামার পাত ডুবাও। দুইটি পাতের উপরের দিকে বন্ধনী-স্ক্রুর সাহায্যে দুইটি তামার তার লাগাও। প্রথমতঃ তার দুইটির মুক্ত প্রান্ত দূরে দূরে রাখ। দস্তা ও অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে জিঙ্ক-সালফেট তৈয়ারি হইবে এবং হাইড্রোজেন গ্যাস বুদ্‌বুদের মত উঠিতে থাকিবে। ইহা তোমরা জান। তামার পাতের গায়ে কিছুই দেখা যাইবে না। এবার তার দুইটি যোগ কর। দস্তার



১৭২নং চিত্র—সরল ভোল্টীয় সেল

সঙ্গে অ্যাসিডের পূর্ববৎ ক্রিয়া চলিতে থাকিবে; কিন্তু হাইড্রোজেনের বুদ্‌বুদ্‌ তামার পাতের উপর দেখা দিবে। তারের উপর হাত দিলে তাহা উত্তপ্ত বোধ হইবে। এবার তারের বর্ত্মনীর (Circuit) মধ্যে টর্চের একটি ছোট বাল্‌ব লাগাও। বাল্‌বের ভিতরের সূক্ষ্ম তার লালচে রং ধরিয়া জ্বলিতে থাকিবে। একটি চুম্বক-কম্পাস তারের নিকট রাখিলে তাহার কাঁটা ঘুরিয়া যাইবে। অথচ তার দুইটি বিচ্ছিন্ন থাকিলে চুম্বকের উপর কোন ক্রিয়া হইবে না। তার দুইটি যোগ করায় পাত্রের ভিতরে হাইড্রোজেন দস্তার পাত হইতে তামার পাতের দিকে ধাবিত হইবে; আর বাহিরে তারের মধ্যে নানা নূতন গুণের আবির্ভাব হইবে। পাত্র ও তারের ভিতর দিয়া যে একটা বর্ত্মনী গঠিত হয় তাহার মধ্য দিয়া এমন কিছু প্রবাহিত হয় যাহার ফলে তারের মধ্যে নূতন গুণের সৃষ্টি হয়। ঐ নূতন জিনিসটি হইল **প্রবাহী বিদ্যুৎ বা চল বিদ্যুৎ**।

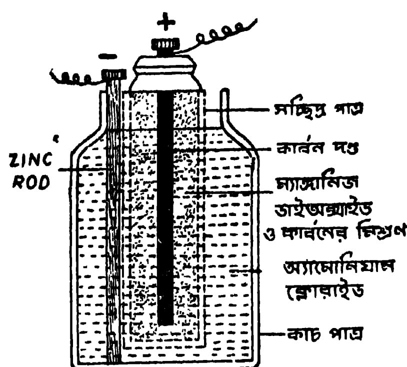
প্রবাহী বিদ্যুৎ কিরূপে উৎপন্ন হয়—বিষয়টি জটিল, তবে সংক্ষেপে এইরূপ: জিঙ্ক (দস্তা) ধাতুর একটি পরমাণুতে যত গুলি ইলেকট্রন থাকে তাহাদের সংখ্যা, রাসায়নিক ক্রিয়ায় যে জিঙ্ক-সালফেট তৈয়ারি হয় তাহার মধ্যস্থিত একটি জিঙ্ক পরমাণুর ইলেকট্রনের চেয়ে দুইটি বেশি। কাজেই রাসায়নিক ক্রিয়ায় জিঙ্কের পাতের উপর বহু সংখ্যক নেগেটিভ ইলেকট্রন মুক্ত অবস্থায় জমা হওয়ায় তামার পাতের চেয়ে ইহার উপর ইলেকট্রনের আধিক্য ঘটে। দুইটি পাত তার দিয়া যুক্ত করিলে মুক্ত ইলেকট্রন গুলি তামার পাতের দিকে ধাবিত হয়। অন্য দিকে জলের মধ্যে সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণ হইতে হাইড্রোজেন বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে তাহাতে একটি ইলেকট্রন কমিয়া যায় এবং তাহার আধান হইয়া পড়ে পজিটিভ। ইহাকে **হাইড্রোজেন** আয়ন (ion) বলে। তার দিয়া যে সব ইলেকট্রন তামার পাতে যায় তাহারা পজিটিভ আয়নকে আকর্ষণ করে। সেজন্যই তারের যোগ হইলে হাইড্রোজেন দস্তা হইতে তামার পাতের দিকে যায়। তামার পাতে গিয়া পজিটিভ আয়ন মুক্ত ইলেকট্রনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া একটি উদাসীন পুরাপুরি হাইড্রোজেন পরমাণুতে পরিণত হয়। তারের ভিতর নেগেটিভ ইলেকট্রনের প্রবাহই প্রবাহী বিদ্যুৎ সৃষ্টি করিয়া থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত দস্তা ও অ্যাসিডের মধ্যে ক্রিয়া চলিবে ততক্ষণ ইলেকট্রন-প্রবাহও অবিরাম চলিতে থাকিবে। সেলের সাহায্যে রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎ-

শক্তিতে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। দস্তার পাতের উপর নেগেটিভ ইলেকট্রনের সঞ্চার হয় বলিয়া তাহাকে সেলের নেগেটিভ তড়িদ্ দ্বার (electrode), আর তামার পাতে আসিয়া পজিটিভ হাইড্রোজেন লাগে বলিয়া তাহাকে পজিটিভ তড়িদ্ দ্বার বলে। ইলেকট্রন আবিষ্কারের বহু পূর্ব হইতেই এই প্রথা অনুসরণ করা হইয়াছে যে সেলের বাহিরে বিদ্যুৎ পজিটিভ তড়িদ্ দ্বার হইতে নেগেটিভ তড়িদ্ দ্বারের দিকে প্রবাহিত হয়। কিন্তু ইলেকট্রন আবিষ্কারের ফলে জানা গেল যে নেগেটিভ ইলেকট্রনই নেগেটিভ তড়িদ্ দ্বার হইতে পজিটিভ তড়িদ্ দ্বারের দিকে প্রবাহিত হয়; পজিটিভ তড়িতের কোন প্রবাহ চলে না। এখনও বহুদেশে-প্রচলিত প্রাচীন প্রথাই আমরা মানিয়া নিব। নেগেটিভ তড়িৎ এক দিকে চলা, আর পজিটিভ তড়িৎ তাহার উল্টা দিকে চলা আসলে একই ব্যাপার।

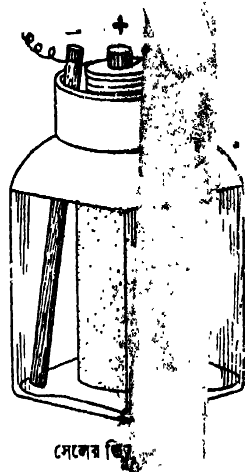
তড়িৎ-প্রবাহের কয়েকটি উৎস—পূর্বে বর্ণিত সরল ভোল্টীয় সেল হইতে তড়িৎ-প্রবাহ ভাল ভাবে পাওয়া যায় না। তামার পাতের উপর ধীরে ধীরে হাইড্রোজেন গ্যাসের বুদ্বুদের প্রলেপ পড়ে; তা পজিটিভ তড়িৎযুক্ত হাইড্রোজেন আয়ন আর সোজাসুজি তামার পাতের স্পর্শে আসিতে পারে না, হাইড্রোজেন গ্যাসের বুদ্বুদের আবরণে বাধা পায়। ফলে তড়িৎ-প্রবাহ ধীরে ধীরে কমিয়া যায়। ভোল্টীয় সেলের সাহায্যে বাল্ব জ্বালাইলে কিছুক্ষণ পরেই ইহা নিবিতে আরম্ভ হয়। তড়িৎ-প্রবাহ অটুট রাখিতে হইলে হাইড্রোজেন গ্যাস দূর করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। নিম্নে বর্ণিত সেল গুলিতে সে ব্যবস্থা রহিয়াছে।

ল্যাক্লাঁস সেল (Leclanche Cell)—চিত্রে সেলের বাহিরের ও ভিতরের গঠন দেখানো হইল। একটি পাত্রের জলে দ্রবীভূত অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড বা নিশাদল রহিয়াছে। তাহার ভিতর একটি দস্তার দণ্ড ডুবানো আছে। পাত্রের মাঝখানে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণের মধ্যে একটি সছিদ্র পাত্র রাখা হয়। ঐ পাত্র ম্যাঙ্গানিজ-ডাই-অক্সাইড ও কাঠ-কয়লার গুঁড়া দিয়া ভর্তি এবং ইহার ভিতর একটি কার্বন দণ্ড ঢুকানো। কার্বন-দণ্ডটি পজিটিভ তড়িদ্ দ্বার, আর দস্তার দণ্ডটি নেগেটিভ তড়িদ্ দ্বার। এই সেলে দস্তার সঙ্গে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ভোল্টীয় সেলের ন্যায় দস্তার পরমাণু হইতে ইলেকট্রন বাহিরের বর্ত্মনী দিয়া কার্বন দণ্ডে যায়, আর পজিটিভ তড়িৎযুক্ত হাইড্রোজেন আয়ন গুলি কার্বন-

দণ্ডের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং কার্বনদণ্ডে ইলেকট্রনের সংযোগে আসী হইয়া হাইড্রোজেন গ্যাসের বুদ্‌বুদরূপে উৎপন্ন হয়। ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড

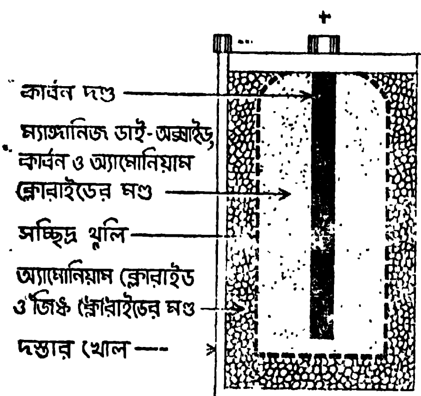


১৭৩ নং চিত্র—ল্যাক্‌লাঁসের সেল



সেলের ছবি

হাইড্রোজেনকে জলে পরিণত করে বলিয়া কার্বনদণ্ডের উপর হাইড্রোজেন গ্যাসের বুদ্‌বুদের আবরণ পড়িতে পারে না। তবে কিছু কাল ক্রিয়া চলিবার কালে যে হারে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় সেই হারে ম্যাঙ্গানিজ-ডাই-অক্সাইড তাহাকে জলে পরিণত করিতে পারে না। এজন্য এই সেল কিছুকাল কার্যকরী থাকিলে তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা হ্রাস পাইতে থাকে। কিছু কালের জন্য কাজের বিরাম দিলে ম্যাঙ্গানিজ-ডাই-অক্সাইড সঞ্চিত হাইড্রোজেনকে জলে পরিণত করিতে পারে এবং সেলটি আবার কর্মক্ষম হইয়া উঠে।

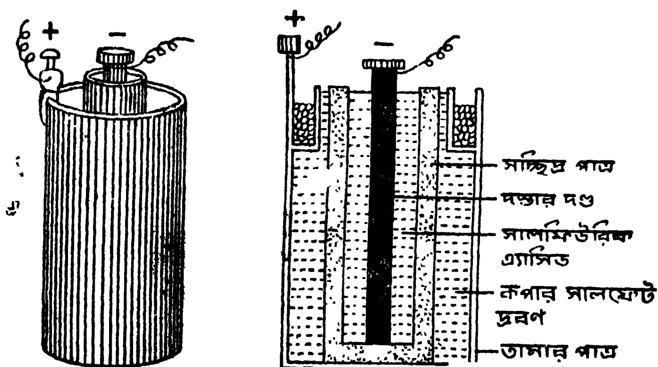


১৭৪ নং চিত্র—ড্রাই সেল

ড্রাই সেল (Dry Cell)—টর্চে যে সেল থাকে তাহাকে ড্রাই সেল বলে। ইংরেজিতে ইহাকে ড্রাই বা শুষ্ক বলিলেও সেলটি কিন্তু আসলে শুষ্ক নয়; কিন্তু এমন ভাবে প্রস্তুত যে ইহাতে তরল পদার্থ থাকে না।

সেজন্য উহা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া সুবিধাজনক। সম্পূর্ণ শুষ্ক হইলে ইহাতে তড়িৎ-প্রবাহ চলিতে পারে না। ইহা ল্যাকলাঁস সেলেরই উপাদান দিয়া ঐ প্রণালীমত গঠিত। একটি দস্তার খোল এই সেলের বাহিরের পাত্র; টর্চের সেলে ইহা নেগেটিভ বিদ্যুদ্ দ্বারের কাজ করে। বড় আকারের ড্রাই সেলে এক পাশে দস্তার নেগেটিভ বিদ্যুদ্ দ্বারটি থাকে। মাঝখানে কার্বনের দণ্ডটি পজিটিভ বিদ্যুদ্ দ্বার। ল্যাকলাঁস সেলের ভিতরের সচ্ছিদ্র পাত্রের পরিবর্তে ড্রাই সেলে কাপড় বা সচ্ছিদ্র কাগজের একটি থলি রহিয়াছে। থলির ভিতর ম্যাঙ্গানিজ-ডাই-অক্সাইড, কার্বনের গুড়া ও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের মণ্ড রহিয়াছে। আর থলির বাহিরে পাত্রটি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও জিঙ্ক-ক্লোরাইডের মণ্ড দিয়া ভরিয়া দেওয়া হয়।

ড্যানিয়েল সেল (Daniell Cell)—একটি তামার পাত্রের মধ্যে কপার সালফেট (তুঁতে) জলে দ্রবীভূত করিয়া রাখা হয়। তামার পাত্রটিই পজিটিভ তড়িদ্ দণ্ড হিসাবে কাজ করে। পাত্রের উপরের দিকে সচ্ছিদ্র তাকে



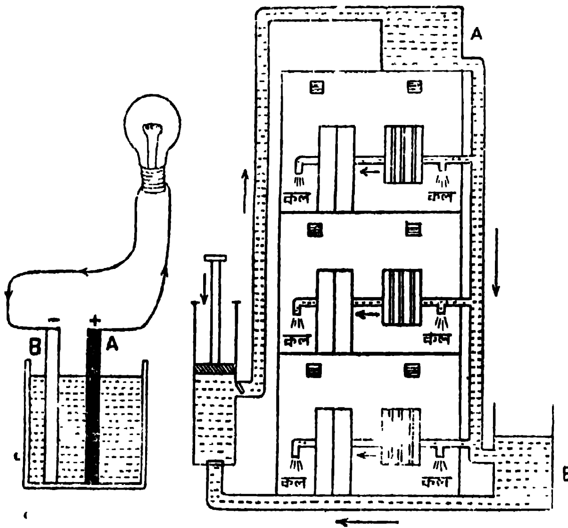
১৭৫ নং চিত্র—ড্যানিয়েল সেল ও ইহার ভিতরের গঠন

তুঁতের টুকরা রাখা হয়। ঐ টুকরা গুলি দ্রবণের সংস্পর্শে থাকায় দ্রবণ সর্বদা সংপৃক্ত (Saturated) থাকে। ঐ দ্রবণের ভিতর একটি সচ্ছিদ্র চিনামাটির পাত্রে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড রাখিয়া উহার ভিতর পারদের প্রলেপযুক্ত একটি দস্তার দণ্ড রাখা হয়। ঐ দণ্ডটি সেলের নেগেটিভ তড়িদ্ দ্বার। রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এই সেলে কোন পদার্থ উৎপন্ন হইয়া ইহার কাজ বন্ধ করিতে পারে না।

তড়িদ্‌বিভব, প্রবাহ ও রোধ

(Electric Potential, Current and Resistance)

তড়িদ্‌বিভব, প্রবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণার জন্য আমরা প্রথমে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে জল-প্রবাহের বিষয় উল্লেখ করিব। মনে কর, এক তলার ছাদের উপর জলের ট্যাঙ্ক বা চৌবাচ্চা বসানো আছে। ট্যাঙ্ক হইতে নল দিয়া নীচ তলায় জল জোরে আসে। কিন্তু যদি ট্যাঙ্কটি দোতলার ছাদে তোলা যায় তাহা হইলে জল আরও জোরে আসিবে। তিন তলার ছাদে তুলিলে জলধারার জোর আরও বেশি হইবে। কাজেই জলের কাজ করিবার শক্তি নির্ভর করে, জল কি অবস্থায় আছে, তাহার উপর। তড়িতের কাজ করিবার শক্তিও নির্ভর করে, তড়িৎ কি অবস্থায় আছে, তাহার উপর। তড়িতের এই অবস্থাকে তড়িতের **বিভব**



১৭৬নং চিত্র—জলপ্রবাহ ও তড়িৎপ্রবাহের মধ্যে সাদৃশ্য

(Potential) বলে। উচ্চ স্তর হইতে জল যেমন নিম্ন স্তরে প্রবাহিত হয় তড়িৎও সেইরূপ উচ্চ বিভব হইতে নিম্ন বিভবে প্রবাহিত হয়। ছবিতে জল A স্থানের ট্যাঙ্কের উচ্চ বিভবে রহিয়াছে। নলের মুখ খোলা থাকিলে

সেখান হইতে জল নিম্ন বিভবের B স্থানে পড়িয়া যায় বা চৌবাচ্চায় জমা হইতে পারে।

সাধারণ সেলেও এরূপ ব্যাপার ঘটে। রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তামার পাত পজিটিভ বিদ্যুৎযুক্ত হইয়া উচ্চ বিভব লাভ করে; আর দস্তার পাত নেগেটিভ বিদ্যুৎযুক্ত হইয়া নিম্ন বিভবসম্পন্ন হয়। তামার তার দিয়া পাত দুইটি জুড়িয়া দিলে উচ্চ বিভব হইতে নিম্ন বিভবের দিকে যে প্রবাহ চলে তাহাকে তড়িৎ-প্রবাহ (Electric Current) বলে। দুইটি পাত্রের মধ্যে যদি বিভিন্ন উচ্চতায় জল থাকে এবং তাহাদের মধ্যে জল-চলাচলের নলের যোগ থাকে তবে উচ্চ তল হইতে নিম্ন তলে জল চলিবে। উভয় পাত্রে জলের তল এক হইলে বা উচ্চ তলের জল সব নীচে নামিয়া গেলে যেমন জলপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ সেলের দুই তড়িদ্‌ দ্বার যোগ করার পর তাহাদের তড়িদ্‌বিভব সমতা প্রাপ্ত হওয়া মাত্রই তড়িৎপ্রবাহও থামিয়া যাওয়ার কথা। ছাদের ট্যাঙ্কের সব জল নামিয়া গেলে নীচ হইতে চৌবাচ্চার জমা জল পাম্প করিয়া ট্যাঙ্কে তুলিলে আবার জলের স্রোত বহিতে পারে। বৈদ্যুতিক সেলের বেলায় রাসায়নিক শক্তি পাম্পের মত কাজ করে অর্থাৎ ইহার সাহায্যে একটি পাত A অপর পাত B হইতে অনবরত উচ্চতর বিভবে থাকিতে পারে। কাজেই রাসায়নিক ক্রিয়া যতক্ষণ চলিবে বিদ্যুৎ-প্রবাহও ততক্ষণ চলিবে। রাসায়নিক ক্রিয়া বন্ধ হইলে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎপ্রবাহও থামিয়া যাইবে।

কোনও নির্দিষ্ট সময়ে কতটা জল ট্যাঙ্ক হইতে নল দিয়া নীচে পড়ে তাহা নির্ভর করে প্রথম ট্যাঙ্কের জলের বিভব বা উচ্চতার উপর; দ্বিতীয়ত ইহা নির্ভর করে নলের বেড় কত মোটা তাহার উপর। নল যত সরু হয়, জলের স্রোতে বাধা তত বাড়ে। নল যত মোটা হইবে জলের স্রোতে বাধা ততই কম হইবে। তৃতীয়ত নলের দৈর্ঘ্য যত বেশি হয় স্রোতের মধ্যে বাধাও তত বাড়ে। ছবিতে বাড়ির বিভিন্ন তলায় যে সব জলের কল রহিয়াছে তাহাদের নল সরু বলিয়া জলপ্রবাহ তাহাতে কম। ফলে কোন নির্দিষ্ট সময়ে মোটা নল দিয়া যে পরিমাণ জল পড়ে সরু নলের কল দিয়া তাহা হইতে জল অনেক কম পড়ে। আবার যে কলগুলি প্রধান নল হইতে দূরে সে গুলিতে সরু নল দিয়া জলের বেশি দূর যাইতে হয়। সেজন্য সে সব কল হইতে জল আরও কম পড়ে।

অধিকাংশ ধাতুর ভিতর দিয়া তড়িৎ সহজে চলিতে পারে। এজন্য

ইঁহারা তড়িৎ-সুপরিবাহী। সুপরিবাহী হইলেও সম্পূর্ণ রোধবৃত্তিশূন্য কোন পদার্থ নাই। পদার্থের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চালনায় বাধাকে **রোধ** (Resistance) বলে। ধাতুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ তড়িৎ-সুপরিবাহী হইল রূপা, তাহার পরেই তামার স্থান। যে সব পদার্থের ভিতর দিয়া তড়িৎ প্রবাহ খুব কমই চলিতে পারে তাহাদের রোধ খুব বেশি; তাহারা হইল তড়িৎ-কুপরিবাহী। সিল্ক, প্লাস্টিক, রবার, পোরসিলিন প্রভৃতি কুপরিবাহী। এজন্য যন্ত্রের কোন অংশে বিদ্যুৎ-প্রবাহ আটকাইতে হইলে এসব জিনিস ব্যবহার করা হয়।

কোন তড়িৎ-পরিবাহী তারের রোধ উক্ত পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদ, দৈর্ঘ্য ও উপাদানের উপর নির্ভর করে।

ওহ্‌মের সূত্র (Ohm's Law)—১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে **জর্জ ওহ্‌ম** নামক একজন জার্মান স্কুলশিক্ষক প্রবাহমাত্রা, রোধ ও বিভব-প্রভেদের মধ্যে এক সম্বন্ধ নির্ণয় করেন। ইহাকে **ওহ্‌মের সূত্র** বলে। সূত্রটি এইরূপ: **নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন পরিবাহীর ভিতর দিয়া যে তড়িৎ-প্রবাহ চলে তাহা পরিবাহীর দুই প্রান্তে প্রযুক্ত তড়িদ্‌বিভব-প্রভেদের সমানুপাতিক।** বিভব-প্রভেদ যে হারে বাড়িবে বা কমিবে তড়িৎ-প্রবাহও সেই হারে বাড়িবে বা কমিবে।

$$\frac{\text{বিভব-প্রভেদ}}{\text{প্রবাহমাত্রা}} = \text{একটি ধ্রুবক (Constant)}$$

এই ধ্রুবককেই পরিবাহীর রোধ বলা হয়। ওহ্‌মের সূত্র হইতে এই প্রয়োজনীয় সমীকরণ পাই: $\frac{E}{I} = R.$

এখানে E হইল বিভব-প্রভেদ, I হইল প্রবাহ, আর R হইল রোধ।

কোন জিনিস মাপিতে হইলে একটি একক (unit) স্থির করিয়া তাহা দ্বারা বস্তুটিকে মাপিতে হয়। বিভব-প্রভেদের একককে **ভোল্ট** (Volt), প্রবাহ-মাত্রার একককে **আম্পিয়ার** (Ampere) এবং রোধের একককে **ওহ্‌ম** (Ohm) বলে; সুতরাং

$$\frac{\text{ভোল্টের সংখ্যা}}{\text{আম্পিয়ারের সংখ্যা}} = \text{ওহ্‌মের সংখ্যা।}$$

ল্যাকলাঁস সেলের বিভব প্রায় ১·৫ ভোল্ট, ড্রাই সেলের বিভব প্রায় তাহাই, আর ড্যানিয়েল সেলের বিভব প্রায় ১·১ ভোল্ট। আমরা বাড়িতে আলো, পাখা প্রভৃতির জন্য যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করি তাহার বিভব

২২০ ভোল্টের মত। কলকারখানার যন্ত্রপাতি চালাইবার জন্য ৪৪০ বিভবের বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়। এই উচ্চ বিভবের বিদ্যুৎ ডাইন্যামো (Dynamo) দিয়া উৎপাদন করা হয়। এ সম্বন্ধে পরে বলা হইবে। আকাশে আহিত মেঘে বিদ্যুৎ-সঞ্চারের ফলে যে ঝলক দেখা যায় সেই বিদ্যুতের বিভব হাজার হাজার ভোল্ট।

তড়িদ্‌বর্ত্মনীতে বিভব বাড়াইতে হইলে একাধিক সেল জুড়িয়া দিতে হয়। একটি সেলের নেগেটিভ তড়িদ্ দ্বার অপরটির পজিটিভ তড়িদ্ দ্বারের সঙ্গে তার দিয়া যোগ করিতে হয়। এ ভাবে পর পর সেল জুড়িয়া দিলে প্রথম ও শেষ সেলের যে পজিটিভ ও নেগেটিভ তড়িদ্ দ্বার মুক্ত থাকে সেই দুইটির সঙ্গে তার জুড়িয়া বাহিরের বর্ত্মনী তৈয়ারি করিতে হয়। একাধিক সেল এরূপে জুড়িয়া দিলে তাহাকে **ব্যাটারি** (Battery) বলে। একটি ড্রাই সেল দিয়া বাল্‌ব জ্বালাইলে তাহা সামান্য জ্বলে। বাল্‌বের সরু তারের রোধ রহিয়াছে বলিয়া তাহার ভিতর দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ কমই চলিতে পারে। এবার দুইটি ড্রাই সেল পর পর যোগ করিলে বাল্‌বটি উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিবে। বিভব দ্বিগুণ হইয়াছে, আর রোধ একই রহিয়াছে। কাজেই ওহ্‌মের সূত্র মতে তড়িৎ-প্রবাহ দ্বিগুণ হইয়া বাল্‌বটিকে উজ্জ্বল ভাবে জ্বালাইবে।

টর্চের খোলের মধ্যে পর পর ড্রাই সেল ঢুকাইয়া চাপিয়া দিলে প্রথম সেলের পিছনের দস্তার আবরণ অর্থাৎ নেগেটিভ তড়িদ্ দ্বারের সহিত দ্বিতীয় সেলের মধ্যভাগের কার্বন দণ্ড অর্থাৎ পজিটিভ তড়িদ্ দ্বারের সংযোগ হয়। সব শেষের সেলটির পিছনের আবরণের সঙ্গে টর্চের বাহিরের গায়ের ধাতুর যোগাযোগ হইয়া যায়। সেখান হইতে বাল্‌বের ভিতর দিয়া প্রথম সেলের ভিতরের কার্বন দণ্ডের সঙ্গে সংযোগ করিয়া বর্ত্মনীটি সম্পূর্ণ করা হয়।

৪

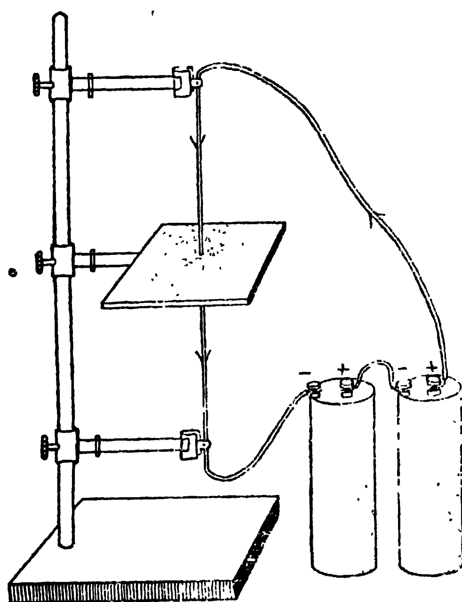
তড়িৎ-প্রবাহের ক্রিয়া (Effects of Electric Current)

যখন কোন পরিবাহী তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলে তখন নিম্নলিখিত ক্রিয়াসমূহ পরিলক্ষিত হয়।

(১) চুম্বক-শক্তির সৃষ্টি (Production of Magnetism) —১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে উরস্টেড (Oersted) নামক একজন ডেনমার্কের

বৈজ্ঞানিক এক আশ্চর্য রকমের আবিষ্কার করেন। তিনি দেখাইলেন যে যখন একটি তড়িদ্‌বাহী তার চুম্বক-কম্পাসের উপর রাখা যায় তখন তাহার কাঁটা (অর্থাৎ উত্তর বা দক্ষিণ মেরু) ঘুরিয়া যায়। তারটি যদি চুম্বক-কাঁটার নীচে রাখা যায় তবে কাঁটাটি উল্টা দিকে ঘুরিয়া যায়। ইহা হইতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তড়িদ্‌বাহী তারের চারিদিকে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। ইহা বুঝিবার জন্য একটি পরীক্ষা কর।

পরীক্ষা—একটি পিজবোর্ডের মধ্যস্থলে ছিদ্র করিয়া তাহার ভিতর দিয়া একটি তামার তার প্রবেশ করাইয়া দাও। পিজবোর্ড ও তারের প্রায় ২ ফুট অংশ চিত্রে প্রদর্শিত প্রণালীতে আটকাইয়া রাখ। তারের দুই প্রান্ত দুইটি ড্রাই সেলের ব্যাটারির সঙ্গে যুক্ত কর। এখন পিজবোর্ডের উপর লোহা-চুর ছড়াইয়া আস্তে আস্তে টোকা দাও। লোহা-চুরের বিন্যাস হইতে বুঝা যাইবে যে তারের চতুর্দিকে চুম্বক-ক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

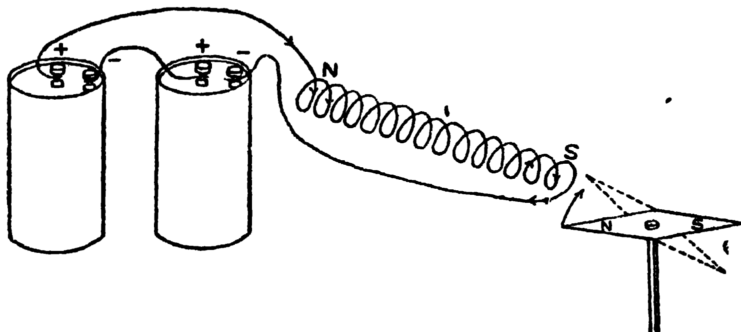


১৭৭নং চিত্র—তড়িৎ-প্রবাহ হইতে চৌম্বক ক্ষেত্র

তাহার পর তারটি আটকানো অবস্থা হইতে খুলিয়া তাহার কতকটা অংশ একটা চুম্বক-কম্পাসের উপর ধর। ইহার কাঁটা ঘুরিয়া যাইবে। তারের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ উল্টা দিকে চালাইলে চুম্বক-কাঁটাও উল্টা দিকে ঘুরিবে।

এক বৎসর পরে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক আমপিয়ার (Ampere) দেখিতে পাইলেন যে তড়িদ্‌বাহী একটি তারের কুণ্ডলী চুম্বকের মত গুণসম্পন্ন এবং চুম্বকের মতই কাজ করে। ইহা বুঝিবার জন্য এই পরীক্ষাটি কর।

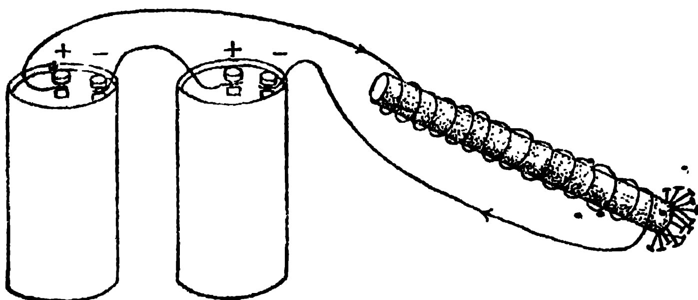
পরীক্ষা—একটি সুতা-জড়ানো তার একটি মোটা পেন্সিলের উপর পাকে পাকে জড়াইয়া একটি লম্বা কুণ্ডলী প্রস্তুত কর। এরূপ কুণ্ডলীকে **সলিনয়েড** (Solenoid) বলে। বিজ্ঞানাগারে কাজের জন্য সুতা-জড়ানো তামার তার ব্যবহার করা হয়। সেজন্য দুইটি তার লাগিয়া বা জড়াইয়া গেলে



১৭৮নং চিত্র—তড়িৎবাহী সলিনয়েডের দুই প্রান্তে চুম্বকের ন্যায় মেরু

সুতার রোধের জন্য মধ্য পথে এক তার হইতে অন্য তারে তড়িৎ যাইতে পারে না। কুণ্ডলী-পাকানো তারের মধ্যেও সমস্ত তারটি বহিয়া তড়িতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাইতে হয়; মধ্যবর্তী দুইটি স্থানের মধ্যে তড়িতের আদান-প্রদান হইতে পারে না। কুণ্ডলীর দুই প্রান্ত চিত্রে প্রদর্শিত প্রণালীতে দুই সেলযুক্ত ব্যাটারির সঙ্গে যুক্ত কর। চুম্বক-কম্পাস দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে সলিনয়েডের দুই মুখে চুম্বকের ন্যায় দুই মেরুর উদ্ভব হইয়াছে।

তড়িদ্‌বাহী একটি সলিনয়েড চুম্বকধর্মী হইলেও ইহার চৌম্বক শক্তি খুবই কম। ইহার সাহায্যে সামান্য লোহার গুঁড়া আকর্ষণ করা যায়। ইহার

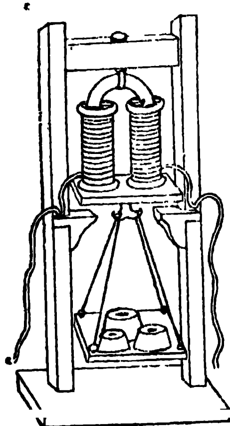


১৭৯নং চিত্র—সলিনয়েডের ভিতর লোহার শলাকা থাকিলে ইহার চৌম্বক শক্তি বাড়িয়া যায়

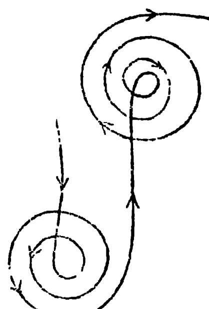
মধ্যে যদি একটি নরম লোহার শলাকা প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায় তবে ইহার

চৌম্বক শক্তি অনেক বাড়িয়া যায়। তখন ইহা ছোট ছোট লোহার পেরেক টানিয়া ধরিতে পারে। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া **তড়িৎ-চুম্বক** (Electromagnet) প্রস্তুত করা হয়।

তড়িৎ-চুম্বক (Electromagnet)—সলিনয়েডে তড়িৎপ্রবাহের মাত্রা যত বাড়ানো যাইবে এবং সলিনয়েডের যত বেশি সংখ্যক পাক থাকিবে তড়িৎ-চুম্বকের শক্তি ততই বেশি হইবে। সাধারণ চুম্বক অশ্বক্ষুরাকৃতি করিয়া



১৮০নং চিত্র—তড়িৎ-চুম্বক ভারী ওজন তুলিয়া রাখিয়াছে



তার জড়াইবার প্রণালী

তৈয়ারি করা হইলে ইহার দুইটি মেরু নিকটে থাকিয়া জোরে লোহা টানিতে পারে। তড়িৎ-চুম্বকের দুইটি মেরুই যাহাতে এক সঙ্গে লোহাকে আকর্ষণ করিতে পারে সেজন্য তড়িৎ-চুম্বক প্রস্তুতের জন্য U-আকারের লৌহদণ্ড ব্যবহার করা হয়। তড়িৎ-চুম্বক বহুবিধ যন্ত্রে, যেমন—বৈদ্যুতিক ঘণ্টা (Electric Bell), টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতিতে ব্যবহার করা হয়। ইহাদের বিবরণ পরে দেওয়া হইবে। খুব ভারি লোহা ও ইস্পাত তুলিয়া স্থানান্তরিত করার জন্য কল-কারখানায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তড়িৎ-চুম্বক ব্যবহার করা হয়।

তড়িৎ-চুম্বক প্রস্তুত-প্রণালী—তড়িৎ-চুম্বকের উপর জড়ানো তারে যতক্ষণ বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলে ততক্ষণই ইহার চুম্বকত্ব থাকে এবং ইহা লোহাকে আকর্ষণ করিতে পারে। একখণ্ড লোহা টানিয়া তুলিয়া পরে ইহা ছাড়িয়া আবার আর একখণ্ড তুলিতে হইলে পূর্বের লোহাটিকে ছাড়ার

সময় চুম্বকত্ব যাহাতে না থাকে সেরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্থায়ী চুম্বক দিয়া তাহা করা যায় না। বিদ্যুৎ-চুম্বকের উপর জড়ানো তারে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ করিলেই উহার চুম্বকত্ব থাকে না। বিদ্যুৎ-চলার সময় যাহাতে চুম্বকত্বের সৃষ্টি হয় এবং বিদ্যুৎ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাহাতে চুম্বকত্ব লোপ পায় সেজন্য বিদ্যুৎ-চুম্বক প্রস্তুতের জন্য **কোমল লোহা** (Soft Iron) ব্যবহার করা হয়। তোমরা জান, স্থায়ী চুম্বক প্রস্তুতের জন্য স্টীল ব্যবহার করিতে হয়।

একটি ছোট বিদ্যুৎ-চুম্বক প্রস্তুত কর। কোমল লোহার একটি সরু দণ্ড U-র মত বাঁকাইয়া ইহার দুই মুখের উপর দুইটি কাঠের কাঠিম লাগাও। এই দুইটি কাঠিমের উপর সূতা-জড়ানো তার বার বার জড়াও। তার যত বেশি বার জড়াইবে বিদ্যুৎ-চুম্বকের আকর্ষণ-শক্তি ততই বেশি হইবে। তার জড়াইবারও একটি নিয়ম আছে। প্রথম একটি কাঠিমে বার বার তার জড়াইয়া তাহার পর অপর কাঠিমে উল্টাভাবে জড়াইতে হইবে। তাহা হইলেই চুম্বকের এক প্রান্ত উত্তর মেরু ও অপর প্রান্ত দক্ষিণ মেরু হইবে। ছবিতে কাঠিমে তার জড়াইবার প্রণালী দেখ।

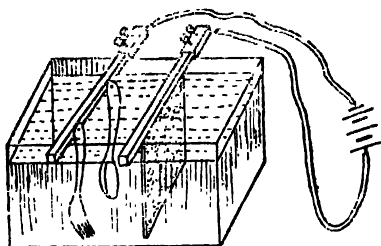
(২) তাপ ও আলোক উৎপাদন (Production of Heat and Light)—যখন কোন সরু তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালানো হয় তখন ঐ প্রবাহের পথে রোধের সৃষ্টি হয়। ফলে তারটি গরম হইয়া উঠে। একটি সেলের বর্তনীর তার যদি সরু হয় তবে ইহাতে হাত দিলে গরম লাগিবে। তার মোটা হইলে গরম বোধ হইবে না। বিজলি বাতির খুব সরু তারের ভিতর দিয়া যখন তড়িৎ-প্রবাহ চলে তখন অত্যধিক তাপসৃষ্টির ফলে তাহা হইতে উজ্জ্বল আলোরও সৃষ্টি হয়। একটি বিজলি বাতি হইতে যখন আলো পাওয়া যায় তখন ঐ বাতিটি এত গরম হইয়া পড়ে যে তাহাতে হাত দেওয়া যায় না। তড়িতের এই তাপ-উৎপাদনের ব্যবহারিক প্রয়োগ দ্বারা বৈদ্যুতিক উনান, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। আর বাড়িঘর, পথঘাট, যানবাহন আলোকিত করার জন্য বিজলি বাতির উপযোগিতা খুব বেশি। এ সম্বন্ধে পরে আরও বলা হইবে।

(৩) রাসায়নিক শক্তির উদ্ভব (Production of Chemical Energy)—তড়িতের রাসায়নিক প্রভাবের কথা তোমরা জান। জলের উপাদান—হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন, বিশ্লেষণ করিবার জন্য অ্যাসিড-

মিশ্রিত জলের ভিতর দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালানো হয়। ইহা তোমরা অষ্টম শ্রেণীতে পড়িয়াছ।

তড়িৎ-বিশ্লেষণ ও তড়িৎ-প্রলেপন (Electrolysis and Electroplating)—তড়িৎ-প্রবাহের সাহায্যে শুধু জলের উপাদানই বিশ্লেষিত হয় না, বহু প্রকার ধাতব লবণ জলে দ্রবীভূত করিয়া ঐ দ্রবণে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালাইলে ধাতব ও অধাতব অংশ পৃথক্ করা যায়। ইহাকে তড়িৎ-বিশ্লেষণ (Electrolysis) বলে।

পরীক্ষা—একটি কাচ পাত্রে তুঁতের জল নিয়া তাহাতে কয়েক ফোঁটা সালফিউরিক অ্যাসিড মিশাও। দ্রবণের ভিতর একদিকে একটি তামার পাত এবং অন্যদিকে একটি বিশেষভাবে পরিষ্কৃত পিতলের চামচ ডুবাইয়া রাখ। তামার পাতকে একটি ব্যাটারির পজিটিভ তড়িদ্দ্বার এবং পিতলের চামচটিকে নেগেটিভ তড়িদ্দ্বারের সহিত যুক্ত করিয়া কিছু সময় বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালাও। পজিটিভ তড়িদ্দ্বার লম্বা এবং নেগেটিভ তড়িদ্দ্বার খাটো ও মোটা রেখাদ্বারা দেখানো হইয়া থাকে। ইহার পর চামচটি তুলিয়া আনিলে দেখা যাইবে চামচের উপর তামার প্রলেপ পড়িয়াছে।

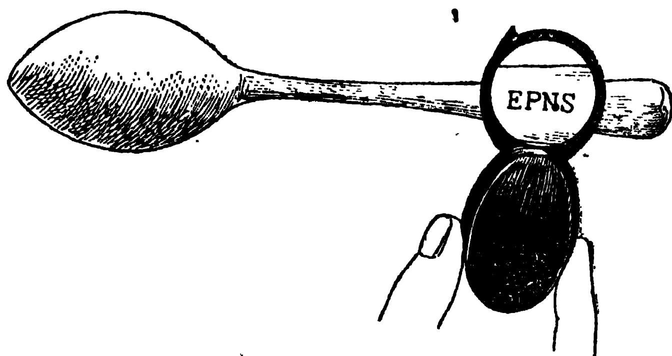


১৮১ নং চিত্র—তড়িৎ-বিশ্লেষণ দ্বারা তড়িৎ-প্রলেপন

যখন তুঁতে বা কপার সালফেট জলে দ্রবীভূত হইল তখন তামার আয়ন ও সালফেট আয়ন পৃথক হইয়া গেল। তামার আয়ন পজিটিভ তড়িৎযুক্ত; আর সালফেট আয়ন নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত হইল। তড়িৎ-বিশ্লেষণের ফলে পজিটিভ তামার আয়ন নেগেটিভ তড়িদ্দ্বার অর্থাৎ পিতলের চামচের দিকে যায় এবং সেখানে তামা চামচের উপর জমা হয়। নেগেটিভ সালফেট-আয়ন তামার পাত্রের দিকে যায় এবং সেখান হইতে তামা নিয়া আবার কপার সালফেট গঠন করিবে। এভাবে যে পরিমাণে চামচের উপর তামার প্রলেপ বাড়িবে সেই পরিমাণে পজিটিভ তামার পাতের ক্ষয় হইবে।

এই পরীক্ষা দ্বারা কিভাবে ধাতুর জিনিষের উপর সোনা, রূপা, তামা, নিকেল প্রভৃতি অন্য ধাতুর সুন্দর আবরণ দেওয়া যায় দেখানো হইল। এই

প্রক্রিয়াকে **তড়িৎ-প্রলেপন** (Electroplating) বলে। লোহাতে মরিচা পড়ে। সেজন্য মোটর গাড়ির বিশেষ বিশেষ অংশে, যেমন বাম্পারের উপর প্রথম নিকেলের মোটা প্রলেপ দিয়া তাহার উপর ক্রোমিয়ামের পাতলা আবরণ দেওয়া হয়। খুব সুন্দর অথচ মজবুত কাঁটা ও চামচ নিকেলের সঙ্গে তামা ও দস্তার মিশ্রণ দিয়া প্রথমত তৈয়ারি করা হয়। পরে ইহার উপর রূপার (Silver) তড়িৎ-প্রলেপন দেওয়া হয়।

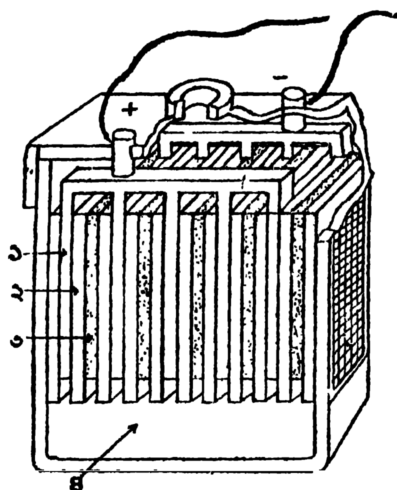


১৮২নং চিত্র—চামচের হাতলে EPNS লেখা লেন্স দিয়া দেখা

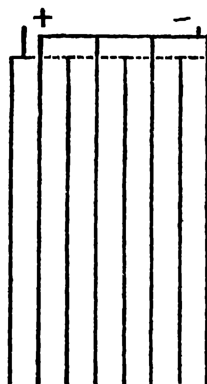
চামচের গায়ে EPNS লেখার অর্থ কি জান? ইহা হইল Electro Plated Nickel Silver, এই চারিটি শব্দের প্রথম অক্ষর নিয়া।

স্টোরেজ সেল (Storage Cell)—তড়িতের সাহায্যে কোন দ্রবণের বিশ্লেষণ করা হইলে তড়িৎশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে পরিবর্তিত হয়। বিশেষ রকম সেলের সাহায্যে রাসায়নিক শক্তি হইতে আবার তড়িৎশক্তি ফিরিয়া পাওয়া যায়। ইহাকে **স্টোরেজ সেল** বলে। ল্যাক্লাঁস বা ড্যানিয়েল সেলে রাসায়নিক পদার্থগুলির ভিতর যে রাসায়নিক ক্রিয়া হয় তাহা হইতে তড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হয়। এজন্য ইহাদিগকে **প্রাথমিক কোষ** (Primary Cell) বলে। স্টোরেজ সেলের কার্যপ্রণালী অন্য রকম। ইহাতেও কতক-গুলি পদার্থের ভিতর রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু উক্ত রাসায়নিক পদার্থগুলিকে কার্যক্ষম করিবার জন্য বাহিরের কোন উৎস হইতে সেলের ভিতর বেশ কিছু কাল তড়িৎ-প্রবাহ চালাইতে হয়। এভাবে সেলটি আহিত (charged) করিয়া ইহার ভিতর বাহির হইতে আনীত ইলেকট্রন সঞ্চিত করা হয়। এজন্য ইহাকে **সঞ্চয়ন কোষ** বা **স্টোরেজ সেল** বলা হয়। ছবিতে স্টোরেজ সেলের গঠনপ্রণালী লক্ষ্য কর।

একটি কাচের পাত্রে সালফিউরিক অ্যাসিড রহিয়াছে। বিশেষ ভাবে তৈয়ারি দুই প্রস্থ সীসার পাত অ্যাসিডের মধ্যে ডুবানো থাকে। পাতগুলি



১৮৩নং চিত্র—স্টোরেজ সেলের গঠন



পাতগুলির বিন্যাস

নিরেট না হইয়া ঝাঁঝরার মত জালিতে ভর্তি। ঝাঁঝরার ফাঁক গুলিতে লেড অক্সাইড ও সালফিউরিক অ্যাসিডের মিশ্রণ থাকে। আমরা বাড়ীঘরে যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করি তাহা রাস্তার প্রধান বিদ্যুৎ তার হইতে আসে। সেই বিদ্যুৎ ডাইন্যামোর সাহায্যে উৎপাদিত হয়। ডাইন্যামোর কাজ সম্বন্ধে তোমরা পরে জানিতে পারিবে। স্টোরেজ সেল আহিত করার জন্য সেই বিদ্যুৎ ইহার ভিতর দিয়া প্রায় ৩০ ঘণ্টা চালাইতে হয়। বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে সেলের মধ্যে নানা রকমের রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে। সে সব জটিল। ইহার ফলে এক প্রস্থ পাত লেড-অক্সাইড হইতে আরও বেশি অক্সিজেনযুক্ত লেড-পেরক্সাইড (Lead Peroxide) দ্বারা আবৃত হয়। ইহা হইল পজিটিভ বিদ্যুদ্দ্বার। অপর প্রস্থ পাত রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে স্পঞ্জের মত ছিদ্রবহুল হইয়া যায়। এই ভিন্ন রকমের দুই প্রস্থ পাতের মধ্যে যথেষ্ট বিদ্যুদ্বিভবের সৃষ্টি হয়। ফলে যখন তার দিয়া তড়িদ্দ্বার দুইটি যোগ করা হয় তখন পূর্বে আহিত করার জন্য যে দিক দিয়া বিদ্যুৎ চালনা করা হইয়াছিল তাহার বিপরীত দিক দিয়া বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। এই সেলের বিভব ২ ভোল্ট এবং ইহার রোধ খুব কম বলিয়া ইহা হইতে স্থির মাত্রায়

বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। পরীক্ষাগারে, মোটর গাড়িতে ও ট্রেনে ইহার ব্যবহার খুব বেশি।

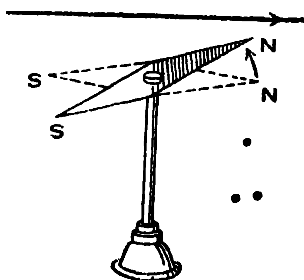
যে রাসায়নিক ক্রিয়ায় এই সেল হইতে বিদ্যুৎ ফিরিয়া পাওয়া যায় তাহার ফলে দুই প্রস্থ পাতের উপর একই পদার্থের আবরণ পড়িতে থাকে। তাহা হইল লেড সালফেট। তখন হইতে বিদ্যুৎ-প্রাবাহের মাত্রা কমিতে থাকে। কারণ তোমরা জান ভোল্টীয় সেলে ভিন্ন পদার্থের পাত না হইলে বিভবের সৃষ্টি হইতে পারে না।

পূর্ণ-আহিত অবস্থায় সালফিউরিক অ্যাসিডের আপেক্ষিক ঘনত্ব ১·২০। রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এই ঘনত্ব কমিয়া যখন ১·১৫ হয় তাহার পর আর সেলটি ব্যবহার করা উচিত নহে। ঐ অবস্থায় সেলের বিভবও কমিয়া যায়; পুনরায় আহিত করিয়া উহাকে কার্যক্ষম করিতে হয়।

(৪) জীবদেহের উপর ক্রিয়া—বিদ্যুদ্‌বাহী অনাবৃত তার স্পর্শ করিলে বিদ্যুৎ দেহের মধ্য দিয়া মাটিতে চলিয়া যায়। মনুষ্যদেহ ও মাটি বিদ্যুৎ-পরিচালক বলিয়া সেই পথে পূর্ণ বিদ্যুদ্‌বর্ত্মনীর সৃষ্টি হয়। অধিক শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালিত হইলে দেহের পেশি সঙ্কুচিত হয় বলিয়া শক্ (Shock) বা ঝাঁকুনি লাগে। শকের মাত্রা বেশি হইলে জীবের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

৫
তড়িৎ ও চুম্বকের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া
(Interaction of Electricity and Magnetism)

চুম্বকের উপর তড়িৎ-প্রবাহের ক্রিয়া—তোমরা পূর্বেই দেখিয়াছ তড়িদ্‌বাহী তার চুম্বক-কাঁটার উপরে রাখিলে চুম্বক-কাঁটাটি এক দিকে ঘুরিয়া যায়। তাহার পর তারটি চুম্বক-কাঁটার নীচে রাখিলে কাঁটাটি উল্টা দিকে ঘুরিয়া যায়।

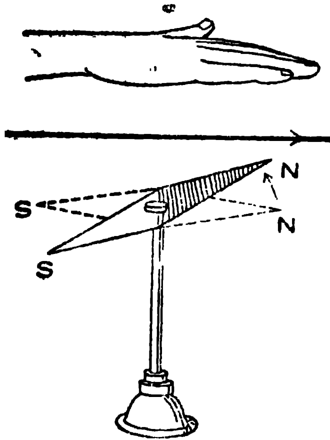


১৮৪নং চিত্র—চুম্বকের উপর তড়িৎ-প্রবাহের ক্রিয়া

পরীক্ষা—চুম্বক ও তড়িদ্‌বাহী তার বিভিন্ন অবস্থানে রাখিয়া চুম্বক-কাঁটা কোন দিকে ঘুরে লক্ষ্য কর। পরীক্ষায় এইরূপ ফল পাওয়া যায়ঃ

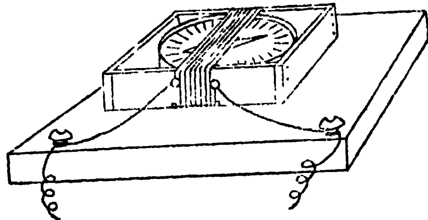
পরিবাহী তারের অবস্থান	তড়িৎ প্রবাহের দিক	চুম্বকের উত্তর মেরুর ঘূর্ণনের দিক
চুম্বকের উপর	দক্ষিণ হইতে উত্তর	পশ্চিম দিকে
চুম্বকের উপর	উত্তর হইতে দক্ষিণ	পূর্ব দিকে
চুম্বকের নীচে	দক্ষিণ হইতে উত্তর	পূর্ব দিকে
চুম্বকের নীচে	উত্তর হইতে দক্ষিণ	পশ্চিম দিকে

এই রকমের পরীক্ষা হইতে চুম্বক-কাঁটা ঘূর্ণনের এই নিয়মটি আবিষ্কৃত হইয়াছে : **ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি অন্য আঙুলগুলি হইতে প্রসারিত করিয়া তাহাদের সঙ্গে এক সমতলে রাখ। আঙুলগুলি তার-বরাবর প্রবাহের অভিমুখী কর। এবার হাতের তলা চুম্বক শলাকার দিকে মুখ করিয়া রাখিলে বৃদ্ধাঙ্গুলিটি যে দিকে থাকিবে চুম্বক-শলাকার উত্তর মেরু সেই দিকে ঘুরিবে। এই নিয়মটিকে দক্ষিণ হস্তের নিয়ম** (**Right hand Rule**) বলে।



১৮৫নং চিত্র—দক্ষিণ হস্তের নিয়ম

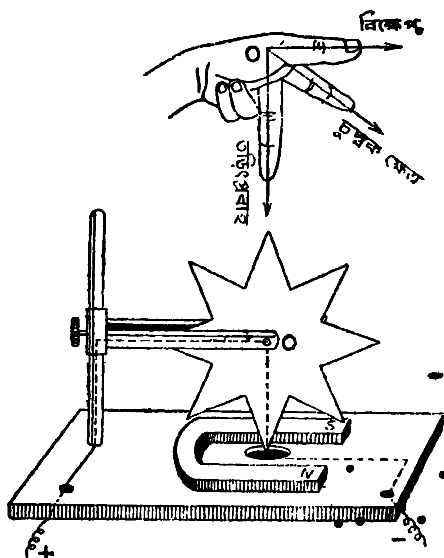
এই নিয়ম হইতে বা নিজে চুম্বক-কাঁটা ও তড়িদ্‌বাহী তার নিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে যে, তারটি ঘুরাইয়া চুম্বক-কাঁটার নীচ দিয়া সমান্তরাল ভাবে রাখিলে চুম্বক-কাঁটা একই দিকে ঘুরিবে। একটা লম্বা তার যত বেশি বার চুম্বক-কাঁটার চারিদিকে ঘুরাইয়া রাখা যাইবে বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে চুম্বক-কাঁটার ঘূর্ণনের মাত্রাও ততই বাড়িয়া যাইবে। খুব সামান্য বিদ্যুৎ-প্রবাহ একবার চুম্বক-কাঁটার চারিদিকে ঘুরিয়া তাহাকে স্থানচ্যুত করিতে নাও পারে। এরূপ ক্ষেত্রে তারের কুণ্ডলী


১৮৬ নং চিত্র—গ্যালভ্যানোমিটার

পাকাইয়া নিলে খুব সামান্য প্রবাহও চুম্বক-কাঁটাটি ঘুরাইতে পারিবে। এই নীতি অবলম্বন করিয়া তড়িৎ-মাপক যন্ত্র বা গ্যালভ্যানোমিটার (Galvanometer) তৈয়ারি করা হয়।

তড়িৎপ্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়া—নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র মতে তড়িৎপ্রবাহ যদি চুম্বক-মেরুর উপর ক্রিয়া করিতে পারে (যাহা আমরা পরীক্ষাদ্বারা দেখিতে পাইয়াছি) তবে চুম্বক-মেরুও তড়িৎপ্রবাহের উপর প্রতিক্রিয়া করিবে। ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইলে একটি চুম্বককে আটকা রাখিয়া একটি তড়িদ্‌বাহী তারের এক প্রান্ত আটকা ও অপর প্রান্ত মুক্ত রাখিতে হইবে, যাহাতে চুম্বকের প্রভাবে উহার কোন রূপ স্থানচ্যুতি ঘটিলে তাহা লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

পরীক্ষা—বার্লোর চক্র (Barlow's Wheel)—ইহার সাহায্যে বিদ্যুৎপ্রবাহের উপর চুম্বক শক্তির প্রভাব পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। ইহা একটি লম্বা দাঁতকাটা তামার চক্র; এমন ভাবে আটকানো আছে যে ইহা অনুভূমিক অক্ষের চারিদিকে স্বচ্ছন্দে ঘুরিতে পারে। চক্রের যে দাঁত যখন কেন্দ্র হইতে নীচের দিকে থাকে তখন তাহার অগ্রভাগ নীচে কাঠের বেদীতে সরু লম্বা গর্তে যে পারদ রাখা হইয়াছে তাহা স্পর্শ করিতে পারে। একটি শক্তিশালী চুম্বক বেদীর উপর এমন ভাবে আটকানো আছে যে উহার দুই মেরু



১৮৭নং চিত্র—বার্লোর চক্র

চক্র ও পারদের দুই দিকে রহিয়াছে। চিত্রে প্রদর্শিত মতে চক্র ও পারদ যথাক্রমে একটি ব্যাটারির পজিটিভ ও নেগেটিভ তড়িদ্‌দ্বারে সংযুক্ত

করিলে দেখা যাইবে যে চক্রটি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরিতেছে। তড়িৎ-প্রবাহ চক্রের কেন্দ্র O হইতে নিম্ন দিকে নামিয়া পারদের মধ্য দিয়া ব্যাটারিতে ফিরিয়া আসে। ঘূর্ণনের ফলে চক্রের একটি দাঁত পারদ হইতে উপরে উঠিয়া গেলে বর্ত্মনী খণ্ডিত হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু জাড্যধর্মের (inertia) দরুন চক্রের গতি বন্ধ না হইয়া যাওয়ায় পরবর্তী দাঁত পারদের স্পর্শে আসিয়া বর্ত্মনীতে তড়িৎপ্রবাহ অব্যাহত রাখে।

বিদ্যুৎ-শক্তির প্রভাবে, তড়িদ্‌বাহী তার কোন দিকে ঘুরিবে তাহা **বৈজ্ঞানিক ফ্লেমিংয়ের বাম হস্তের নিয়ম** (Fleming's Left Hand Rule) হইতে জানা যায়। তাহা এই : **বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী, তর্জনী ও মধ্যমা যথাসম্ভব বিস্তৃত করিয়া পরস্পরের সমকোণে রাখিয়া পরিবাহী তারের উপর এমন ভাবে ধরিতে হইবে যে মধ্যমা তড়িৎ-প্রবাহের দিক নির্দেশ করে এবং তর্জনী চুম্বকক্ষেত্রের অভিমুখে থাকে। তখন পরিবাহী তার বৃদ্ধাঙ্গুলির অভিমুখে বিক্ষিপ্ত হইবে।**

বার্লোর চক্রে তড়িৎ-প্রবাহের দিক হইল উপর হইতে নীচ দিকে; কাজেই মধ্যমা সে ভাবে রাখ। চুম্বকের বলরেখা উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরুর দিকে বিস্তৃত। তর্জনী সে দিকে অনুভূমিক ভাবে রাখ। তাহা হইলে বৃদ্ধাঙ্গুলি ডান দিকে মুখ করিয়া থাকিবে। চক্রের এক একটি দাঁত সেই দিকেই উঠিয়া পড়ে বলিয়া চক্রটি ঘড়ির কাঁটার উল্টা দিকে ঘুরিতে থাকে। ইহা হইল এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই বিদ্যুৎশক্তি হইতে যান্ত্রিক শক্তি পাওয়ার ব্যবস্থা হয়। ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই **বৈদ্যুতিক মোটর** আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে।

৬

তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ

(Electromagnetic Induction)

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্কবাসী বৈজ্ঞানিক ওয়েরস্টেড আবিষ্কার করেন যে তড়িৎপ্রবাহ চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে পারে। ফরাসী বৈজ্ঞানিক এম্পিয়ার এই বিষয়ে আরও গবেষণা করিয়া তড়িৎ-প্রবাহের ক্রিয়া সম্বন্ধে কতকগুলি সূত্র আবিষ্কার করেন। তখন হইতেই বিজ্ঞানীদের মনে প্রশ্নের উদয় হইল যে তড়িৎ-প্রবাহ হইতে যখন চৌম্বক ক্ষেত্র পাওয়া যায় তখন চৌম্বক ক্ষেত্র হইতে তড়িৎ-প্রবাহ পাওয়া যায় কিনা। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হন সেই যুগের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা-বিজ্ঞানী **মাইকেল ফ্যারাডে** (**Michael Faraday**)।

ফ্যারাডে লণ্ডনের এক জন কর্মকারের ছেলে ছিলেন। লেখাপড়া তিনি সামান্যই শিখিয়াছিলেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিকের জীবন আরম্ভ হয় যখন তিনি লণ্ডনের এক বিজ্ঞানাগারে যন্ত্রপাতি সাজাইবার কাজ নেন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি, সুদূরপ্রসারী কল্পনা-শক্তি এবং হাতে-কলমে পরীক্ষা করার আশ্চর্য নৈপুণ্য ছিল। অবসর সময়ে তিনি ওয়েরস্টেড ও এম্পিয়ারের পরীক্ষালব্ধ ফলগুলি পরীক্ষা দ্বারা যাচাই করিয়া দেখিতে লাগিলেন। পরে ভাবিলেন, যখন তড়িৎপ্রবাহ দ্বারা চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা যায় তখন চৌম্বক ক্ষেত্র হইতেও তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি সম্ভবপর।

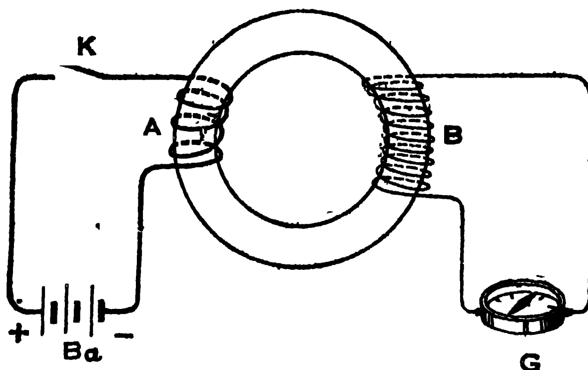


১৮৮নং চিত্র

মাইকেল ফ্যারাডে (১৭৯১-১৮৬৭)

ফ্যারাডের প্রথম পরীক্ষা— ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম স্টার্জিয়ন নামক এক বৈজ্ঞানিক প্রথম তড়িৎ-চুম্বক তৈয়ারী করেন। কোমল লোহার অশ্বক্ষুরাকৃতি একটি দণ্ডের উপর সুতা-জড়ানো তামার তার জড়াইয়া তড়িৎ-চুম্বকটি তৈয়ারি করা হইয়াছিল। ফ্যারাডে এই আবিষ্কারের সুযোগ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তিনি অশ্ব-

ক্ষুরাকৃতি দণ্ড না নিয়া কোমল লোহার একটি দণ্ড আংটার মত বাঁকাইয়া তাহার উপর তার জড়াইয়া এক দিকে একটি কুণ্ডলী গঠন করিলেন এবং তাহা ব্যাটারির সঙ্গে যোগ করিয়া দিলেন। ইহাতে লোহার আংটাটি



১৮৯নং চিত্র—ফ্যারাডে কর্তৃক তড়িৎ-চুম্বক হইতে তড়িৎ-উৎপাদন
A—মুখ্য কুণ্ডলী, B—গৌণ কুণ্ডলী, G—গ্যালভ্যানোমিটার, K—সুইচ

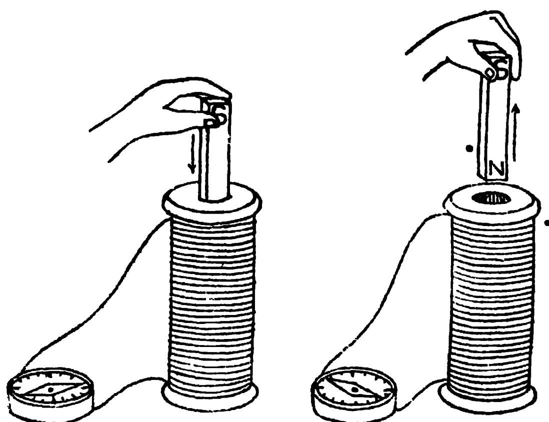
একটি তড়িৎ-চুম্বকে পরিণত হইল। আংটার অপর দিকে তার জড়াইয়া আর একটি কুণ্ডলী তৈয়ারি করিয়া তাহার দুই প্রান্ত একটি গ্যালভ্যানো-মিটার যন্ত্রের দুই প্রান্তে যোগ করিলেন। প্রথম কুণ্ডলী A হইল **মুখ্য কুণ্ডলী** (Primary Coil), আর দ্বিতীয় কুণ্ডলী B হইল **গৌণ কুণ্ডলী** (Secondary Coil)। সুইচ K হইল মুখ্য কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ চালানো বা বন্ধ করার ব্যবস্থা।

ফ্যারাডে দেখিতে পাইলেন, তিনি যখনই মুখ্য কুণ্ডলী দিয়া তড়িৎপ্রবাহ চালিত করিলেন ঠিক তখনই গৌণ কুণ্ডলীর গ্যালভ্যানোমিটারের কাঁটা এক দিকে মুহূর্তের জন্য ঘুরিয়া গেল। আবার যখন তিনি মুখ্য কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ করিয়া দিলেন ঠিক সেই সময় গ্যালভ্যানোমিটারের কাঁটা মুহূর্তের জন্য উল্টা দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। কোনও বর্ত্মনীতে গ্যালভ্যানো-মিটারের কাঁটা বিক্ষিপ্ত হইলেই বুঝিতে হইবে তাহাতে তড়িৎপ্রবাহ চলিতেছে। এক্ষেত্রে মুখ্য কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ চালিত করিবার এবং তাহাতে ছেদ ঘটাইবার সময় গৌণ কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়।

তোমরা জান কোন কোন জিনিস ঘষিলে স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। সেলের (Cell) সাহায্যে প্রবাহী বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। ফ্যারাডের

পরীক্ষা দ্বারা সম্পূর্ণ এক নূতন প্রণালীতে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের সন্ধান পাওয়া গেল। ফ্যারাডে যাহা ভাবিয়া ছিলেন তাহাই তিনি ঘটাইতে সমর্থ হইলেন।

দ্বিতীয় পরীক্ষা—প্রথম পরীক্ষার কিছু পরেই ফ্যারাডে ব্যাটারিযুক্ত মুখ্য কুণ্ডলী ব্যবহার না করিয়া আরও সহজ উপায়ে তড়িৎ-



১৯০নং চিত্র—স্থায়ী চুম্বক দ্বারা তড়িৎ-উৎপাদন

উৎপাদন করিতে সমর্থ হন। সলিনয়েডের আকৃতির *একটি তারের কুণ্ডলী* নিয়া তাহার দুই প্রান্ত গ্যালভ্যানোমিটারের সঙ্গে যোগ করিয়া নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলি করিলেন :

(১) একটি শক্তিশালী দণ্ড-চুম্বক (Bar Magnet) লইয়া ইহার যে কোন মেরু কুণ্ডলীর মধ্যে হঠাৎ প্রবেশ করাইয়া দিয়া দেখিলেন গ্যালভ্যানোমিটারের কাঁটা মুহূর্তের জন্য এক দিকে ঘুরিয়া গেল অর্থাৎ কুণ্ডলীতে এক দিকে এক মুহূর্ত তড়িৎপ্রবাহ চলিল।

(২) দণ্ড চুম্বকটি কুণ্ডলীর মধ্যে যে ভাবে ঢুকানো হইয়া ছিল সেই ভাবে রাখিয়া দিয়া দেখিলেন গ্যালভ্যানোমিটারের কাঁটা আর নড়িতেছে না অর্থাৎ কুণ্ডলীতে আর তড়িৎপ্রবাহ চলে না।

(৩) দণ্ড-চুম্বকটি কুণ্ডলীর মধ্য হইতে হঠাৎ টানিয়া বাহির করিয়া দেখিলেন গ্যালভ্যানোমিটারের কাঁটা পূর্বের তুলনায় উল্টা দিকে ঘুরিয়া গেল।

(৪) দণ্ড-চুম্বকটি খুব ধীরে ধীরে কুণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া বা

কুণ্ডলীর মধ্য হইতে বাহির করিয়া দেখা গেল গ্যালভ্যানোমিটারের কাঁটা প্রায় নড়িলই না অর্থাৎ কোন বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত হইল বলিয়া মনে হইল না।

(৫) চুম্বক যত দ্রুত কুণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করান হইয়াছে বা মধ্য হইতে বাহির করিয়া আনা গিয়াছে গ্যালভানোমিটারের কাঁটাও সেই পরিমাণে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ তড়িৎপ্রবাহের জোরও সেই পরিমাণে বাড়িয়াছে।

(৬) চুম্বকের উত্তর মেরু কুণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া বা কুণ্ডলী হইতে বাহির করিয়া আনিয়া যে যে দিকে গ্যালভ্যানোমিটারের কাঁটা ঘুরিতে দেখা গিয়াছে, দক্ষিণ মেরু নিয়া অনুরূপ পরীক্ষা করিয়া কাঁটা উল্টা দিকে ঘুরিতে দেখা গেল। ইহা হইতে বুঝা গেল উত্তর মেরু কুণ্ডলীতে ঢুকাইলে বা কুণ্ডলী হইতে বাহিরে আনিলে যে যে দিকে তড়িৎপ্রবাহ চলে দক্ষিণ মেরু নিয়া অনুরূপ পরীক্ষা করায় উল্টা দিকে তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়।

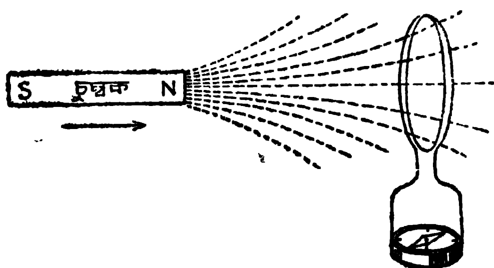
(৭) এবার চুম্বকটি আটকাইয়া রাখা হইল। কুণ্ডলীটি তাহার নিকটে আনিয়া চুম্বকটি তাহার মধ্যে ঢুকাইলে বা কুণ্ডলীটি বাহির করিয়া নিলে পূর্বের মত তড়িৎপ্রবাহ উৎপাদনের লক্ষণ দেখা গেল।

(৮) পরীক্ষা দ্বারা আরও দেখা গিয়াছে যে কুণ্ডলীতে তারের পাক কম থাকিলে যেরূপ তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয় পাক বেশি থাকিলে তাহা হইতে বেশি প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রথম পরীক্ষায় মুখ্য কুণ্ডলীতে ব্যাটারির সাহায্যে তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি করিয়া গৌণ কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করা হইয়া ছিল অর্থাৎ ব্যাটারির রাসায়নিক শক্তি গৌণ কুণ্ডলীর তড়িৎ-প্রবাহের উৎস ছিল।

দ্বিতীয় পরীক্ষায় দণ্ড-চুম্বক বা কুণ্ডলী হাত দিয়া পরস্পরের দিকে সরাইয়া আনায় বা পরস্পর হইতে দূরে নিয়া যাওয়ায় বিদ্যুৎপ্রবাহ পাওয়া গেল। এ ক্ষেত্রে বিদ্যুতের উৎস হইল যান্ত্রিক শক্তি (Mechanical Energy)। ইহা এক যুগান্তকর আবিষ্কার। ফ্যারাডের আবিষ্কৃত এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়াই তড়িতের প্রধান উৎস ডাইন্যামো নির্মিত হইয়াছে। ইহার সমতুল্য আর কোন তড়িতের উৎস এ পর্যন্ত আবিষ্কার করা সম্ভবপর হয় নাই।

তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ—তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ কি তাহা জানিবার পূর্বে **চৌম্বক আবেশ** কাহাকে বলে তোমাদিগকে মনে করাইয়া দেওয়া হইতেছে। কাঁচা লোহার একটি পেরেক লৌহচুর্ণের কাছে ধরিলে পেরেক চুর্ণকে আকর্ষণ করে না। কিন্তু ঐ অবস্থায় পেরেকের কাছে একটি দণ্ড-চুম্বকের মেরু আনিলে দেখা যায় যে পেরেকটিতে লৌহচূর্ণ লাগিয়াছে। দণ্ড-চুম্বক সরাইয়া নিলে লৌহচূর্ণ খসিয়া পড়িবে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চুম্বকের প্রভাবে কাঁচা লোহার পেরেক সাময়িক ভাবে চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহার নাম **চৌম্বক আবেশ** (Magnetic Induction)। ফ্যারাডে পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন চুম্বকের প্রভাবে সাময়িক ভাবে তড়িৎ-প্রবাহের উৎপত্তি হয়। এই জন্য এই ঘটনাকে **তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ** (Electromagnetic Induction) বলা হয় এবং ইহার ফলে যে ক্ষণস্থায়ী তড়িৎপ্রবাহের উৎপত্তি হয় তাহাকে **আবিষ্ট প্রবাহ** (Induced Current) বলে। এই প্রবাহের মূলে যে ক্ষণস্থায়ী তড়িচ্চালক বল (Electromotive force) রহিয়াছে তাহাকে **আবিষ্ট তড়িচ্চালক বল** (Induced Electromotive force) বলে।

এই তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের মূলে কি রহিয়াছে জানিবার জন্য পাশের চিত্রটি দেখ। প্রত্যেক চুম্বকের চারি দিকে চৌম্বক ক্ষেত্র আছে এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে চৌম্বকীয় বলরেখা (Magnetic lines of force) রহিয়াছে। ছবিতে কুণ্ডলীটি এক নির্দিষ্ট মাত্রার চুম্বক ক্ষেত্রে রহিয়াছে; তাহার ভিতর দিয়া যে পরিমাণ চৌম্বকীয় বলরেখা গিয়াছে তাহা দ্বারা ঐ চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিমাণ নির্দিষ্ট হইতেছে। চুম্বকটিকে কুণ্ডলীর দিকে সরাইলে বা কুণ্ডলী হইতে দূরে নিয়া গেলে তাহার মধ্যে আবিষ্ট প্রবাহ পাওয়া যায়। চুম্বকটি কুণ্ডলীর কাছে আনিলে কুণ্ডলী অপেক্ষাকৃত প্রবল চৌম্বক ক্ষেত্রে পড়ে; আবার চুম্বকটি দূরে সরাইয়া নিলে কুণ্ডলীতে চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য



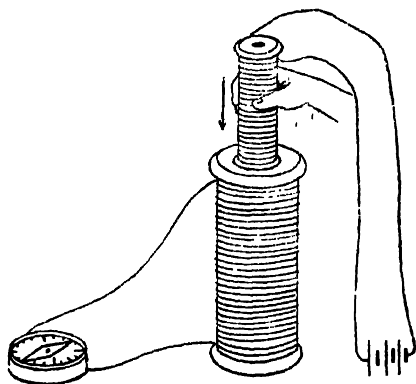
১৯১ নং চিত্র—কুণ্ডলীর ভিতর চৌম্বক বলরেখার বৃদ্ধি ও হ্রাস

কমিয়া যায়। সুতরাং আবেশের ফলে যে তড়িৎপ্রবাহের উৎপত্তি হয় তাহার মূল সূত্র এই ভাবে প্রকাশ করা যায়:

বদ্ধ বর্ত্মনীর ভিতরে চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটিলেই বর্ত্মনীতে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়।

তড়িৎবাহী কুণ্ডলী, যেমন সলিনয়েড চুম্বকের ন্যায় কাজ করে। চুম্বক ব্যবহার না করিয়া সলিনয়েডের সাহায্যেও আবিষ্ট প্রবাহ উৎপাদন করা যাইতে পারে।

পরীক্ষা—তড়িৎবাহী একটি কুণ্ডলী এবং গ্যালভ্যানোমিটার-সম্বলিত আর একটি কুণ্ডলী লও। প্রথমটি মুখ্য কুণ্ডলী ও দ্বিতীয়টি গৌণ কুণ্ডলী। মুখ্য কুণ্ডলীটি দ্রুত গৌণ কুণ্ডলীর মধ্যে ঢুকাইয়া দিলে গৌণ কুণ্ডলীতে আবিষ্ট প্রবাহ-উৎপাদনের জন্য গ্যালভ্যানোমিটারের কাঁটা বিক্ষিপ্ত হইবে। মুখ্য কুণ্ডলীটি দ্রুত টানিয়া বাহির করিলে উল্টা দিকে তড়িৎপ্রবাহ চলিবে।



১৯২ নং চিত্র—তড়িৎবাহী কুণ্ডলীর সাহায্যে আবিষ্ট প্রবাহ উৎপাদন

তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের সূত্র—পূর্বে যে সব পরীক্ষা করা হইয়াছে তাহা হইতে নিম্নলিখিত তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের সূত্র পাওয়া গিয়াছে।

(১) বদ্ধ বর্ত্মনীর মধ্য দিয়া চৌম্বক বলরেখার যখন পরিবর্তন ঘটে তখন বর্ত্মনীতে ক্ষণস্থায়ী তড়িৎপ্রবাহ আবিষ্ট হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই পরিবর্তন ঘটে ততক্ষণ পর্যন্তই তড়িৎপ্রবাহ চলে। বলরেখার সংখ্যা বাড়িলে যে-মুখী প্রবাহ পাওয়া যায়, সংখ্যা কমিলে প্রবাহ তাহার বিপরীত মুখী হয়।

(২) আবিষ্ট তড়িচ্চালক বল কুণ্ডলীর ভিতর দিয়া অতিক্রান্ত বলরেখার পরিবর্তনের হারের সমানুপাতিক।

এই সূত্র দুইটিকে **ফ্যারাডের সূত্র** বলে। ফ্যারাডের প্রথম সূত্র দ্বারা

আবেশের কারণ এবং দ্বিতীয় সূত্র দ্বারা আবিষ্ট তড়িচ্চালক বলের পরিমাণ পাওয়া যায়।

ডাইন্যামো (**Dynamo**)—ডাইন্যামো দুই রকম—(১) **পরিবর্তী-প্রবাহ-উৎপাদক** (Alternating Current Generator), এবং (২) **একমুখী-প্রবাহ-উৎপাদক** (Direct Current Generator)। ডাইন্যামোর প্রধান অংশ তিনটি :

(১) **ক্ষেত্রচুম্বক** (**Field Magnet**)—ইহার দুই মেরুর মধ্যে তীব্র চুম্বক-ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। ছোট ডাইন্যামোতে একটি স্থায়ী চুম্বক এবং বড় বড় ডাইন্যামোতে শক্তিশালী তড়িৎ-চুম্বক ব্যবহার করা হয়।

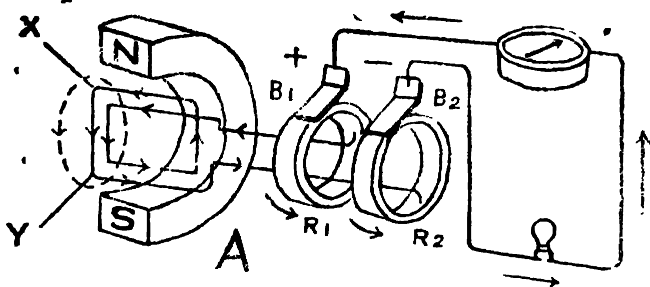
(২) **তড়িৎউৎপাদক কুণ্ডলী** বা **আর্মেচার** (**Armature**)—ইহা একটি নরম লোহার বেলনের উপর অক্ষের সমান্তরালে পাকানো তারের কুণ্ডলী। এই কুণ্ডলীর ভিতর দিয়া একটি অনুভূমিক দণ্ড থাকে। এই দণ্ডটিকে স্টীম বা অয়েল এঞ্জিন দ্বারা ঘুরাইলে কুণ্ডলীটি চৌম্বক ক্ষেত্রে খুব দ্রুত গতিতে ঘুরিয়া চৌম্বক বলরেখা ছেদ করিতে থাকে। ফলে ঐ কুণ্ডলীতে আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। ঝরনার জলের বা উচ্চে সংরক্ষিত জল ছাড়িয়া দিয়া তাহার চাপের সাহায্যেও আর্মেচার ঘুরানো হইয়া থাকে।

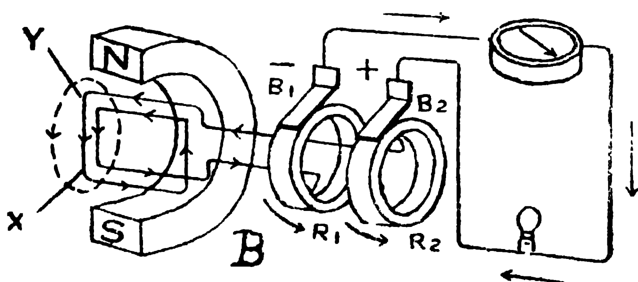
(৩) **তড়িৎ-সংগ্রাহক আংটা** (**Slip-Ring**) ও **ব্রাস** (**Brush**)।

(১) **পরিবর্তী-প্রবাহ-উৎপাদক**—পর পৃষ্ঠার চিত্রে দুই প্যাঁচের একটি কুণ্ডলীর চুম্বকক্ষেত্রে ঘূর্ণন দেখানো হইয়াছে। কুণ্ডলীর উপরে x ও y চিহ্নিত দুইটি বিন্দু নেও এবং ইহাদের মধ্যে তড়িৎ কোন্ দিকে প্রবাহিত হয় লক্ষ্য কর। কুণ্ডলীর দুইটি প্রান্ত দুইটি আংটা বা বলয়ের (ছবিতে R_1, R_2) সঙ্গে আটকানো আছে। সেজন্য কুণ্ডলীটি ঘুরিবার সময় বলয় দুইটিও ঘুরে। বলয় দুইটির উপর দুইটি কার্বন বা ধাতব ব্রাস (B_1, B_2) চাপাইয়া বসানো আছে। এই ব্রাস দুইটি বাহিরের কোন বর্ত্মনীর দুই প্রান্তে যোগ করিলে ঐ বর্ত্মনীতে কিরূপ প্রবাহ চলিবে তাহাই এখন দেখা যাইবে।

চৌম্বক ক্ষেত্রে কুণ্ডলী ঘুরিতে থাকিলে ইহার মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত চৌম্বক বলরেখার সংখ্যা দ্রুত পরিবর্তিত হইবে। মনে কর, চিত্রের A অংশে বর্ত্মনীর

x বিন্দু চিত্রে প্রদর্শিত পথে ঘুরিয়া তোমার দিকে আসিতেছে। যখন x বিন্দু ঘুরিয়া y বিন্দুর স্থানে নামিয়া আসিবে তখন একটা সম্পূর্ণ ঘূর্ণনের অর্ধেক





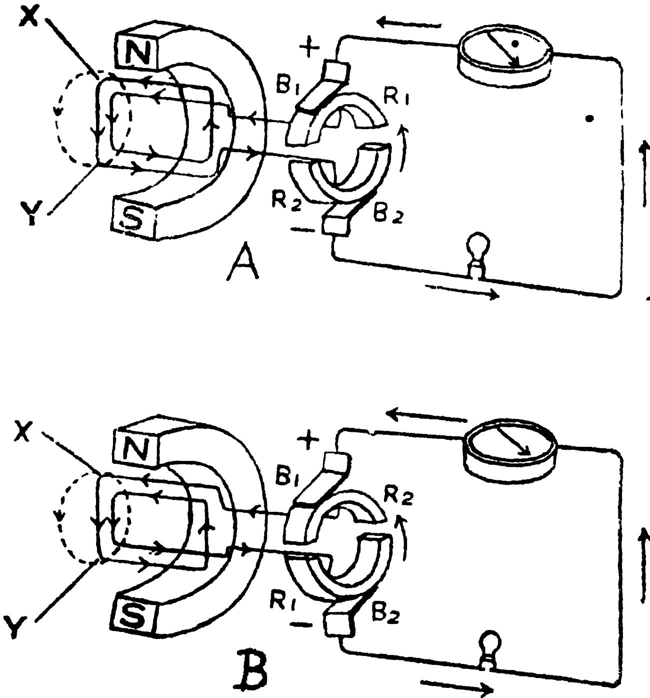
১৯৩নং চিত্র—পরিবর্তী-প্রবাহ-উৎপাদক

ঘোরা হইবে। চিত্রের B-অংশে সেই অবস্থান দেখানো হইতেছে। এই অর্ধেক ঘূর্ণনের পূর্বে A-অবস্থানে কুণ্ডলীর ভিতর দিয়া তড়িৎ যে-দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া ছিল B-অবস্থানে তাহার বিপরীত দিক দিয়া প্রবাহিত হইবে। A-অবস্থানে তড়িৎ x বিন্দু হইতে y বিন্দুর দিকে প্রবাহিত হয়, আর B-অবস্থানে তড়িৎ y বিন্দু হইতে x বিন্দুর দিকে প্রবাহিত হইতেছে। তড়িৎপ্রবাহের দিক্‌পরিবর্তনের কারণ এই যে কুণ্ডলীর ঘূর্ণনের ফলে চৌম্বক বলরেখাকে উহা যে দিক দিয়া ছেদ করে সেই দিকের ক্রমাগতই পরিবর্তন হয়। সেজন্য কুণ্ডলীটি সম্পূর্ণ এক বার ঘুরিয়া আসিলে অর্ধেক সময় যে দিকে তড়িৎপ্রবাহ চলে, বাকি অর্ধেক সময় তাহার বিপরীত দিক দিয়া চলিয়া থাকে।

এখন বাহিরের বর্ত্মনীতে তড়িৎপ্রবাহের দিক কি হইবে লক্ষ্য কর। কুণ্ডলীর A-অবস্থানে প্রবাহ B_2 ব্রাস হইতে বাহিরের বর্ত্মনীতে গিয়া B_1 ব্রাস

দিয়া ফিরিয়া আসে। আর কুণ্ডলীর B-অবস্থানে প্রবাহ B_1 ব্রাস হইতে বাহিরের বর্ত্মনীতে চলিয়া B_2 ব্রাস দিয়া ফিরিয়া আসে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে কুণ্ডলীটির প্রথম অর্ধ ঘূর্ণনে বাহিরের বর্ত্মনীতে যে অভিমুখে তড়িৎ প্রবাহ চলে পরবর্তী অর্ধ ঘূর্ণনে প্রবাহ তাহার বিপরীত অভিমুখে চলে। এই ভাবে ডাইন্যামো দ্বারা পরিবর্তী প্রবাহের উৎপত্তি হয়।

(২) একমুখী-প্রবাহ-উৎপাদক—একমুখী-প্রবাহ-উৎপাদকের আর্মেচারও একটি বিষয় ছাড়া পূর্বের প্রণালীতেই তৈয়ারি করিতে হয়।



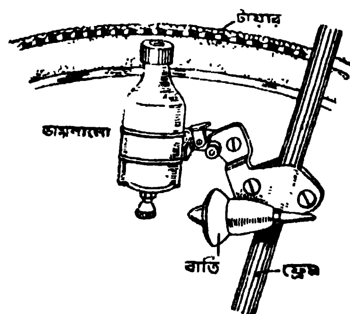
১১৪নং চিত্র—একমুখী-প্রবাহ-উৎপাদক

ইহা হইল এই যে, এ ক্ষেত্রে বাহিরের বর্ত্মনীর তড়িৎ-সংগ্রহের জন্য দুইটি বলয় ব্যবহার না করিয়া কুণ্ডলীর দুই প্রান্ত একটি খণ্ডিত বলয় কমিউটেটারের (Split ring Commutator) দুই অংশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। কুণ্ডলীর সঙ্গে সঙ্গে কমিউটেটারও ঘুরিয়া যায়, কিন্তু ব্রাস একই স্থানে থাকে। পরিবর্তী-প্রবাহ-উৎপাদকের কুণ্ডলীতে যে ভাবে তড়িৎপ্রবাহ আবিষ্ট হয় একমুখী-

প্রবাহ-উৎপাদকের কুণ্ডলীতেও প্রবাহ ঠিক একই ভাবে আবিষ্ট হয়। কুণ্ডলীর x বিন্দু যখন ঘুরিয়া তোমার দিকে আসিতে থাকে তখন আবিষ্ট প্রবাহ B_2 ব্রাস দিয়া বাহিরের বর্ত্মনীর দিকে যায়। x ও y বিন্দুর মধ্যে যখনই ঐ প্রবাহের দিক পরিবর্তন আরম্ভ হয় তখনই কমিউটেটারের প্রত্যেকটি খণ্ড একটি ব্রাস ছাড়িয়া অপর ব্রাসের সঙ্গে গিয়া সংযোগ সাধন করে। যখনই কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহের দিকের পরিবর্তন হয় তখনই খণ্ডিত কমিউটেটার-দুইটি উল্টা দিকের ব্রাসের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ফলে তড়িৎ প্রবাহ B_2 ব্রাস দিয়াই বাহিরের বর্ত্মনীতে যাইতে থাকে। এভাবে বাহিরের বর্ত্মনীতে একমুখী তড়িৎপ্রবাহই পাওয়া যায়।

বড় বড় ডাইন্যামো হইতে খুব উচ্চ বিভবের তড়িৎ-উৎপাদন করিয়া সেই বিভব প্রয়োজন মত কমাইয়া আলোক ও তাপ উৎপাদন এবং ইলেকট্রিক মোটর চালনার জন্য বিতরণ করা হয়।

বাইসাইকেলে ডাইন্যামো—বাড়ীঘরে নানা কাজে ছোট ছোট ডাইন্যামো ব্যবহার করা হয়। তোমরা অনেকেই বোধ হয় বাই-সাইকেলের ডাইন্যামো দেখিয়াছ। ইহা কি ভাবে বাইসাইকেলের সঙ্গে লাগানো থাকে ছবিতে দেখ। ইহার ভিতরে একটি স্থায়ী চুম্বকের মধ্যে তারের কুণ্ডলী বা আর্মেচার রহিয়াছে। আর্মেচারের এক দিক চাকার সঙ্গে লাগানো থাকায় চাকার ঘূর্ণনের সঙ্গে আর্মেচারটিও ঘুরিয়া থাকে। ফলে আবিষ্ট তড়িৎ উৎপন্ন হয়। ঐ তড়িতের সাহায্যে বাইসাইকেলের আলো জ্বালানো এবং হর্ন বাজানো হইয়া থাকে।



'৬০ নং চিত্র—বাইসাইকেলে ডাইন্যামো

'মোটর' গাড়িতে আরও বড় ডাইন্যামো আছে। ঘূর্ণায়মান এঞ্জিনের সঙ্গে বেল্টের সাহায্যে আর্মেচার সংযুক্ত করিয়া উহা ঘুরানো হয়। মোটর গাড়িতে আলো জ্বালানো ও অন্যান্য কাজের জন্য স্টোরেজ সেল ব্যবহার করা হয়। ঐ স্টোরেজ সেল আহিত (charged) করার জন্য ডাইন্যামো হইতে উৎপাদিত তড়িৎ ব্যবহার করা হয়।

৭

তড়িৎ-শক্তির ব্যবহার

বর্তমান সভ্য জগতে তড়িৎ-শক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। তড়িৎ আলো জ্বালায় ও তাপ প্রদান করে, বাড়িতে পাম্প, পাখা, রেডিও প্রভৃতি চালায়। কলকারখানায় বহুবিধ আয়াসসাধ্য কাজ তড়িতের সাহায্যে অনায়াসে ও অল্প সময়ের মধ্যে করা হইয়া থাকে। তড়িৎ হইতে যে এত রকমের কাজ পাওয়া যায় তাহা ভাবিলেই বুঝা যায় তড়িতের কত শক্তি।

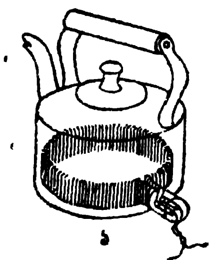
তড়িৎ যখন **শক্তি** তখন তাহার কাজ করিবার **ক্ষমতা** (Power) আছে। এই ক্ষমতা মাপিবার একটি একক (Unit) থাকিবে। এক **ভোল্ট** (Volt) তড়িচ্চালক শক্তির বলে এক **এম্পিয়ার** (Ampere) তড়িৎপ্রবাহ একক সময় অর্থাৎ এক সেকেণ্ড কাল চালিত হইলে যে পরিমাণ কাজ করা হয় তাহা হইল তড়িৎ-ক্ষমতার মাপ। তাহার নাম **ওয়াট** (Watt)। ওয়াট একটি খুব ছোট একক বলিয়া ১০০০ ওয়াট বা **কিলোওয়াট** (Kilowatt) কে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একক বলিয়া ধরা হয়। বাড়িতে তড়িৎ-শক্তি ব্যবহার করিবার জন্য যে মূল্য দিতে হয় তাহা আবার আর একটি একক বা ইউনিটের হিসাবে দেওয়া হয়। সেই ইউনিট হইল **কিলোওয়াট-ঘণ্টা** (Kilowatt-hour)। বাড়ীতে বা কারখানায় কোন নির্দিষ্ট সময়ে কত ইউনিট তড়িৎ-শক্তি ব্যয়িত হইল তাহা ইলেকট্রিকের মিটার (Meter) দেখিয়া জানিতে হয়।

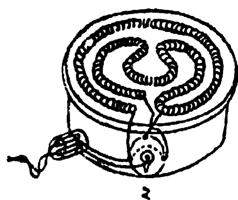
শক্তির উৎসরূপে তড়িতের নানা প্রকার ব্যবহারিক প্রয়োজন সম্বন্ধে এখন আলোচনা করা হইবে।

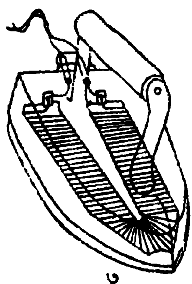
(১) তাপ-উৎপাদক যন্ত্র—কোন কোন ধাতুর তারের ভিতর দিয়া তড়িৎপ্রবাহ চালনা করিলে উহা বেশ উত্তপ্ত হইয়া উঠে। তার যতই সরু হয় তাপের মাত্রাও তত বেশি হয়। পরিবাহী তারের রোধের (Resistance) জন্যই তাপের সৃষ্টি হয়। তড়িৎপ্রবাহের সময় মুক্ত ইলেকট্রনসমূহ দ্রুত ধাবিত হইয়া পদার্থের অণুগুলিকে খুব জোরে ধাক্কা দেয়। ফলে অণুগুলির গতীয় শক্তি বাড়িয়া যায় এবং অধিক তাপ উৎপন্ন হয়।

আজকাল গৃহকার্যে কেহ কেহ নানা প্রকারের তাপ-উৎপাদক যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে **বৈদ্যুতিক হিটার** (Electric Heater),

বৈদ্যুতিক কেটলি (Electric Kettle), বৈদ্যুতিক স্টোভ (Electric Stove), বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি (Electric Iron) ই বেশি প্রচলিত। এই সব গুলি যন্ত্র একই মূলনীতি অনুসারে প্রস্তুত করা হইয়াছে। কোন তাপসহ অথচ তড়িৎ-রোধক বস্তুর, যেমন অভ্র, ফায়ার-ক্লে (Fire clay) প্রভৃতির পাতের (Plate) উপর উচ্চরোধযুক্ত নাইক্রোমের (Nicrome) সরু তারের কুণ্ডলী জড়ানো হয়। নাইক্রোম হইল নিকেল, ক্রোমিয়াম ও লৌহ মিশ্রিত একটি সঙ্কর ধাতু। ইহার কুণ্ডলীর ভিতর দিয়া উচ্চ বিভবের বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইলে যে-তাপ উৎপন্ন হয় তাহাই হইল তাপ-উৎপাদক যন্ত্রগুলিতে তাপের উৎস। তোমরা এই সকল যন্ত্র কি ভাবে ব্যবহার করিতে হয় হাতে কলমে শিখ। বৈদ্যুতিক হিটারে জল ও দুধ গরম করা, চা তৈয়ারি করা এবং সাধারণ রান্নার কাজও চলিতে পারে। বেশি লোকের জন্য রান্না করিতে হইলে বৈদ্যুতিক স্টোভ ও বৈদ্যুতিক উনান ব্যবহার করিতে হয়। হিটার গুলিতে পরিবাহী আঁকা বাঁকা তার দেখিতে পাও। উনান গুলির বেলায় তারের কুণ্ডলী প্লেট বা পাত দিয়া সাধারণত ঢাকা থাকে। বাক্সের আকারে উনান তৈয়ারি করা হয়। ইহার বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে তাপ-নিয়ন্ত্রণ করিয়া বিভিন্ন রকমের খাদ্য রান্না করা যায়। সব রকমের তাপ-উৎপাদক যন্ত্রগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে রান্নার পাত্র সরাসরি উত্তপ্ত তারের সংস্পর্শে আসে না। উৎপাদিত তাপ বিকীর্ণ হইয়া রান্নার পাত্র ও খাদ্যবস্তুতে সঞ্চালিত হয়।







১১৮ নং চিত্র—১। বৈদ্যুতিক কেটলি, ২। বৈদ্যুতিক হিটার, ৩। বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি

(২) বৈদ্যুতিক বাতি—তোমরা পূর্বে দেখিয়াছ কোন পরিবাহী তারের ভিতর দিয়া তড়িৎপ্রবাহ চালাইলে তারটি উত্তপ্ত হয়। যে পদার্থের

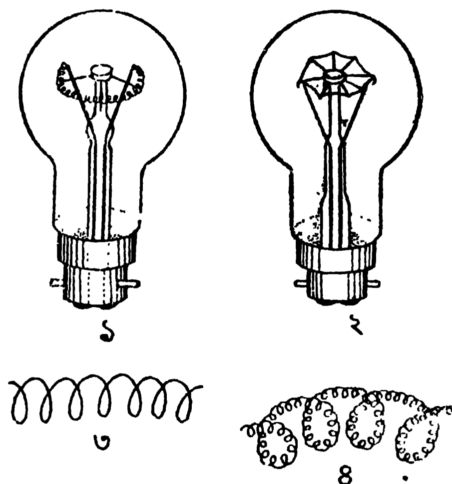
রোধ বেশি সেই পদার্থের তার যদি সূক্ষ্ম তন্তুর (filament) মত হয় তবে তাহার ভিতর দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হইলে সূক্ষ্ম তারটি খুব বেশি উত্তপ্ত হইয়া ভাস্বর হয় এবং আলো দিতে থাকে। উত্তপ্ত তন্তু হইতে বেশির ভাগ তড়িৎশক্তিই উত্তাপের আকারে বাহির হইয়া যায়। অতি সামান্য অংশই আলোকশক্তিতে পরিণত হয়। তন্তুর উষ্ণতা যত বাড়ানো যায় ততই বেশি অনুপাতে আলোক ও কম অনুপাতে তাপ উৎপন্ন হয়। আর কম উষ্ণতায় যে আলোক উৎপন্ন হয় তাহা কতকটা হলদে রঙের। খুব বেশি উষ্ণতায় বাতির তন্তু হইতে প্রায় সাদা আলোই পাওয়া যায়। কাজেই বৈদ্যুতিক বাতির তন্তু এমন পদার্থের হওয়া চাই যাহার গলনাঙ্ক খুব উচ্চ। বাতির উষ্ণতা যতই বাড়ানো হউক না কেন বৈদ্যুতিক শক্তির শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ তাপশক্তি রূপে নষ্ট হইয়া যায়, আর আলোক পাওয়া যায় অবশিষ্ট মাত্র ২ ভাগ হইতে।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকান বৈজ্ঞানিক **এডিসন** সূতা পুড়াইয়া তাহা হইতে কার্বনের তন্তু তৈয়ারি করেন এবং ঐ তন্তু বায়ুশূন্য বাল্বের মধ্যে আটকাইয়া বৈদ্যুতিক বাতি প্রস্তুত করেন। কার্বনের তন্তু দ্বারা ৭৫০° সেন্টিগ্রেডের বেশি উষ্ণতায় পৌছা যায় নাই, কারণ ঐ উষ্ণতায় কার্বন বাষ্পে পরিণত হইয়া যায়। তড়িৎশক্তির তুলনায় ঐ বাতি হইতে বেশি আলোক উৎপন্ন না হওয়ায় এবং আরও নানা কারণে ঐ প্রকারের বাতি বর্তমানে আলোক উৎপাদনের জন্য আর ব্যবহার করা হয় না।

ইহার পরে টাংস্টেন (Tungsten) নামক ধাতুর তন্তু বাতিতে ব্যবহার করাতে ইহার বিশেষ উন্নতি হইল। ইহার গলনাঙ্ক আরও অনেক উচ্চ, প্রায় ৩৪০০° সেন্টিগ্রেড। বর্তমান কালে বাল্ব বায়ুশূন্য না করিয়া ইহাতে নাইট্রোজেন ও আর্গন, এই দুইটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মিশ্রণ রাখা হয়। ইহার ভিতর টাংস্টেনের ফিলামেন্ট ব্যবহার করিয়া খুব বেশি উষ্ণতায় প্রায় সাদা আলো পাওয়া যায়।

আজকাল বাল্বের ভিতরে ফিলামেন্টের বিন্যাসেও অনেক উন্নতি হইয়াছে। সোজা তার দিয়া ফিলামেন্ট তৈয়ারি করিলে উহার উষ্ণতা যত হইতে পারে ফিলামেন্টটি কুণ্ডলী-পাকানো হইলে তাহার উষ্ণতা আরও বেশি হয়; কারণ কুণ্ডলী-পাকানো অবস্থায় তার হইতে কম তাপ পরিচালিত ও পরিবাহিত হইয়া থাকে। ফলে ফিলামেন্ট খুব উচ্চ-

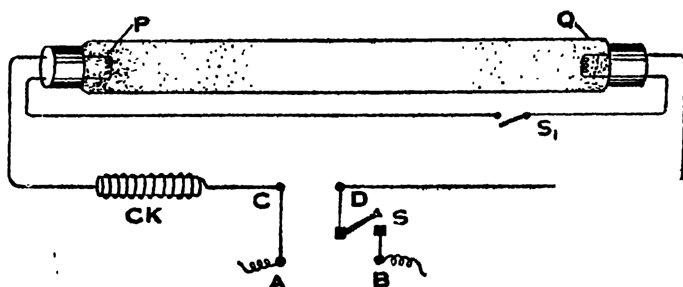
উষ্ণতায় অনেক বেশি আলো দিতে পারে। কোন কোন বাল্‌বে দুই বার



১২৭ নং চিত্র—১। বাল্‌বে কুণ্ডলী-পাকানো ফিলামেণ্ট ২। বাল্‌বে সোজা ফিলামেণ্ট
৩। কুণ্ডলী-পাকানো ফিলামেণ্ট ৪। দুইবার কুণ্ডলী-পাকানো ফিলামেণ্ট

কুণ্ডলী-পাকানো ফিলামেণ্ট ব্যবহার করা হয়। ইহাতে উষ্ণতা আরও বাড়িয়া যায়।

(৩) **প্রতিপ্রভ দীপ (Fluorescent Lamp)**—তোমরা অনেকেই আজকাল প্রতিপ্রভ দীপ বা ফ্লুরেসেণ্ট বাতি দেখিয়া থাকিবে। বাল্‌বের



১২৮নং চিত্র—প্রতিপ্রভ দীপ

পরিবর্তে ইহাতে একটি প্রায় ১'৫ ইঞ্চি মোটা এবং ২ হইতে ৪ ফুট লম্বা নল থাকে। চিত্রে ইহার দুই প্রান্তে দুইটি প্যাঁচানো ফিলামেণ্ট P ও Q রহিয়াছে। ঐ ফিলামেণ্ট দুইটির এক এক প্রান্ত S_1 সুইচের ভিতর দিয়া যুক্ত করা যায় বা তাহাদের ভিতরে ছেদ ঘটানো যায়। ফিলামেণ্ট দুইটির

অপর দুই প্রান্ত তড়িৎ-সরবরাহের প্রধান তারের দুই প্রান্ত A ও B এর সহিত প্রধান সুইচ S-এর ভিতর দিয়া যুক্ত। সরবরাহের তড়িৎ পরিবর্তী (Alternating) হইলে উহাতে একটি চোক (Choking Coil) B দিতে হয়। ইহা কম রোধের একটি কুণ্ডলী। ইহার সাহায্যে বর্ত্মনীতে আবিষ্ট তড়িতের সৃষ্টির ফলে একমুখী প্রবাহ পাওয়ার ব্যবস্থা হয়। নলটি বায়ুশূন্য করিয়া তাহার ভিতরে সামান্য পরিমাণে আর্গন বা অন্য নিষ্ক্রিয় গ্যাস রাখা হয়। নলের ভিতরের দিকে প্রতিপ্রভ পদার্থের (Phosphor) প্রলেপ দেওয়া হয় এবং ইহার ভিতরে এক ফোঁটা পারদও রাখা হয়।

প্রধান সুইচ S টিপিয়া দিয়া নলের ভিতর দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালাইবার পূর্বে অপর সুইচ S_1 বন্ধ রাখিতে হয়। তাহা হইলে তড়িৎ প্রথমে নলের ভিতর দিয়া না গিয়া S_1 সুইচের পথ দিয়া চলিতে পারিবে। তড়িৎ-প্রবাহের ফলে কুণ্ডলী P এবং Q উত্তপ্ত হইলে নলে পারদের বাষ্পের মাত্রা বৃদ্ধি পাইবে। ইহাতে নলের ভিতর দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চলার সুবিধা হইবে। ইহা ছাড়া উষ্ণ কুণ্ডলী হইতে ইলেকট্রন নির্গত হওয়ায় নলের ভিতরে তড়িৎ-প্রবাহ চলার আরও সুবিধা হইবে। এই অবস্থায় বর্ত্মনীর S_1 সুইচটি খুলিয়া দিয়া কুণ্ডলীর প্রবাহে ছেদ ঘটানো হয়। তখন প্রবাহ বাষ্পের ভিতর দিয়া চলিতে থাকে এবং বাষ্প হইতে উজ্জ্বল আলো বাহির হয়। S_1 সুইচটিকে স্টার্টার সুইচ (Starter Switch) বলে, কারণ ইহার সাহায্যে দীপের কাজ আরম্ভ করিতে হয়।

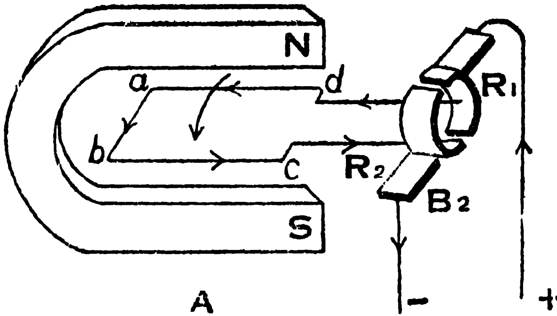
তোমরা জান সাদা আলোতে বিভিন্ন রঙের রশ্মির সমাবেশ থাকে। তাহা ছাড়া ইহাতে অদৃশ্য অতিবেগনি রশ্মিও (Ultra-violet Rays) আছে। পারদ বাষ্পের ভিতর দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চলিলে এই রশ্মির যথেষ্ট উদ্ভব হয় এবং তাহা প্রতিপ্রভ পদার্থে শোষিত হইয়া নীলাভ প্রায় সাদা আলো দিতে থাকে। ফলে সমস্ত নলটি হইতেই অত্যুজ্জ্বল আলো পাওয়া যায়। প্রতিপ্রভ পদার্থের ধর্ম এই যে উহারা এক রকমের রশ্মি শোষণ করিয়া অপর রঙের রশ্মি নির্গত করিতে পারে।

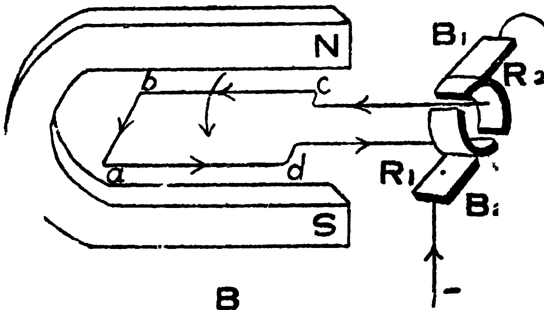
কুণ্ডলী-পাকানো ফিলামেণ্ট দ্বারা বাল্‌ব তৈয়ারি করিয়া প্রতি ওয়াট তড়িৎ হইতে যে পরিমাণ আলো পাওয়া যায় প্রতিপ্রভ দীপ হইতে তাহার তিন গুণ আলো পাওয়া যাইতে পারে। কারণ প্রতিপ্রভ দীপে বাল্‌বের বাতির চেয়ে তড়িতের অনেক বেশি অংশ আলোকে এবং কম অংশ তাপে পরিবর্তিত

হয়। এই জন্ত প্রতিপ্রভ দীপ বাল্‌বের বাতির মত উত্তপ্ত হয় না। ইহা হইতে কম খরচে অধিক সাদা আলো বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া আজকাল বাড়ি-ঘরে ও দোকান-পাটে ইহার ব্যবহার খুব বাড়িয়া গিয়াছে।

(৩) **বৈদ্যুতিক মোটর** (Electric Motor)—বৈদ্যুতিক শক্তিকে বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। ইহার গঠনপ্রণালী ডাইন্যামোর মতই, তবে ইহার কার্যপ্রণালী বিপরীত। ডাইন্যামোর মত ইহার প্রধান অংশ হইল—(১) **স্থায়ী চুম্বক বা তড়িৎ-চুম্বক, (২) তড়িদ্‌বাহী কুণ্ডলী বা আর্মেচার, (৩) কমিউটেটার ও (৪) বাহিরের তড়িৎ-উৎসের সঙ্গে সংস্পর্শ রাখিবার ব্রাস।**

ইহার কার্যপ্রণালী বার্লোর চক্রের কার্যপ্রণালীর মত। ছবিতে A-অবস্থানে আর্মেচারের একটি প্যাঁচ a b c d-র ভিতর দিয়া কোন দিকে তড়িৎ





১৯৯ নং চিত্র—বৈদ্যুতিক মোটর

প্রবাহিত হইতেছে দেখ। প্যাঁচের ad অংশ চুম্বকক্ষেত্রে কোন্ দিকে ঘুরিবে জানার জন্ত বাম হস্তের নিয়ম প্রয়োগ কর। দেখা যাইবে ad অংশ ঘুরিয়া

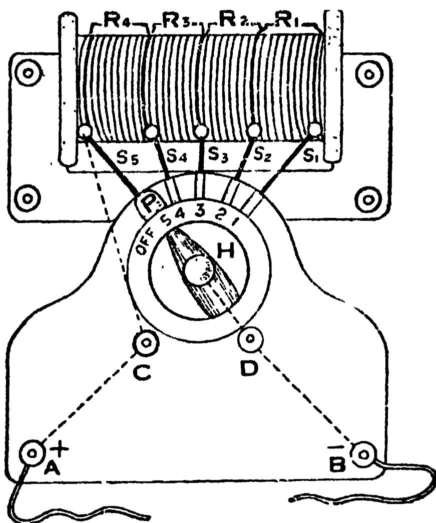
তোমার দিকে আসিয়া চুম্বকের দক্ষিণ-মেরুর অভিমুখী হইবে; ছবিতে B-অবস্থান দেখ। প্যাচটি উত্তর মেরুর দিক হইতে দক্ষিণ মেরুর দিকে আসিবার সময় যে অবস্থানে কাগজের তলের সঙ্গে খাড়া ভাবে থাকিবে তখন চুম্বক-বলরেখাগুলি উহাকে লম্ব ভাবে ছেদ করিবে। সেই সময় R_1 ও R_2 কমিউটেটার দুইটি পরস্পরের স্থান বদল করিয়া ফেলায় তড়িৎ-প্রবাহের দিক উল্টিয়া যাইবে। A-অবস্থানে তড়িৎ-প্রবাহ d হইতে a-র দিকে ছিল। B-অবস্থানে তাহা ঘুরিয়া a হইতে d-র দিকে চলিবে। বাম হস্তের নিয়ম এই অবস্থানে আবার প্রয়োগ করিলে দেখিবে যে কুণ্ডলীটি একই দিকে আরও ১৮০° কোণে ঘুরিবে। এই ভাবে ঘুরার ফলে ad অংশ দক্ষিণ মেরুর দিক হইতে আবার উত্তর মেরুর দিকে আসিবে। তাহার পর প্রবাহের দিক আবার উল্টিয়া যাইবে। এভাবে কুণ্ডলী অনবরত ঘুরিতে থাকিবে। ডাইন্যামোর আর্মেচারের মত বেলনের আকারের লৌহখণ্ডের উপর বহুবার তার জড়াইয়া মোটরের আর্মেচার তৈয়ারি করা হয়।

উপরে যে মোটরের কার্য-প্রণালী বুঝানো হইল তাহা একমুখা-তড়িৎ দ্বারা চালিত হয়। পরিবর্তী-তড়িৎ দ্বারা যে-মোটর চালানো হয় তাহার গঠনপ্রণালী কতকাংশে পৃথক। মোটর দ্বারা বৈদ্যুতিক শক্তি হইতে যে যান্ত্রিক শক্তি উৎপন্ন হয় তাহার সাহায্যে পাখা ঘুরানো বা যন্ত্রাদি চালনা করা হয়।

বৈদ্যুতিক পাখার নিয়ামক (Regulator of Fan)—মোটরের ঘূর্ণ্যমান অংশের সঙ্গে পাখার ফলক আটকাইয়া মোটর চালাইলে ফলক গুলি জোরে ঘুরিতে থাকিবে। এভাবে যথেষ্ট হাওয়া পাওয়া যায়। মোটরের আর্মেচারে তড়িৎ-প্রবাহ বাড়াইলে বা কমাইলে মোটর দ্রুত বা মন্থর গতিতে ঘুরিয়া থাকে। তড়িৎ-প্রবাহ বাড়াইয়া বা কমাইয়া পাখা যাহাতে প্রয়োজন মত দ্রুত বা মন্থর গতিতে চালানো যায় সেজন্য পাখার সঙ্গে একটি **নিয়ামক বা রেগুলেটার** থাকে।

একটি পাখার রেগুলেটার খুলিয়া ইহার গঠন ও কার্যপ্রণালী বুঝিবার চেষ্টা কর। বাহিরের তড়িৎ উৎসের দুই প্রান্তের সঙ্গে মোটরের আর্মেচারের দুই প্রান্ত যোগ করিতে হয়। সেই বর্ত্মনীর মধ্যে রেগুলেটারটি জুড়িয়া দিতে হইবে। রেগুলেটারের হাতলটি (চিত্রে H) ঘুরাইয়া 1 হইতে 2, 3, 4, 5 প্রভৃতি ঘরে নিয়া গেলে মোটরের ভিতর তড়িৎ-প্রবাহ ক্রমশ বাড়িয়া যায়। হাতলটি ঘুরাইয়া OFF স্থানে নিলে তড়িৎ-প্রবাহে ছেদ ঘটে এবং পাখা

বন্ধ হইয়া যায়। ইহার কার্য-প্রণালী এইরূপ। এইটি কাঠিমের উপর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চারিটি খণ্ডে তড়িৎ-রোধক তার জড়ানো আছে। প্রথম, খণ্ড হইল $S_1R_1S_2$ অংশ, দ্বিতীয় খণ্ড হইল $S_2R_2S_3$ অংশ। এইরূপে S_5 পর্যন্ত আরও দুইটি খণ্ড রহিয়াছে। H হাতল যে ধাতব অক্ষের সঙ্গে যুক্ত তাহারই একটি অংশ P, হাতল ঘুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে 1 হইতে 5 পর্যন্ত দাগে গিয়া S_1,S_2, S_3,S_4, S_5 স্থানে জড়ানো-তারের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে।

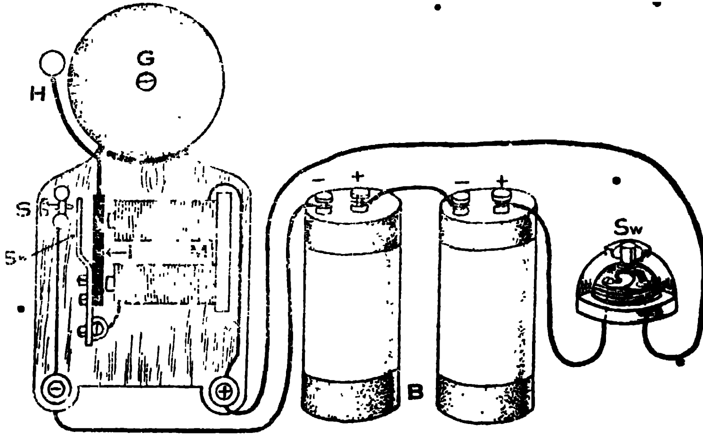


২০০ নং চিত্র—পাখার রেগুলেটার

রেগুলেটারে বিদ্যুৎ পজিটিভ A প্রান্ত হইতে C স্ক্রুতে যায়। C স্ক্রুটি S_5-এর সঙ্গে সংযুক্ত রহিয়াছে। P অংশটি হাতলের অক্ষের ভিতর দিয়া D স্ক্রুর সঙ্গে যুক্ত এবং D স্ক্রু নেগেটিভ প্রান্ত B-র সহিত যুক্ত। হাতল H যখন OFF স্থানে থাকে তখন তড়িৎ-প্রবাহ A প্রান্ত হইতে B প্রান্তে যাইতে পারে না। ফলে পাখাটি ঘুরে না। হাতল 5-এর স্থানে থাকিলে প্রবাহ C হইতে S_5 স্থানে গিয়া কোন রোধ অতিক্রম না করিয়াই নেগেটিভ প্রান্তে চলিয়া যাইবে। ফলে বর্ত্মনীর ভিতর সব চেয়ে বেশি প্রবাহ চলিবে এবং পাখা খুব দ্রুত ঘুরিবে। হাতলটি 4-এর স্থানে ঘুরাইয়া আনিলে P অংশের সঙ্গে S_4 স্থানের সংযোগ ঘটে। এবার তড়িৎ C স্থান হইতে S_5 R_4 S_4 পথে নেগেটিভ প্রান্তে ফিরিবে। বর্ত্মনীতে S_5 R_4 S_4 অংশের তারের রোধের জন্য তড়িৎ-প্রবাহ কমিয়া যাইবে। ফলে পাখার ঘূর্ণনের দ্রুতি কম হইবে। এই রূপে হাতল ঘুরাইয়া ক্রমান্বয়ে 3, 2 এবং 1 প্রভৃতি স্থানে নিলে এক একটি অতিরিক্ত প্যাঁচানো তারখণ্ড বর্ত্মনীতে রোধের সৃষ্টি করিবে এবং প্রবাহের মাত্রা সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যাইবে।

তড়িতের সাহায্যে সঙ্কেত ও বার্তাপ্রেরণ

তড়িৎ-শক্তি আলোক-শক্তির মত মুহূর্তে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যায়। সঙ্কেত ও সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য ইহার ব্যবহার খুব বেশি। আমরা এখন **বৈদ্যুতিক ঘণ্টা** (Electric Bell) দ্বারা কিরূপে



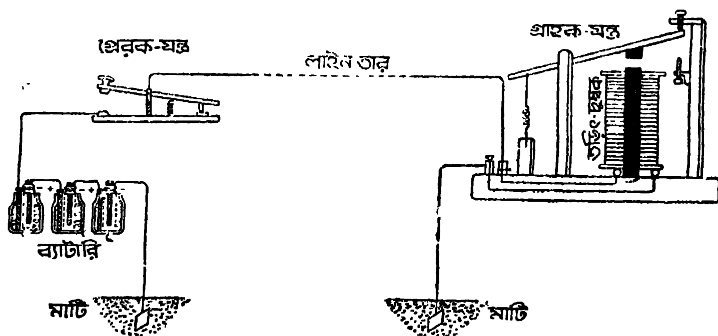
২০১নং চিত্র—বৈদ্যুতিক ঘণ্টা

সঙ্কেত-প্রেরণ এবং **টেলিগ্রাফ** (Telegraph) ও **টেলিফোন** (Telephone) দ্বারা কিরূপে সংবাদ-প্রেরণ করা হয় তাহা দেখিব।

বৈদ্যুতিক ঘণ্টা—চিত্রে ঘণ্টার বিভিন্ন অংশ কিরূপ দেখ। M একটি অশ্বক্ষুরাকৃতি তড়িৎ-চুম্বক। ইহার গায়ে জড়ানো তামার তারের কুণ্ডলীর ভিতর দিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত তড়িৎপ্রবাহ চলে ততক্ষণ উহার চুম্বকশক্তি থাকে এবং উহার সম্মুখস্থিত কোমল লোহার পাত I-কে আকর্ষণ করিতে পারে। এই লোহার পাতটিকে আর্মেচার বলে। ইহার এক প্রান্তে একটি হাতুড়ি H এবং অপর প্রান্তে স্প্রিং Sr লাগানো রহিয়াছে। B হইল দুই সেল দ্বারা গঠিত একটি ব্যাটারি। ইহা একটি টেপা সুইচ Sw-র ভিতর দিয়া তড়িৎ-চুম্বকের সহিত যুক্ত। ছবিতে দেখ ব্যাটারির পজিটিভ তড়িদ্দ্বার হইতে একটি তার চুম্বকটির দুই অংশ পরপর জড়াইয়া স্প্রিংয়ের গোড়াতে সংযুক্ত হইয়াছে। ব্যাটারির অপর তড়িদ্দ্বার হইতে তার ঘুড়িয়া গিয়া স্ক্রু S-এর সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। সাধারণ অবস্থায় স্প্রিংয়ের মাথাটি স্ক্রুটিকে

স্পর্শ করিয়া থাকে। কিন্তু সেজন্য বর্ত্মনীর ভিতর দিয়া প্রবাহ চলিতে পারে না, কারণ তখন টেপা সুইচের ভিতরে বর্ত্মনীতে ছেদ থাকে। সুইচটি টিপিলে বদ্ধ বর্ত্মনীপথে তড়িৎ-প্রবাহ চলিতে থাকে। এই প্রবাহের ফলে তড়িৎ-চুম্বক সক্রিয় হইয়া আর্মেচারটিকে তাহার দিকে জোরে আকর্ষণ করে। তখনই সংযুক্ত হাতুড়ি ঘণ্টা G-তে ঘা মারিয়া শব্দের সৃষ্টি করে। আর্মেচারটি তড়িৎ-চুম্বকের দিকে আসার সঙ্গে সঙ্গেই স্ক্রু S-এর সঙ্গে স্প্রিং Sr-র যোগ ছিন্ন হইয়া পড়ে। ইহার ফলে তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ হইয়া পড়ে। তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ হইলে তড়িৎ-চুম্বকটি চুম্বকশক্তি হারায় এবং আর্মেচার I-কে আর তাহার দিকে টানিতে পারে না। আর্মেচারটি একটি স্প্রিংয়ের সহিত যুক্ত থাকায় স্প্রিংয়ের জোরে স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া পুনরায় স্ক্রু S-কে স্পর্শ করে এবং প্রবাহ-বর্ত্মনী আবার সম্পূর্ণ হয়। ইহার ফলে আবার বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিতে আরম্ভ করে এবং হাতুড়িটা আবার ঘণ্টায় আঘাত করিয়া শব্দের সৃষ্টি করে। যতক্ষণ পর্যন্ত সুইচ টিপিয়া রাখা হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বর্ত্মনী সম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন হইবে এবং হাতুড়িটি বার বার ঘণ্টায় আঘাত করিয়া ঘণ্টাটি ক্রমাগত বাজাইতে থাকিবে। সুইচটি যদি বাড়ির বাহিরের দিকে এবং ঘণ্টাটি যদি ঘরের ভিতরে থাকে তাহা হইলে কোন আগন্তুক আসিয়া সুইচ টিপিলেই ঘরের ভিতর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে এবং ঘরের ভিতরের লোক জানিতে পারিবেন কোনো আগন্তুক আসিয়াছেন। ঘরের ভিতরে সুইচ এবং বাহিরে ঘণ্টা থাকিলে অপেক্ষমান ব্যক্তিকে ডাকা যায়।

টেলিগ্রাফ—টেলিগ্রাফ দ্বারা সংবাদ আদান-প্রদানে প্রধানত দুইটি



২০২নং চিত্র—টেলিগ্রাফ-যন্ত্র

যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। ইহাদের একটিকে বলে **প্রেরকযন্ত্র** (Transmitter)

এবং অপরটিকে বলা হয় **গ্রাহকযন্ত্র** (Receiver)। যে স্থান হইতে সংবাদ প্রেরণ করা হয় সেখানে প্রেরকযন্ত্র এবং যে স্থানে সংবাদ গ্রহণ করা হয় সে স্থানে গ্রাহকযন্ত্র বসানো থাকে। তবে দুই স্থানের মধ্যে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ দুইই চলে বলিয়া উভয় স্থানেই প্রেরকযন্ত্র ও গ্রাহকযন্ত্র রাখিতে হয়। দুই স্থানের প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্র পর পর খুঁটির মাথায় তার ঝুলাইয়া সংযুক্ত করা হয়। তাহাকে লাইন তার বলে। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকাবাসী **স্যামুয়েল মর্স** টেলিগ্রাফ-যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া তাহার সাহায্যে ওয়াশিংটন হইতে বাল্টিমোরে সর্ব প্রথম টেলিগ্রাফে শব্দ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

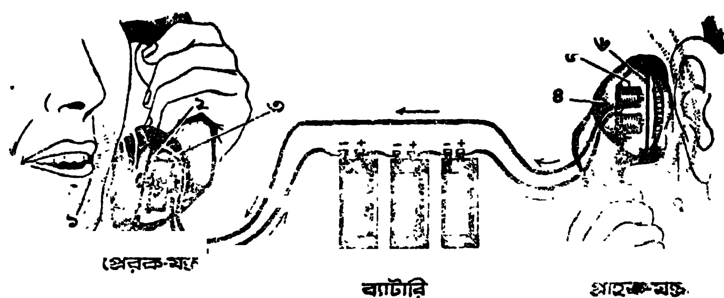
প্রেরক যন্ত্র—প্রেরকযন্ত্রে একটি চাবি থাকে। ইহা একটি ঢেঁকির মত আকৃতির লিভার বিশেষ। ইহার এক প্রান্তের ঠিক নীচে একটি বন্ধনী স্ক্রু রহিয়াছে। সেই স্ক্রুর সহিত কয়েকটি সেল-গঠিত একটি ব্যাটারির এক তড়িদ্দণ্ড সংযুক্ত থাকে। লিভারের ফালক্রামের নিকটে লাইন তার যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ব্যাটারির অপর তড়িদ্দণ্ড মাটির ভিতর বড় একটি ধাতুনির্মিত ফলকের সহিত যুক্ত থাকে। লাইন তার গ্রাহক-যন্ত্রের ভিতর দিয়া গিয়া পরে মাটির নীচে একটি ধাতু-ফলকের সহিত যুক্ত থাকে। মাটি একটি ভাল বিদ্যুৎ-পরিবাহক বলিয়া তড়িদ্বর্ত্মনী সম্পূর্ণ করিবার জন্য ইহার ভিতরে তার বসাইবার প্রয়োজন হয় না। সেজন্য চাবি টিপিলেই তড়িৎ-প্রবাহ অন্য স্থানের গ্রাহকযন্ত্রের ভিতর দিয়া চলিয়া থাকে। চাবি হইতে হাত সরাইয়া নিলে অপর দিকের স্প্রিংয়ের টানে চাবিটি উপরে উঠিয়া পড়ে এবং বর্ত্মনী বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়।

গ্রাহক-যন্ত্র—ইহার প্রধান অংশ একটি তড়িৎ-চুম্বক। ইহার সম্মুখে কোমল লোহার একটি আর্মেচার আছে। এই আর্মেচারটি একটি লিভারের এক দিকে আটকানো আছে। অপর দিকে একটি স্প্রিং লিভারটিকে নীচ দিকে টানিয়া রাখে।

তড়িৎ-চুম্বকের ভিতর দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ যাওয়া মাত্রই উহা আর্মেচারকে আকর্ষণ করে। সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকের নীচের স্ক্রুতে ঘা লাগে এবং টক্ করিয়া একটি আওয়াজ হয়। প্রেরক-যন্ত্রের চাবি টিপিলেই এখানে আওয়াজ হইবে। চাবি ছাড়িয়া দিলেই উপরের স্ক্রুতে ঘা লাগে এবং আবার আওয়াজ হয়। চাবি খুব কম সময় অন্তর ছাড়িয়া দিয়া টিপিলে টক্ টক্ শব্দও সেইরূপ

কম সময় পরে পরে হইবে। আর চাবি বেশি সময় অন্তর টিপিলে টক্ টক্ শব্দ সেইরূপ বেশি সময় পরে পরে হইবে। কম সময় অন্তর উৎপাদিত দুইটি শব্দের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে 'টরে' বলে এবং তাহা ডট্ (dot) দ্বারা লিখা হয়। আর একটু বেশি সময় অন্তর উৎপাদিত দুইটি শব্দের ব্যবধানকে 'টক্কা' বলে এবং তাহা ড্যাস (dash) দ্বারা লিখা হয়। এই দুইটি আওয়াজ নানা ভাবে পর পর সাজাইয়া বর্ণমালার অক্ষর ও সংখ্যাগুলি সাংকেতিক ভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। গ্রাহকযন্ত্রে পর পর যে শব্দ হইতে থাকে তাহা শুনিয়া সংবাদের কথাগুলি বুঝিতে হয়।

টেলিফোন (Telephone)—তোমরা অনেকেই টেলিফোন দেখিয়াছ, কেহ কেহ ইহা ব্যবহারও করিয়া থাকিবে। **আলেকজাণ্ডার গ্রেহাম বেল** ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে টেলিফোন আবিষ্কার করেন। পরবর্তী কালে নানা পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে যে উন্নত ধরনের টেলিফোন ব্যবহার করা



২০৩নং চিত্র—টেলিফোন-যন্ত্র

১। শব্দতরঙ্গ ২। ডায়াফ্রাম ৩। কার্বন-মাইক্রোফোন ৪। চুম্বক ৫। কোমল লোহার উপর তারের কুণ্ডলী। ৬। ডায়াফ্রাম ৭। শব্দতরঙ্গ

হয় তাহার সম্বন্ধেই তোমাদিগকে বলা হইবে। টেলিগ্রাফে সাংকেতিক শব্দের সাহায্যে সংবাদ পাঠানো হয়। টেলিফোনে একজনের কথা অন্য-স্থানে প্রায় অবিকৃত অবস্থায় শোনা যায়। তোমরা দেখিয়াছ টেলিগ্রাফ যন্ত্রে তড়িৎ-প্রবাহের অল্প বা অল্পাধিক সময় পরে পরে বিরাম হয়, কিন্তু টেলিফোন যখন ব্যবহার করা হয় তখন ইহার ভিতর দিয়া অবিরাম প্রবাহ চলিতে থাকে। চিত্রে টেলিফোন-যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ দেখ।

প্রেরক যন্ত্র—বর্তমান কালে সর্বত্রই **কার্বন-মাইক্রোফোন** (Carbon Microphone) প্রেরকযন্ত্রে ব্যবহার করা হয়। ইহার প্রধান

অংশ কার্বনের খুব ছোট ছোট দানাভর্তি একটি কৌটা। ইহার দুই পাশের দেওয়াল পাতলা কার্বনের পাতে তৈয়ারি। পাত দুইটির সঙ্গে ব্যাটারির দুই তড়িদ্দণ্ডের যোগ করিলে কার্বনের দানাগুলির ভিতর দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চলিতে পারে। সম্মুখের কার্বন পাতটি একটি পাতলা ধাতুর পর্দা বা ডায়াফ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত। ঐ পর্দার সম্মুখে কথা বলিলে উহা শব্দতরঙ্গের আঘাতে কাঁপিতে থাকে, আর ঐ সঙ্গে কৌটার সম্মুখের সংযুক্ত কার্বন পাতটিও কাঁপিতে থাকে। কার্বনের দানাগুলি একত্র জোড়া হইয়া আছে; ফলে তাহাদের মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চলিতে পারে। সেই প্রবাহের পরিমাণ নির্ভর করে সম্মিলিত কার্বন দানাগুলির রোধের উপর। পর্দার উপর কথা বলিলে শব্দের তরঙ্গ কার্বনের দানাগুলিকে এক বার চাপিয়া ধরে এবং পরক্ষণেই অপেক্ষাকৃত আলগা করিয়া দেয়। ইহাতে কৌটার কার্বনের দানার মধ্যে রোধের পরিবর্তন হয় বলিয়া বর্ত্মনীতে তড়িৎ-প্রবাহেরও পরিবর্তন হইবে। এই পরিবর্তনশীল প্রবাহ তারের ভিতর দিয়া দূরবর্তী গ্রাহকযন্ত্রে পৌছিবে।

গ্রাহকযন্ত্র—গ্রাহকযন্ত্রে একটি স্থায়ী চুম্বকের দুই মেরুতে কোমল লোহার দুইটি ছোট দণ্ড লাগানো আছে; আর ঐ দণ্ড দুইটির উপর, তড়িৎ-চুম্বকে যেমন ভাবে তার জড়ানো থাকে সেই ভাবে তার জড়ানো রহিয়াছে। স্থায়ী চুম্বকটি চিত্রে ৪নং স্থানে টেলিফোনের খোলের ভিতরে আছে। কথা বলিবার সময় প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রের ভিতর দিয়া ব্যাটারি হইতে প্রবাহ চলিতে থাকে। এই অবস্থায় প্রেরকযন্ত্রের পর্দার উপর কথা বলিলে পূর্ব-বর্ণিত কারণে বর্ত্মনীতে পরিবর্তনশীল প্রবাহের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ প্রবাহ এক বার বাড়ে ও পরক্ষণেই কমে। এই পরিবর্তনশীল প্রবাহ গ্রাহকযন্ত্রের কুণ্ডলীর ভিতর দিয়া যাওয়ার ফলে কুণ্ডলীতে চৌম্বক বলরেখার হ্রাসবৃদ্ধি হয়। প্রবাহের তারতম্য অনুসারে চুম্বকের শক্তিরও তারতম্য ঘটে। সেজন্য চুম্বকটি পর পর বিভিন্ন শক্তিতে পর্দাটিকে আকর্ষণ করিতে থাকে; ফলে ধাতব পর্দাটি কাঁপিতে থাকে। প্রেরকযন্ত্রের পর্দাটির কম্পনের ফলে পরিবর্তনশীল প্রবাহের সৃষ্টি হয় এবং এই প্রবাহের পরিবর্তনের তালে তালেই গ্রাহকযন্ত্রের পর্দাটি কাঁপিতে থাকে। ফলে এই পর্দাটি প্রেরকযন্ত্রের পর্দার উপর আপতিত শব্দের পুনরায় সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন

১। স্থির বিদ্যুৎ কাহাকে বলে? কোন্ কোন্ জিনিস হইতে তুমি তাহা কি ভাবে সহজে উৎপন্ন করিতে পার?

২। প্রবাহী বিদ্যুৎ কি ভাবে রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা উৎপন্ন করা যায় দৃষ্টান্ত দ্বারা বল।

৩। ল্যাকল্যাঁস সেলের গঠন ও ক্রিয়াপদ্ধতি বর্ণনা কর।

৪। ড্রাইসেল কি কি জিনিস দিয়া কি ভাবে প্রস্তুত করা হয় চিত্র আঁকিয়া দেখাও।

৫। তড়িদ্‌বিভব, তড়িৎপ্রবাহ ও রোধ কাহাকে বলে? কি কি একক দ্বারা এইগুলি প্রকাশ করা হয়?

৬। তড়িৎপ্রবাহের বিভিন্ন প্রভাব কি কি, পরীক্ষার উল্লেখ করিয়া বল।

৭। তড়িতের প্রভাবে চুম্বকের ঘূর্ণনের দিক সম্বন্ধে যে নিয়ম আছে তাহা বল। কি পরীক্ষা দ্বারা সেই নিয়মটি যাচাই করিয়া নেওয়া যায়?

৮। তারের কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ চলিলে ইহা যে একটি চুম্বকের মত কাজ করে তাহা কি ভাবে প্রমাণ করিবে?

৯। তড়িৎ-চুম্বক কাহাকে বলে? ইহা কি ভাবে প্রস্তুত করিতে হয় এবং ইহাদ্বারা কি কাজ করা যায়?

১০। তড়িৎ-বিশ্লেষণ কাহাকে বলে? ব্যবহারিক জীবনে ইহার প্রয়োগের উল্লেখ কর।

১১। তড়িৎপ্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়া পরীক্ষার উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া বল।

১২। স্টোরেজ সেলের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

১৩। তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ কাহাকে বলে পরীক্ষার উল্লেখ করিয়া বল।

১৪। তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের নিয়মগুলি কি কি? কোন্ কোন্ পরীক্ষাদ্বারা সেই নিয়মগুলি প্রমাণ করা যায়?

১৫। ডাইনামোর সাহায্যে তড়িৎ-উৎপাদনের মূলনীতি কি? ইহা কে, কখন, কি পরীক্ষাদ্বারা আবিষ্কার করিয়া ছিলেন?

১৬। একটি পরবর্তী-প্রবাহ-উৎপাদকের গঠন ও কার্যপ্রণালী চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

১৭। একটি একমুখী-প্রবাহ-উৎপাদকের গঠন ও কার্যপ্রণালী চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

১৮। তড়িৎ হইতে উৎপন্ন তাপীয় শক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ কি কি, যন্ত্রের উল্লেখ করিয়া বল।

১৯। ইলেকট্রিক বাল্বের উন্নতির জন্য ইহার গঠনে কি কি পরিবর্তন করা হইয়াছে বল।

২০। প্রতিপ্রভ দীপের গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

২১। ইলেকট্রিক মোটরের প্রধান অংশ কি কি? ইহা হইতে কি ভাবে গতীয় শক্তি পাওয়া যায়?

২২। বৈদ্যুতিক ঘণ্টার ছবি আঁকিয়া ইহার কার্যপ্রণালী বুঝাইয়া বল।

২৩। টেলিগ্রাফ-যন্ত্র আঁকিয়া তাহার কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

২৪। কার্বন–মাইক্রোফোনের গঠন ও কার্যপ্রণালী চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

২৫। আধুনিক টেলিফোন-যন্ত্রের কার্যপ্রণালী চিত্রের সাহায্যে বুঝাইয়া বল।

বিষয়গত প্রশ্ন

(নির্দেশ পূর্ববৎ)

১। ঠিক উক্তি নির্বাচন

(ক) ড্যানিয়েল সেল ও স্টোরেজ সেলের কার্যপ্রণালীতে পার্থক্য আছে কি? ——

(খ) সলিনয়েডের মধ্যে লৌহশলাকা না থাকিলে শুধু তড়িৎপ্রবাহ চালাইয়া উহাকে চুম্বকের সমতুল্য করা যায় না। ——

(গ) বৈদ্যুতিক ঘণ্টার সুইচ টিপিয়া ধরিয়া রাখিলে তড়িৎ-প্রবাহ অবিরাম চলিতে থাকে। ——

(ঘ) টেলিফোনে কথা বলিবার সময় তড়িৎপ্রবাহ অবিরাম চলিতে থাকে। ——
——

(ঙ) ডাইনামো ও মোটরের গঠন ও কার্যপ্রণালী প্রায় একরূপ। ——

২। শূন্যস্থান পূরণ

টেলিফোনে কথা বলিলে———(১)টি কাঁপিয়া উঠে ———(১)
এবং উৎপন্ন শব্দতরঙ্গ———(২)র মধ্যে ———(২)
———(৩)র পরিবর্তন ঘটায়। ফলে ———(৩)
গ্রাহকযন্ত্রের কুণ্ডলীতে———(৪)র পরিবর্তন ঘটে ———(৪)
এবং———(৫)র হ্রাসবৃদ্ধি হয়। ———(৫)
সেজন্য———(৬)টি পর পর কম ———(৬)
ও বেশি জোরে———(৭) কে আকর্ষণ করে। ———(৭)
ফলে ধাতব পদার্থটি———(৮) থাকে এবং ———(৮)
প্রেরকযন্ত্রের উপর আপতিত———(৯)র মত শব্দের সৃষ্টি করে। ———(৯)

৩। কয়েকটি উত্তরের মধ্যে ঠিক উত্তর নির্বাচন

ফ্লুরেসেন্ট দীপের আবিষ্কারে আলোক-উৎপাদনের ক্ষেত্রে যুগান্তকর উন্নতি হইয়াছে। কারণ

(১) এই দীপ অন্য দীপের তুলনায় কম তড়িৎ-শক্তি হইতে বেশি আলোক উৎপন্ন করিতে পারে।

(২) এই দীপ বেশি টেকসই।

(৩) এই দীপ হইতে উৎপন্ন আলোর জন্য কম ব্যয় হয়।

(৪) অন্য দীপের তুলনায় ইহা একই তড়িৎ-শক্তি হইতে বেশি সাদা ও পরিমাণে বেশি আলোক উৎপন্ন করে।

কয়েকটি ধাতু

১

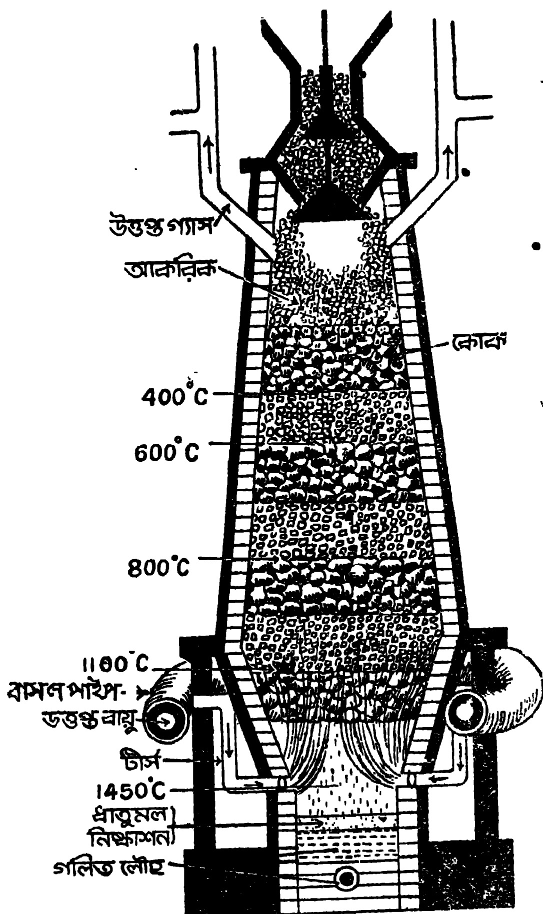
লৌহ ও স্টীল

আদিম যুগে মানুষ পাথরের হাতিয়ার ও অস্ত্র ব্যবহার করিত। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্বে মানুষ তামা ও টিনের আকরিক একসঙ্গে বিজারণ করিয়া ব্রোঞ্জ নামক সংকর ধাতু (Alloy) উৎপাদন করিতে শিখিল এবং ব্রোঞ্জ দিয়া বাসনপত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস তৈয়ারি করিতে লাগিল। পরবর্তী কালে লৌহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রোঞ্জের স্থান অধিকার করিল। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আরও নানা ধাতুর উৎপাদন ও ব্যবহার শিখিল। বর্তমান কালে মানুষের ব্যবহার্য ধাতুগুলি তাহাদের প্রয়োজনীয়তার হিসাবে এই পর্যায়ে রহিয়াছে—লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, তামা, সীসা, দস্তা ও টিন। মূল্যের দিক দিয়া সোনা ও রুপার দাম বেশি এবং এগুলিকেই লোকে মূল্যবান ধাতু মনে করিতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়া দেখিলে লোহার স্থান সর্বোচ্চে। এখানে লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, তামা, দস্তা ও কয়েকটি সংকর ধাতুর সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

লৌহ (Iron)—আমাদের দেশে হিমেটাইট (Haematite) নামক লৌহ আকরিক হইতেই প্রধানত লৌহ-উৎপাদন করা হয়। ইহা হইল আয়রন অক্সাইড (Iron Oxide)। মানভূম জেলায়, বিহারের সিংভূম জেলাতে, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ ও কেওঞ্জর জেলায় এবং মহীশূর রাজ্যে কাদুর জেলায় উচ্চশ্রেণীর হিমেটাইটের পাহাড় রহিয়াছে। কোন উপায়ে হিমেটাইট হইতে অক্সিজেন দূর করিতে পারিলে ধাতুর আকারে লৌহ পাওয়া যায়। এই কাজের জন্য হিমেটাইট আকরিকের সঙ্গে কোক-কয়লা ও চুনা পাথর মিশানো হয়। পরবর্তী উপাদান দুইটিও এদেশে যথেষ্ট রহিয়াছে। ঝরিয়া ও রানীগঞ্জের কয়লার খনি সুবিখ্যাত। হিমেটাইট আকরিকের সঙ্গে প্রায় অর্ধেক কোক কয়লা ও এক-চতুর্থাংশ চুনা পাথর মিশাইয়া ঐ মিশ্রণকে ব্লাস্ট ফার্নেসের (Blast Furnace) মধ্যে প্রবেশ

করাইয়া খুব বেশি তাপ দিলে বিজারণ (Reduction) প্রক্রিয়ার ফলে লৌহ গলিত ধাতুর আকারে নির্গত হয়।

ব্লাস্ট ফার্নেস—ছবির সাহায্যে ব্লাস্ট ফার্নেসের গঠন বুঝিতে চেষ্টা কর। ইহা দেখিতে একটি স্তম্ভের মত। উচ্চতায় ৮০ হইতে ১০০ ফুট।



২০৪নং চিত্র—ব্লাস্ট ফার্নেসের গঠন

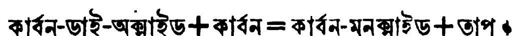
উপরের দিক হইতে নীচ দিকে ক্রমশ মোটা হইয়া আসিয়া শেষে আবার নীচ দিকে সরু হইয়া নামিয়া আসিয়াছে। সবচেয়ে মোটা জায়গার ব্যাস প্রায় ২৮ ফুট। সর্বনিম্নে চুল্লীটির ব্যাস ১৮ হইতে ২২ ফুট পর্যন্ত হইয়া

থাকে। ইহাদের বাহিরের দিক মোটা স্টীলের পাতে তৈয়ারি; ভিতরে তাপসহ ফায়ার-ব্রিকের (Fire Brick) অস্তর রহিয়াছে। যান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্লাস্ট ফার্নেসের মাথার দিকে লৌহ আকরিক, চুনা পাথর ও কোকের মিশ্রণ টানিয়া তোলা হয় এবং সেখান হইতে **ডবল বেলের** (Double Bell) সাহায্যে ভিতরে ফেলা হয়। ফার্নেসের উপরের দিকে বড় ও ছোট দুইটি বেলের আকৃতির যন্ত্র যথাক্রমে বড় ও ছোট দুইটি মুখ আটকাইয়া রাখিয়াছে। বড় বেলটি দিয়া বড় মুখটি আটকাইয়া ছোট বেলটি সরাইয়া তাহার পাশ দিয়া মিশ্রণ দুইটি মুখের মধ্যবর্তী প্রকোষ্ঠে ঢালা হয়। তাহার পর ছোট বেলটি দ্বারা উপরের মুখ আটকাইয়া বড় বেলটি নামাইয়া তার পাশ দিয়া মিশ্রণ চুল্লীর ভিতর ফেলা হয়। তখন চুল্লীটি সক্রিয় থাকিলেও নির্গত উত্তপ্ত গ্যাস উপরের মুখ দিয়া আর বাহির হইয়া যাইতে পারে না। ডবল বেল দ্বারা ভাল্‌বের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার সাহায্যে মিশ্রণ ভিতরে ঢালা যায়, অথচ ভিতর হইতে প্রয়োজনীয় উত্তপ্ত গ্যাস নির্দিষ্ট পথ ছাড়া খোলা মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে না। ফার্নেসটি পর পর এক স্তর কয়লা এবং এক স্তর লৌহ আকরিক ও চুনা পাথরের মিশ্রণ দ্বারা ভর্তি করা হয়। ইহা ছবিতে দেখ।

কামারের চুল্লীতে কয়লা পুড়াইয়া বেশি তাপ পাওয়ার জন্য তাহার মধ্যে হাপর হইতে হাওয়া দিতে হয়। সেই হাওয়া হইতে অক্সিজেন দহনক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করে। ব্লাস্ট ফার্নেসে কোক দহনের জন্য প্রচুর পরিমাণে বায়ুর প্রয়োজন। সেজন্য বাহিরের বায়ু পাম্প করিয়া উচ্চ চাপে চুল্লীর ভিতর দিয়া চালিত করা হয়। লোহার গলনাঙ্ক ১৫২৭° সেন্টিগ্রেড। গলিত অবস্থায় লৌহ নিষ্কাশনের জন্য চুল্লীতে উষ্ণতার মাত্রা আরও বেশি হওয়া দরকার। সেজন্য বাহিরের বায়ু উত্তপ্ত করিয়া ফার্নেসের নিম্ন দেশ হইতে প্রায় ১৫ ফুট উপরে উহার চারিদিকে ঘেরা **বাসল পাইপ** (Bustle Pipe) নামক একটি মোটা নলে প্রবেশ করানো হয়। ঐ নল হইতে দশ-বারটি শাখা-নলের ভিতর দিয়া আসিয়া উত্তপ্ত বাতাস ঝাপটার বেগে চুল্লীর ভিতরে প্রবাহিত হইতে থাকে। ঐ সব শাখা নলগুলিকে **টীর্স** (Tuyeres—উচ্চারণ টীর্স) বলে। চুল্লীর ভিতরে ঝাপটার বেগে বাতাস প্রবাহিত হয় বলিয়া উহাকে ব্লাস্ট ফার্নেস (ব্লাস্ট = ঝাপটা) বলে। টীর্সের মুখের ঠিক উপরে চুল্লীর উষ্ণতা খুব বেশি, লৌহের গলনাঙ্কের অনেক উপরে। সেই স্থান হইতে ফার্নেসের ভিতরে উষ্ণতা ক্রমশ কমিয়া যায়। এ বিষয়ে চিত্রটি দেখ।

ব্লাস্ট ফার্নেসের ভিতরে ক্রিয়া—তাপ দিবার জন্য ৭০০°—৮০০°সে. উষ্ণতায় তপ্ত বায়ু চুল্লীতে পাঠানো হয়। তাহাতে অক্সিজেন ও কোক-কয়লার দহনে প্রথমে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস এবং প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। ফলে চুল্লীর উষ্ণতা বাড়িয়া যায়। ঐ ক্রিয়া এই ভাবে প্রকাশ করা যায়: কার্বন+অক্সিজেন=কার্বন-ডাই-অক্সাইড+তাপ।

তাহার পর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও প্রজ্বলিত কোকের রাসায়নিক ক্রিয়ায় কার্বন-মনক্সাইড এবং তাপ উৎপন্ন হয়। ফলে চুল্লীর উষ্ণতা আরও বৃদ্ধি পায়। ঐ ক্রিয়া এই ভাবে প্রকাশ করা যায়:



কার্বন-ডাই-অক্সাইড+কার্বন=কার্বন-মনক্সাইড+তাপ।

এবার কার্বন-মনক্সাইড গ্যাস ও তাপ লৌহ-অক্সাইডকে বিজারণ (Reduction) করে অর্থাৎ লৌহ-অক্সাইড হইতে অক্সিজেন দূর করিয়া দেয়। বিজারণ ক্রিয়ার ফলে উষ্ণতার এত বেশি বৃদ্ধি হয় যে ইহাতে লৌহ গলিয়া যায়। ঐ ক্রিয়া এই ভাবে প্রকাশ করা যায়:

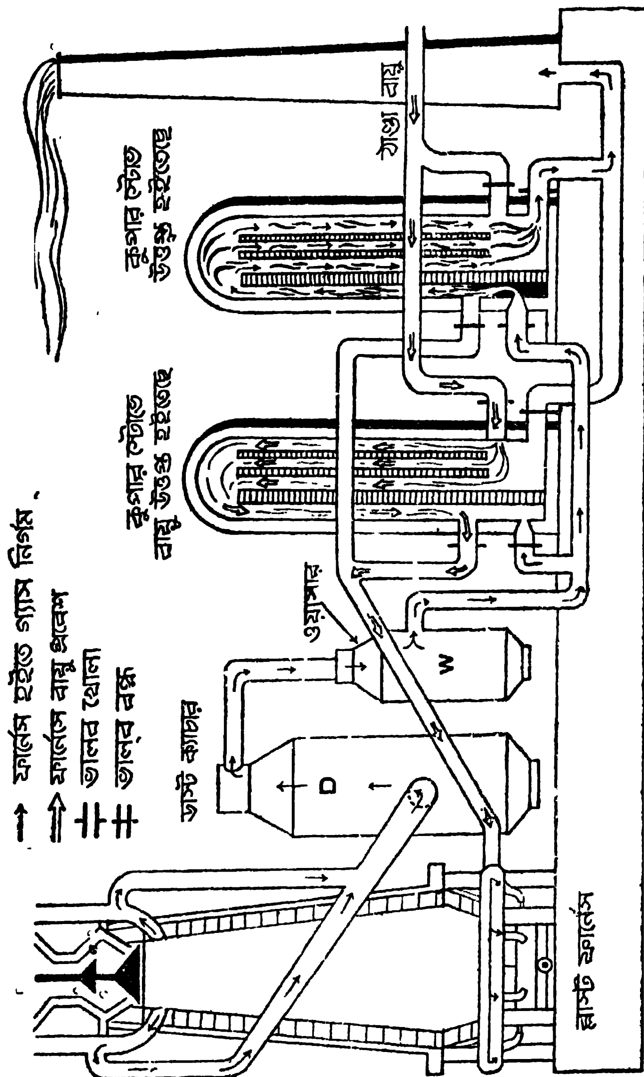
লৌহ-অক্সাইড+কার্বন-মনক্সাইড=লৌহ + কার্বন-ডাই-অক্সাইড + তাপ।

এই লৌহ গলিত অবস্থায় ব্লাস্ট ফার্নেসের নীচে জমা হইতে থাকে এবং সেই স্থান ভর্তি হইয়া গেলে ফার্নেসের নিম্ন ভাগের নলপথ খুলিয়া লৌহ তরল আকারে নিষ্কাশন করিতে হয়। ঐ উষ্ণতায় চুনাপাথরের সহিত লৌহ আকরিকের সঙ্গে মিশ্রিত বালিমাটির রাসায়নিক ক্রিয়া হয় এবং তাহার ফলে যে তরল পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা তরল লৌহের চেয়ে হালকা বলিয়া উপরে ভাসিতে থাকে। ইহাকে ধাতুমল (Slag) বলে এবং মধ্যে মধ্যে উপরের নলপথটি খুলিয়া ইহা বাহির করিতে হয়। ব্লাস্ট ফার্নেসে উৎপন্ন উত্তপ্ত গ্যাস উপরের দুইটি পথ দিয়া বাহির হইয়া যায়।

ব্লাস্ট ফার্নেসের জন্য বায়ু উত্তপ্তাকরণ—একশ ত্রিশ বৎসর পূর্বে পর্যন্ত ব্লাস্ট ফার্নেসে ঠাণ্ডা বাতাসই দেওয়া হইত। তখন একটন লৌহ-উৎপাদনের জন্য আট টন কোকের প্রয়োজন হইত। পরবর্তী কালে ব্লাস্ট ফার্নেসে উত্তপ্ত হাওয়া দেওয়ার ফলে লৌহ উৎপাদনের জন্য কোকের পরিমাণ ক্রমশই কমিয়া আসিয়াছে। বর্তমান কালে এক টন লৌহ উৎপাদন করিতে এক টনেরও কম কোকের প্রয়োজন হয়।

ব্লাস্ট ফর্নেস হইতে যে গ্যাস নির্গত হয় তাহার প্রধান উপাদান কার্বন-মনক্সাইড। ইহা একটি দাহ্য গ্যাস। পূর্বে এই গ্যাস তাহার নির্গম পথেই

পুড়াইয়া ফেলা হইত। বর্তমানে এই গ্যাস এভাবে নষ্ট না করিয়া ইহা পুড়াইয়া যে তাপ উৎপন্ন হয় তাহার সাহায্যে ব্লাস্ট ফার্নেসের জন্য বায়ু উত্তপ্ত করা হয়। ব্লাস্ট ফার্নেসের পরিত্যক্ত গ্যাস, প্রধানত কার্বন-মনক্সাইড কুপার



২০নং চিত্র—ব্লাস্ট ফার্নেস ও স্টোভ

স্টোভ (Cowper Stove) নামক চুল্লীতে জ্বালানো হয়। ছবিতে দেখ এই গ্যাস জ্বালাইবার পূর্বে ইহাকে ডাস্টক্যাচার (Dust Catcher) ও

ওয়াসারের (Washer) সাহায্যে ধূলি ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় পদার্থ হইতে মুক্ত করিয়া লওয়া হয়। ডাস্ট-ক্যাচারে ধূলি আটকাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। আর ওয়াসার বা জলের ধারাযুক্ত ধৌতাগারের ভিতর দিয়া ঐ গ্যাস চালাইলে উহা হইতে অন্যান্য প্রায় সব ময়লা দূরীভূত হয়। চিত্রে দুইটি কুপার স্টোভ দেখানো হইয়াছে। ডান দিকেরটিতে দাহ্য গ্যাস জ্বলনের ফলে উহা উত্তপ্ত হইতেছে। তখন পাম্পের সাহায্যে ঠাণ্ডা বায়ুর ধারা বাম দিকের স্টোভের ভিতর দিয়া চালিত হইতে থাকে। এই স্টোভটি তখন খুবই উত্তপ্ত, কারণ ঠাণ্ডা বায়ু চালিত হওয়ার পূর্বেই ইহার ভিতরে ব্লাস্ট ফার্নেসের পরিত্যক্ত দাহ্য গ্যাস পুড়ানো হইয়াছিল। এক একটি স্টোভে কার্বন-মনক্সাইড পুড়াইবার প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। আর ফায়ার-ব্রিকের সারির ভিতর দিয়া আঁকা বাঁকা পথে জ্বলন্ত গ্যাস চলিবার ব্যবস্থাও থাকে। ফলে স্টোভের ভিতর দিয়া জ্বলন্ত গ্যাস চলিলে উহার ফায়ার-ব্রিক উত্তপ্ত হইয়া লাল হয়। কার্যত একটি স্টোভ যখন পূর্বোক্ত প্রণালীতে উত্তপ্ত হইতে থাকে তখন পূর্বেই উত্তপ্ত করা অপর স্টোভটি তাহার ভিতর দিয়া যে বায়ুপ্রবাহ ব্লাস্ট ফার্নেসের দিকে প্রবাহিত হয় তাহাকে উত্তপ্ত করিতে থাকে। এই প্রণালীতে ৭০০°-৮০০° সে. উষ্ণতায় উত্তপ্ত বায়ু ব্লাস্ট ফার্নেসে চালিত হয়। প্রতিটি স্টোভ আধ ঘণ্টাকাল উত্তপ্ত হওয়ার পর তাহার ভিতর দিয়া বায়ুপ্রবাহ চালানো হয়। আর আধ ঘণ্টাকাল তাহার ভিতর দিয়া বায়ুপ্রবাহ চালিত হওয়ার পর স্টোভটিকে আবার গরম করা হয়। উভয় স্টোভেই এই দুই কাজ পর পর চলিতে থাকে। ছবিতে উত্তপ্ত গ্যাস ও বায়ুপ্রবাহের পথে যে সব ভাল্‌ব দেখানো হইয়াছে সেইগুলি পর্যায় ক্রমে খুলিয়া ও বন্ধ করিয়া পূর্বোক্ত ক্রিয়াগুলি সম্পাদন করা হয়।

ব্লাস্ট ফার্নেস হইতে লৌহ-উৎপাদন আরম্ভ হইলে ইহার কাজ অবিরাম চলিতে থাকে। তবে বৎসর দুই পরে পরে ইহার ভিতরে ফায়ার-ব্রিকের অস্তর মেরামতের জন্য কাজ সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখিতে হইতে পারে। একটি আধুনিক বড় আকারের ব্লাস্ট ফার্নেস হইতে ২৪ ঘণ্টায় ১০০০ টন্ পর্যন্ত লৌহ উৎপন্ন করা যায়। একশ বৎসর পূর্বে এই পরিমাণ লৌহ উৎপাদন করিতে লাগিত এক বৎসর।

আমাদের দেশে পূর্ব হইতেই জামসেদপুর, বার্নপুর ও ভদ্রাবতীতে (মহীশূর রাজ্য) লৌহ-উৎপাদনের কারখানা ছিল। বর্তমান কালে ভারত

সরকারের প্রচেষ্টায় রাউরকেল্লা (উড়িষ্যা রাজ্য), ভিলাই (মধ্যপ্রদেশ) ও দুর্গাপুরে (পশ্চিম বাংলা) লৌহ ও স্টীলের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

কাস্ট আয়ারন্ (Cast Iron)—ব্লাস্ট ফার্নেস হইতে যে গলিত লোহা পাওয়া যায় তাহা শীতল হইয়া কঠিন হইলে তাহাকে **কাস্ট আয়ারন্** বা **ঢালাই লোহা** বলে। ইহাতে শতকরা ৩ হইতে ৫ ভাগ পর্যন্ত কার্বন, ১ হইতে ২ ভাগ পর্যন্ত সিলিকন এবং আরও কম পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ, ফস্-ফরাস ও সালফার থাকে। কার্বনের আধিক্যের জন্য ঢালাই লোহা ভঙ্গুর। ঢালাই লোহায় গড়া জিনিস ঘা লাগিলে ভাঙ্গিয়া যায়। তবে যে-সব বস্তুতে প্রচণ্ড আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা নাই সেই সেই জিনিস কাস্ট আয়ারন্ ঢালাই করিয়া প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সেজন্য বড় বড় মেসিনের পাদদেশ, সাধারণ আকারের থাম, ল্যাম্পপোস্ট, বাড়ীর ছাদ হইতে জল এবং পায়খানার তরল পদার্থ নিষ্কাশনের পাইপ, লোহার কড়াই প্রভৃতি ঢালাই লোহা দিয়া তৈয়ারি করা হয়। কিন্তু যে সব জিনিস আঘাত লাগিলে বা বাঁকাইলেও সহজে ভাঙ্গেনা তাহা প্রস্তুতের জন্য ঘাতসহ স্থিতিস্থাপক পদার্থের ব্যবহার করা হয়। তাহা হইল **স্টীল** (Steel) বা **ইস্পাত**; ইহা আমাদের সব চেয়ে বেশি কাজে লাগে।

পেটা লোহা (Wrought Iron)—পেটা লোহা বলিয়া আর এক জাতীয় লোহার ব্যবহার প্রচলিত আছে। ইহাতে কার্বনের পরিমাণ খুব কম, শতকরা মাত্র ১ ভাগ। ইহা ঘাতসহ, তবে ইহা ইস্পাতের মত স্থিতি-স্থাপক নহে বলিয়া জোরে বাঁকাইলে আর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিতে পারে না। ইহাকে তপ্ত করিলে নরম হয়; তখন পিটাইয়া নানা জিনিস তৈয়ারি করা যায়। পেটা কড়াই ও রুটি সেকিবার তাওয়া পেটা লোহাতে তৈয়ারি। বিদ্যুৎ-চুম্বকের মধ্যে যে লোহা ব্যবহার করা হয় তাহা নরম পেটা লোহা। তারের জাল প্রস্তুতের জন্যও পেটা লোহা ব্যবহার করা হয়।

স্টীল—ব্লাস্ট ফার্নেস দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর ফার্নেস হইতে উৎপন্ন গলিত, অশোধিত লৌহ লম্বা আয়তকার ছাচের মধ্যে গিয়া ঠাণ্ডা হইয়া ঐ আকারের লৌহ পিণ্ডে পরিণত হয়। তাহাকে **পিগ আয়ারন্** (Pig Iron) বলে। লৌহশিল্পীরা ঐ পিগ আয়ারন্ হইতে ঢালাই করিয়া নানা প্রকার জিনিস প্রস্তুত করেন। আর এক শ্রেণীর ব্লাস্ট ফার্নেস হইতে যে গলিত লৌহ উৎপন্ন হয় তাহা ঐ অবস্থায়ই স্টীল প্রস্তুতির জন্য বিশেষ রকমের

কারখানায় নিয়া হয়। এখন স্টীল প্রস্তুতির বিভিন্ন প্রণালীগুলির বিবরণ দেওয়া হইবে।

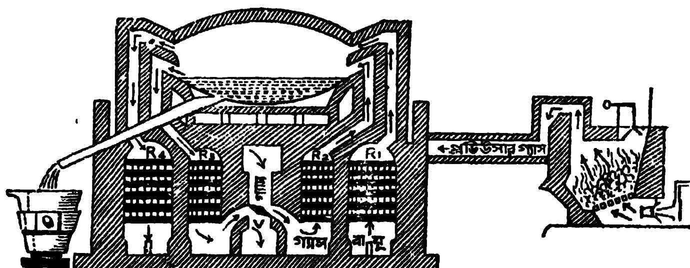
(১) **বেসেমার প্রণালী** (Bessemer Process)—পৃথিবীর কয়েকটি দেশে, আমাদের ভারতবর্ষেও বহু শতাব্দী যাবতই লৌহ আকরিক কাঠ কয়লার সাহায্যে পুড়াইয়া লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত করা হইয়াছে। তবে এভাবে প্রস্তুত অপ্রচুর ইস্পাত বৃহৎ শিল্পের চাহিদা মিটাইতে পারে নাই। তোমরা জানিয়াছ ব্লাস্ট ফার্নেস হইতে উৎপন্ন লৌহে নানা প্রকার ধাতু ও অধাতু মিশ্রিত থাকে। তাহার মধ্যে কার্বনের পরিমাণই বেশি এবং সে জন্যই ঢালাই লোহা ভঙ্গুর। ঢালাই লোহাতে কার্বনের পরিমাণ কমাইয়া শতকরা ·১ হইতে ১·৫ করিতে পারিলে ইস্পাত বা স্টীল উৎপাদিত হয়। বিভিন্ন প্রকারের স্টীলের গুণ কার্বন ও অন্যান্য ধাতুর পরিমাণ এবং প্রস্তুতি-প্রণালীর উপর নির্ভর করে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে স্টীল প্রস্তুতির ইতিহাস কিয়দধিক একশত বৎসরের পুরাতন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হেনরী বেসেমার নামক একজন ইংরেজ ইস্পাত প্রস্তুতির এক প্রণালী আবিষ্কার করেন। ইহার ফলে ইস্পাতের মূল্য পূর্ব মূল্যের পাঁচ ভাগের একভাগ হইয়া পড়িল। আর এই প্রণালীতে খুব দ্রুত বেশি পরিমাণে ইস্পাত প্রস্তুত করাও সম্ভবপর হইল।

এই প্রণালী মতে গলিত লৌহের মধ্য দিয়া বায়ুস্রোত চালনা করিয়া মিশ্রিত কার্বন পুড়াইয়া দূর করা হয়। তাহার পর নির্দিষ্ট মাত্রায় কার্বন মিশাইয়া স্টীল প্রস্তুত করা হয়। এই প্রণালীতে ইংলণ্ডে প্রস্তুত স্টীল দ্বারা আমাদের দেশে প্রথম রেল লাইন স্থাপন করা হয়। আমাদের দেশের চেয়েও অনেক বড় দেশ আমেরিকা বেসেমার-স্টীলের রেল দিয়া ছাইয়া ফেলা হয়। ফলে আমেরিকায় কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে এক নব যুগের সূচনা হয়।

(২) **ওপেন হার্থ প্রণালী** (Open Hearth Process)—গত শতাব্দীর মধ্যভাগে আর এক প্রণালী আবিষ্কৃত হয়। তাহাকে ওপেন হার্থ বা খোলা চুল্লী প্রণালী বলে। কারণ ২০৬ নং চিত্রের উপরে প্রদর্শিত বিস্তৃত চুল্লীটির গভীরতা খুব কম বলিয়া ব্লাস্ট ফার্নেস হইতে আনীত গলিত লোহ ইহার মধ্যে ছড়ানো অবস্থায় থাকে। ডান পাশে আর একটি চুল্লীতে জ্বলন্ত কয়লার উপর দিয়া বায়ুস্রোত চালনা করিয়া তাহা হইতে প্রডিউসার গ্যাস (কার্বন-মনক্সাইড ও নাইট্রোজেনের মিশ্রণ) উৎপন্ন করা হয়। কার্বন-

মনক্সাইড দাহ্য গ্যাস এবং তাহাকে ওপেন হার্থ চুল্লীতে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই গ্যাস সাধারণ উষ্ণতায় চুল্লীতে প্রবেশ না করাইয়া দুইটি স্টোভের সাহায্যে গ্যাস ও বায়ু পৃথক ভাবে উত্তপ্ত করিয়া চুল্লীতে প্রবেশ করানো হয় এবং সেখানে ঐ মিশ্রণের দহনে প্রচুর উত্তাপের সৃষ্টি হয়। ছবিতে R_1 ও R_2 স্টোভ দুইটি উত্তপ্ত অবস্থায় আছে এবং তাহাদের ভিতর দিয়া যথাক্রমে বাহিরের বায়ু ও প্রডিউসার গ্যাস চালনা করা হইতেছে। দহনের ফলে, চুল্লী হইতে যে উত্তপ্ত গ্যাস পরিত্যক্ত হয় তাহা সেই সময় R_3 ও R_4 স্টোভ দুইটির ভিতর দিয়া চালিত হইয়া তাহাদিগকে



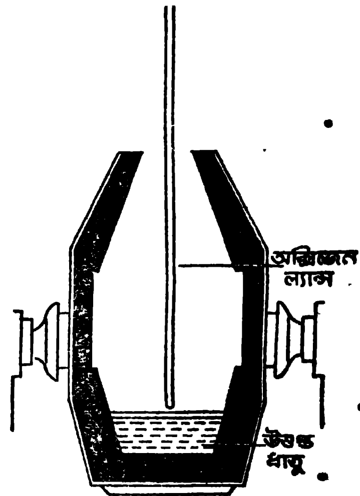
২০৬নং চিত্র—ওপেন হার্থ ফার্নেস ও সংশ্লিষ্ট স্টোভ

উত্তপ্ত করে। স্টোভের মধ্যে ফায়ার-ব্রিকের সারির ভিতর দিয়া আঁকা বাঁকা পথে গ্যাস চালিত হয়। এই কাজ বিশ মিনিট চলিবার পর V-ভাল্‌বটি ঘুরাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে এক পাশের R_1 ও R_2 স্টোভ এবং অপর পাশের R_3 ও R_4 স্টোভের মধ্যে কাজের বিনিময় হয়, অর্থাৎ তখন হইতে উত্তপ্ত R_3 ও R_4 স্টোভ দিয়া যথাক্রমে প্রডিউসার গ্যাস ও বায়ু চুল্লীতে প্রবেশ করিতে থাকে, আর R_1 ও R_2 স্টোভ দিয়া চুল্লীর উত্তপ্ত গ্যাস নির্গত হইয়া উহাদিগকে উত্তপ্ত করিতে থাকে। এই কাজ পর্যায় ক্রমে চলিতে থাকে। সাধারণ উষ্ণতায় প্রডিউসার গ্যাস ও বায়ু প্রবেশ করাইলে চুল্লীতে দহনের ফলে উষ্ণতা ১৫০০° সে. পর্যন্ত হইত; কিন্তু গ্যাস ও বায়ু পূর্বে ৫০০° সে. উষ্ণতা পর্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া চুল্লীতে পাঠাইবার ফলে সেখানে দহনের ফলে উষ্ণতার মাত্রা হয় ২০০০° সে.। এই ভাবে স্টীল তৈয়ারি করিতে কাস্ট আয়রন, লৌহ আকরিক (কার্বন দূর করিবার জন্য), সামান্য পরিমাণে বালি বা চুন (ধাতুমল গঠনের জন্য) এবং অত্যুচ্চ উষ্ণতার প্রয়োজন হয়। এই চুল্লীতে লোহা আগুন দিয়া সোজাসুজি উত্তপ্ত করা হয় না। ইহার নীচু

বাঁকানো ছাদ হইতে উত্তপ্ত গ্যাসের তাপ প্রতিফলিত হইয়া গলিত লৌহের উপর ফিরিয়া আসে। এজন্য ইহাকে **পরাবর্ত চুল্লী** (Reverberatory Furnace) বলে।

এই প্রণালীতে নির্দিষ্ট গুণসম্পন্ন স্টীল তৈয়ারি করা যায়, তবে এক বারের ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে ৮ হইতে ১৬ ঘণ্টা সময় লাগে। বেসেমার প্রণালীতে স্টীল আরও দ্রুত উৎপন্ন হয় বটে, তবে ইহাতে কোনও নির্দিষ্ট মাত্রার স্টীল বিশুদ্ধ ভাবে তৈয়ারি হয় না। বর্তমানে পৃথিবীতে শতকরা ৮০ ভাগ স্টীলই ওপেন হার্থ প্রণালীতে প্রস্তুত করা হয়।

(৩) এল-ডি প্রণালী (L-D Proccess)—রাউরকেল্লাতে এই প্রণালীতে স্টীল প্রস্তুত হইতেছে। অস্ট্রিয়ার দুইটি সহরে এই প্রণালীতে স্টীল উৎপাদনের পরীক্ষা করিয়া সাফল্য লাভ হইয়াছিল। সেই দুইটি স্থানের নামের আদি অক্ষর যথাক্রমে L ও D। সেজন্য এই প্রণালীকে এল-ডি প্রণালী বলে। বেসেমার প্রণালীতে উত্তপ্ত গলিত লৌহের ভিতর দিয়া বায়ু চালনা করিয়া সেই বায়ুর অক্সিজেন কাজে লাগানো হয়। এল-ডি প্রণালীতে বিশুদ্ধ অক্সিজেনের ধারা খুব উচ্চ চাপে নলের মধ্য দিয়া তরল লৌহের ভিতরে চালনা করা হয়। ইহাতে লৌহের সঙ্গে মিশ্রিত কার্বন খুব দ্রুত দূরীভূত হয় এবং মাত্র ২৫ মিনিটে স্টীল প্রস্তুত হইয়া যায়। তবে ওপেন হার্থ প্রণালীতে যেমন কোনও নির্দিষ্ট মাত্রার কার্বন-সমন্বিত স্টীল প্রস্তুত করা যায় এল-ডি প্রণালীতে সেই সুযোগ কম।



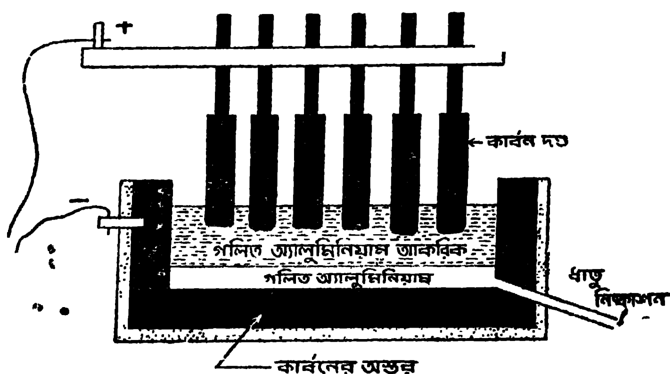
২০৭নং চিত্র—এল-ডি প্রণালীতে স্টীল উৎপাদন

স্টীলের ব্যবহার—স্টীলের মধ্যে কার্বনের পরিমাণ শতকরা ·১ হইতে ১·৫ ভাগ। ইহাতে কার্বনের পরিমাণ যতই বেশি থাকে ইহার কাঠিন্যও তত বেশি হয়। ইস্পাত হইতে সূচ, আলপিন, ফাউন্টেন

পেনের নিব, ঘড়ির ও অন্য সব রকমের স্প্রিং, জানালার গরাদে, ছাদের কড়ি, ছুরি-কাঁচি (শতকরা '৭ ভাগ কার্বন), রেঁদা (১'৩), শিকল ('০৫), গাড়ির চাকা ('৪), পুল ('২৫), রেল লাইন ('৫৫) প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। আজকাল বিশুদ্ধ লোহায় বিবিধ ধাতু অল্প পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া বিশেষ গুণসম্পন্ন স্টীল প্রস্তুত করা হয়। **ক্রমিয়াম-নিকেল-স্টীলে** শতকরা ২৮ ভাগ ক্রমিয়াম ও ৮ ভাগ নিকেল থাকে। ইহাতে মরিচা ধরেনা। ইহা দ্বারা ঘড়ির আবরণ, ছুরি, কাঁটা, চামচ, থালা, বাটি প্রভৃতি তৈয়ারি হয়। **নিকেল-স্টীলে** শতকরা ৬ ভাগ পর্যন্ত নিকেল থাকে। ইহাতে মরিচা ধরে না। ইহা দ্বারা ঘড়ির অংশ, বন্দুক ও মোটর কারের অংশ তৈয়ারি করা হয়। **টাংস্টেন-স্টীলে** শতকরা ১৮ ভাগ টাংস্টেন এবং ৪ হইতে ৬ ভাগ ক্রমিয়াম থাকে। ইহা দ্বারা ধাতু কাটিবার যন্ত্র প্রস্তুত করা হয়।

অ্যালুমিনিয়াম, তামা ও দস্তা

অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium)—অ্যালুমিয়াম একটি অতি প্রয়োজনীয় ধাতু। ভূস্তরে শতকরা ৮ ভাগ অ্যালুমিনিয়াম রহিয়াছে। অথচ একশত বৎসর পূর্বেও অ্যালুমিনিয়াম খুব সামান্য পরিমাণেই



২০৮নং চিত্র—বিদ্যুৎ-চুল্লীতে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন

উৎপন্ন হইত। সেজন্য তখন এক ছটাক অ্যালুমিনিয়ামের মূল্য ২০০ টাকা ছিল। পরবর্তী কালে তড়িৎ-শক্তির আবিষ্কার ও প্রয়োগের ফলে

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যথেষ্ট পরিমাণে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন সম্ভবপর হইয়াছে। এখন অ্যালুমিনিয়ামের বাসনের প্রতি ছটাকের দাম মাত্র ৬৬ পয়সা।

যে আকরিক হইতে বর্তমানে অ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন করা হয় তাহার নাম **বক্সাইট** (Bauxite)। ইহা জলের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের একটি যৌগ। একটি ইলেকট্রিক ফার্নেসে ক্রায়োলাইট (Cryolite) নামক আকরিক গলাইয়া তাহার মধ্যে বক্সাইট পরিষ্কার করিয়া দ্রবীভূত করিতে হয়। ফার্নেসটির বাহিরের দিক স্টীলে তৈয়ারি; ইহার ভিতরের গাত্রে কার্বনের (গ্রেফাইট) পুরু অস্তর রহিয়াছে। ইহা হইল তড়িৎ-চুল্লীর নেগেটিভ তড়িদ্দ্বার। চুল্লীর উপর দিক হইতে এক সারি কার্বন দণ্ড গলিত অ্যালুমিনিয়াম আকরিকে কিয়ৎ পরিমাণে ডুবাইয়া রাখা হয়। এগুলি হইল পজিটিভ তড়িদ্দ্বার। চুল্লীর ভিতর দিয়া তড়িৎপ্রবাহ চলিতে থাকিলে নেগেটিভ তড়িদ্দ্বারে অ্যালুমিনিয়াম এবং পজিটিভ তড়িদ্দ্বারে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। তরল অবস্থায় অ্যালুমিনিয়াম গলিত ক্রায়োলাইটের নীচে জমিতে থাকে এবং যথাসময়ে নীচের নির্গমপথ দিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয়।

মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের বিভিন্ন স্থানে অ্যালুমিনিয়াম আকরিক পাওয়া যায়। আজকাল অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্রের খুব বেশি প্রচলন। অ্যালুমিনিয়াম খুব হালকা বলিয়া এরোপ্লেন নির্মাণে ইহা ব্যবহার করা যায়। অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণ তিসির তেলে মিশাইয়া সাদা চকচকে রং হিসাবে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। অ্যালুমিনিয়ামের পাত পিটাইয়া কাগজের মত পাতলা করিয়া তাহা সিগারেটের প্যাকেটে এবং চকোলেট ইত্যাদি মুড়িবার জন্য ব্যবহার করা হয়।

তামা (Copper)—পৃথিবীর স্তরে তামার ভাগ খুবই কম। কোন কোন স্থানে তামার আকরিক **কপার অক্সাইড** রূপে থাকে। তাহা ব্লাস্ট ফার্নেসে কোক দিয়া পুড়াইলে তাহা হইতে তামা নিষ্কাশন করা যায়। তামার প্রধান আকরিক হইল **কপার পিরাইটিস** (Copper Pyrites)। ইহা গন্ধক ও লোহের সঙ্গে তামার একটি যৌগ। আমাদের দেশে তামার আকরিক খুব বেশি নাই। সিংহভূম, উড়িষ্যা ও উত্তর প্রদেশে তামার আকরিক রহিয়াছে। পিরাইটিসের লোহা এবং গন্ধক হইতে তামা মুক্ত করিতে হইলে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। সিংহভূমে যে আকরিক আছে

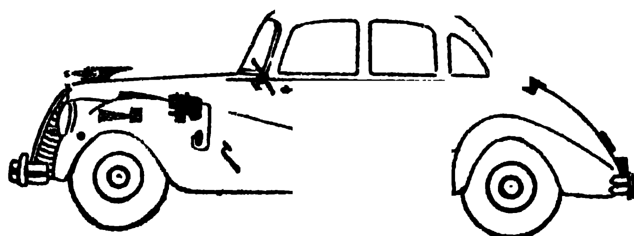
তাহা রূপার পিরাইটিস। ঘাটশিলাতে পিরাইটিস হইতে আধুনিক পদ্ধতিতে তামা প্রস্তুত করার একটি কারখানা আছে।

তামার ব্যবহার—তড়িৎ-পরিবাহক হিসাবে রূপার পরেই তামার স্থান। রূপা অত্যন্ত দামী জিনিস বলিয়া তড়িৎ-সরবরাহের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তামার তার ব্যবহার করা হয়। গৃহস্থালির কোন কোন বাসন তামা হইতে প্রস্তুত হয়। ৭৫ ভাগ তামার সঙ্গে দস্তা মিশাইয়া পিতল তৈয়ারি করা হয়। গৃহস্থালিতে পিতলের বাসনের প্রচলন আছে। ৬০ হইতে ৮৫ ভাগ তামার সঙ্গে টিন মিশাইয়া কাঁসা (Bell-metal) প্রস্তুত করা হয়। কাঁসার বাসন পিতলের বাসন হইতে উৎকৃষ্ট। কাঁসা দ্বারা ঘণ্টা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

দস্তা (Zinc)—দস্তা বা জিঙ্কের প্রধান আকরিক হইল **জিঙ্ক-ব্লেণ্ড** (Zinc-Blende)। ইহা দস্তা ও গন্ধকের যৌগিক। ইহাকে চুল্লীর মধ্যে উত্তপ্ত বায়ুর সাহায্যে জারিত করিলে উহা জিঙ্ক-অক্সাইডে পরিণত হয়। উৎপন্ন জিঙ্ক-অক্সাইড কোকের সঙ্গে পুড়াইলে বিজারণের (Reduction) ফলে জিঙ্ক উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে দস্তার আকরিক যাহা আছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রচুর। এজন্য বিদেশ হইতে দস্তা আমদানি করিতে হয়।

দস্তার ব্যবহার—পিতল, জার্মান-সিলভার প্রভৃতি সংকর ধাতু প্রস্তুতিতে দস্তার প্রয়োজন হয়। গলিত দস্তায় ইস্পাতের পাত ডুবাইয়া ইহার উপর দস্তার অস্তর লাগানো হয়। এভাবে ইস্পাত মরিচা পড়া হইতে রক্ষা করা হয়। দস্তার প্রলেপ দেওয়া ঢেউখেলানো ইস্পাতের চাদরই হইল ঘরের চালের 'টিন'। জলের বালতি, ড্রাম, স্নানের টব প্রভৃতি এই জাতীয় চাদর হইতেই প্রস্তুত হয়।

দস্তা অন্য ধাতুর সঙ্গে গলাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া ইহার সংকর ধাতু হইতে



২০১ নং চিত্র—মোটর কারে দস্তার সংকরধাতু-নির্মিত অংশ

নানা জিনিস তৈয়ারি করা যায়। একটি আধুনিক মোটর কারের প্রায়

২৫০টি অংশ দস্তার সংকর ধাতু ঢালাই করিয়া তৈয়ারি করা হয়। ছবিতে এরূপ কতকগুলি অংশ কালো রঙে দেখানো হইয়াছে।

ভারতবর্ষে লৌহ ও অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে, কিন্তু তামা, সীসা ও দস্তার আকরিক প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর। এজন্য অ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইয়া তাহা দ্বারা অন্তত তামার ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা হইতেছে। বিদ্যুৎ-পরিচালনার জন্য অ্যালুমিনিয়ামের তার ব্যবহার করা যায়। আর পিতল ও কাঁসার বাসনের পরিবর্তে অ্যালুমিনিয়ামের বাসন আরও বেশি ব্যবহার করিলে তামার চাহিদা আরও কমিয়া যাইবে।

প্রশ্ন

১। আমাদের দেশে কোথায় লৌহ আকরিক পাওয়া যায়? ব্লাস্ট ফার্নেসের চিত্র আঁকিয়া তাহার সাহায্যে লৌহ-নিষ্কাশন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২। ব্লাস্ট ফার্নেস হইতে নির্গত উত্তপ্ত গ্যাস কি ভাবে কি কাজে লাগানো হয় চিত্রের সাহায্যে বুঝাইয়া বল।

৩। ব্লাস্ট ফার্নেসে কি কি রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে লৌহ আকরিক হইতে লৌহ উৎপন্ন করা হয়?

৪। ব্লাস্ট ফার্নেস হইতে যে লৌহ পাওয়া যায় তাহার উপাদান কি কি? লৌহ কয় প্রকার এবং তাহাদের ব্যবহার কি কি?

৫। লৌহ হইতে কি কি প্রণালীতে স্টীল প্রস্তুত করা হয়? বিভিন্ন প্রণালীর উপযোগিতা ও উৎপাদনের হার কিরূপ?

৬। চিত্রের সাহায্যে ওপেন হার্থ প্রণালীতে স্টীল প্রস্তুতি বর্ণনা কর।

৭। স্টীল বর্তমান সভ্যতা ও শিল্পোন্নয়নের মেরুদণ্ড, এই কথাটির অর্থ কি? এই সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের স্টীলের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ কর।

৮। অ্যালুমিনিয়াম কি ভাবে কোন আকরিক হইতে প্রধানত উৎপন্ন করা হয় চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

৯। তামা হইতে কি কি সংকর ধাতু প্রস্তুত করা হয় এবং সেই সব দিয়া কি কি কাজ হয়?

১০। আমাদের দেশে তামার আকরিকের অপ্রাচুর্য হেতু কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে?

১১। দস্তা দিয়া কি কি কাজ হয় দৃষ্টান্ত দ্বারা লিখ।

১২। তোমাদের ব্যবহৃত বাসনপত্র, হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতিতে এবং গৃহনির্মাণে কি কি ধাতুর প্রয়োজন হয় অনুসন্ধান করিয়া বল।

বিষয়গত প্রশ্ন

(নির্দেশ পূর্বের ন্যায়)

১। ঠিক উক্তি নির্বাচন

(ক) সব ধাতু-নিষ্কাশনেই তাপের প্রয়োজন হয়। ——

(খ) ব্লাস্ট ফার্নেসে ঠাণ্ডা বায়ু চালনা করিয়া লৌহ-উৎপাদন করা যায়। ——

(গ) কার্বন-সংযোগে লোহা অধিক ভঙ্গুর হয়। ——

(ঘ) টিন ছাড়া ঘরের চালের 'টিন' ও বালতি প্রস্তুত করা যায়। ——

(ঙ) পিতল প্রস্তুতের জন্য টিনের প্রয়োজন হয়। ——

২। শূন্যস্থান পূরণ

ব্লাস্ট ফার্নেসে অন্তত——(১)টি স্টোভের ——(১)

প্রয়োজন, কারণ যখন——(২)টি দিয়া ——(২)

বাহিরের বায়ুস্রোত——(৩) হইয়া প্রবেশ করিতেছে ——(৩)

তখন আর——(৪)টিকে ফার্নেস হইতে নির্গত ——(৪)

গ্যাসদ্বারা——(৫) করিতে হয়। ——(৫)

৩। কয়েকটি উত্তরের মধ্যে ঠিক উত্তর নির্বাচন

স্টীল-প্রস্তুতির জন্য খুব উচ্চ উষ্ণতার প্রয়োজন এবং সে জন্য স্টোভসহ পরাবর্ত চুল্লী ব্যবহার করা হয়। কারণ ——

(১) এই চুল্লীতে দুইটি গ্যাসের প্রজ্বলনে খুব বেশি উষ্ণতার সৃষ্টি হয়।

(২) এই চুল্লীর ভিতরের দিক হইতে তাপ বিকীর্ণ হইয়া গলিত লৌহের উপর পড়ে।

(৩) এই চুল্লীতে জ্বালানী গ্যাস ও বায়ু পূর্বে উত্তপ্ত করিয়া প্রবেশ করান হয় এবং ইহার ভিতরে তাপ বিকীর্ণ হইয়া গলিত লৌহের উপর পড়ে।

জীব জগৎ

১

অ্যামিবা, স্পাইরোজীরা ও ইস্ট

(Amoeba, Spirogyra and Yeast)

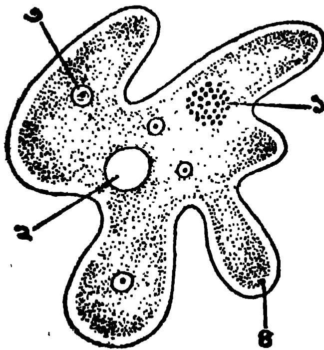
তোমাদের আশে পাশে যাহা কিছু দেখিতে পাও তাহার মধ্যে যাহাদের জীবন আছে তাহারাই হইল জীব। তবে জীবন বলিতে কি বুঝায়? কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দেখিয়া জীবনের অস্তিত্ব বুঝিতে হয়। জীবনের সেই লক্ষণগুলি হইল—অঙ্গসঞ্চালন ও চলাফেরা করা, শ্বাস-প্রশ্বাস চালানো, আহার করা, আহার্যবস্তু দেহসাৎ করিয়া পুষ্টিসাধন, আঘাত-উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া, বংশবৃদ্ধি করা। ইহা ছাড়া জীবমাত্রেরই হয় জন্ম আর মৃত্যু। এই হিসাবে, কোন কোন বিষয়ে সামান্য পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যাবতীয় উদ্ভিদ এবং প্রাণী জীবের পর্যায়ে পড়ে। যাহাদের মধ্যে এসব লক্ষণ দেখা যায় না তাহারা জীব নয়।

আদি স্তরের জীব অর্থাৎ আদি প্রাণী ও আদি উদ্ভিদ হইতে অভিব্যক্তির ফলে যে নব নব জাতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা তোমরা পূর্বে জানিয়াছ। প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে একটা মূল পার্থক্য হইল তাহাদের খাদ্যগ্রহণ ব্যাপারে। সবুজ রঙের উদ্ভিদ পাতার ঐ রঙের ক্লোরোফিলের সাহায্যে সূর্যালোকে শক্তিমান হইয়া সরল গঠনের পদার্থ হইতে জটিল গঠনের খাদ্য যেমন শ্বেতসার প্রস্তুত করিয়া নেয়। প্রোটিন খাদ্যও তাহার নিজ দেহেই গঠিত হয়। কাজেই খাদ্যব্যাপারে তাহারা অনেকটা স্বাবলম্বী। প্রাণী সে ভাবে নিজ দেহে খাদ্য প্রস্তুত করিয়া নিতে পারে না; সেজন্য তাহাকে জটিল গঠনের খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিতে হয়।

উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের কোষের গঠনেও পার্থক্য রহিয়াছে। কোষ হইল জীবদেহের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, সম্পূর্ণ অংশ এবং সমস্ত শক্তি ও বৈচিত্র্যের মূল। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই কোষ দেখা যাইতে পারে। একটি বাড়ি যেমন ইটের সঙ্গে ইট মিলাইয়া তৈয়ারি করিতে হয় সেইরূপ জীবদেহও অসংখ্য কোষের মিলনে গঠিত।

এই কোষের গঠনের উপাদান হইল প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm)। পূর্বে জীবনের কতকগুলি লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ লক্ষণগুলির

মূলে রহিয়াছে জীবদেহের এই প্রোটোপ্লাজম। উদ্ভিদ ও প্রাণী, উভয়ের দেহ-কোষেই প্রোটোপ্লাজম রহিয়াছে। কোষের প্রায় সমস্তটাই হইল, টল্ টলে ও স্বচ্ছ প্রোটোপ্লাজম। উদ্ভিদ-কোষের প্রোটোপ্লাজম একটি পাতলা আবরণে ঢাকা।• ঐ আবরণটিকে কোষপ্রাচীর বলে। প্রাণীর কোষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না। কোষের ভিতর প্রোটোপ্লাজমের সমস্ত অংশ একরূপ নহে; মধ্য স্থলের একটি অংশ বাকী অংশ অপেক্ষা বেশি গাঢ়। এই অংশটির নাম **নিউক্লিয়াস** (Nucleus)। ইহা কোষের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ। ইহাই কোষের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করে। এখন আমরা আদিস্তরের জীবের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমরা পরিবেশে যে সব জীব দেখিতে পাই তাহাদের দেহ অসংখ্য কোষের সমাবেশে গঠিত। কিন্তু এমন অনেক প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদ রহিয়াছে যাহাদের সমগ্র দেহটি মাত্র একটি কোষ দ্বারা গঠিত। ইহাদের দেহ এত ক্ষুদ্র যে মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে ইহাদিগকে দেখিতে হয়। ইহাদিগকে এককোষ-দেহী জীব বলে। ইহারাই প্রাণিজগতের **প্রোটোজোয়া** বা **আন্তপ্রাণী**। ইহার দৃষ্টান্ত হইল **অ্যামিবা**। উদ্ভিদ জগতে আদিজীবের দৃষ্টান্ত হইল **শৈবাল** বা **অ্যালজী** (Algae)। এবিষয়ে ২১৬নং চিত্র দেখ।



২১০নং চিত্র—অ্যামিবা (১৮০ গুণ বড়)
১। নিউক্লিয়াস ২। ভ্যাকুওল
৩। খাদ্য-ভ্যাকুওল ৪। কৃত্রিম পা

অ্যামিবা—পুকুরের পাঁকের গায়ে এই প্রাণীর সন্ধান মিলে। একটু চেষ্টা করিলে খালি চোখেও ইহাকে দেখা যায়। ইহার দেহের বিভিন্ন অংশ মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখিতে হয়। মাইক্রোস্কোপের ভিতর দিয়া ইহার সমস্ত দেহটি খানিকটা পরিষ্কার আঠার ন্যায় টল্ টল্ করিতেছে দেখা যায়। ইহাই হইল তাহার দেহের প্রোটোপ্লাজম। ঐ প্রোটোপ্লাজম কিনারার দিকে খুবই পরিষ্কার; মধ্যের অংশ ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র দানায় ভর্তি মনে হয়। ইহারও ভিতরের দিকে একটি গোলাকার স্থান আরও ঘন ভাবে দানায় ভর্তি। ঐ স্থানকে **নিউক্লিয়াস** বলে। দেহের প্রায় মধ্য ভাগে একটি পরিষ্কার গোলাকার স্থান নজরে পড়ে। ইহা জলীয় পদার্থে পূর্ণ। ইহাকে

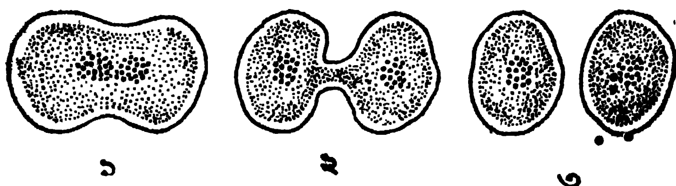
ভ্যাকুওল (Vacuole) বলে। ছবিতে আর যে সব কালো অংশ দেখিতেছ তাহা হইল খাদ্যের টুকরা। ঐগুলি স্থানে স্থানে তরল পদার্থ দ্বারা আবদ্ধ থাকে। ঐগুলির নাম **খাদ্য-ভ্যাকুওল**। শরীরের বিভিন্ন অংশ একই কোষের মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া অ্যামিবাকে **এককোষ-দেহী প্রাণী** বলে। এখন দেখা যাউক ইহার ভিতরে জীবের লক্ষণ গুলি কি ভাবে প্রকাশ পায়।

চলাফেরা—অ্যামিবার হাত-পা কিছুই নাই বটে, তবে একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে ইহার চেহারা ক্রমাগত বদলাইতেছে। যাহা এইমাত্র গোলাকার ছিল পরক্ষণেই তাহা হইতে এক দিকে একটি পায়ের মত অংশ বাহির হইল এবং সমস্ত অ্যামিবাটি ইহার সাহায্যে ঐ দিকে সরিয়া গেল। ঐ অংশকে **কৃত্রিম পা** বলে। একদিকে এরূপ চলার কারণ হইল কোন খাদ্যকণা সংগ্রহ করা বা অন্য কোন কারণে সে দিকে সরিয়া পড়া।

শ্বাস-প্রশ্বাস ও খাদ্যগ্রহণ—অ্যামিবা তাহার সমস্ত শরীর দিয়াই বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে। ইহার খাইবার প্রণালী অদ্ভুত। কোন খাদ্যবস্তু কাছে পড়িলে শরীরের এক দিক বিস্তৃত করিয়া ঐটি ঘিরিয়া নিজের দেহের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। এভাবে খাদ্য-ভ্যাকুওলের সৃষ্টি হয়। সেখানে আবদ্ধ বস্তুটি ধীরে ধীরে উহার মধ্যে মিশিয়া যায়। ইহা হইল অ্যামিবার দেহে খাদ্যপরিপাকের ব্যবস্থা। শৈবাল শ্রেণীর অতি ক্ষুদ্র এককোষ-দেহী উদ্ভিদ অ্যামিবার খাদ্য।

উত্তেজনায় সারা—অ্যামিবার চোখ, কান ও নাক বলিয়া কোন নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয় নাই। তবুও ইহারা উত্তেজনায় সারা দেয়। অন্ধকার স্থান হইতে ইহারা আলোর দিকে যায় এবং খাদ্যবস্তু যে দিকে থাকে সেদিকে শরীর বিস্তৃত করিয়া দেয়।

বংশবৃদ্ধি—অ্যামিবার বংশবৃদ্ধির প্রণালীও অদ্ভুত। খাদ্যগ্রহণের



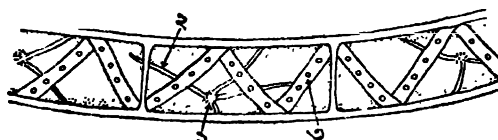
২১১ নং চিত্র—অ্যামিবা দেহ ভাগ করিয়া বংশবৃদ্ধি করে

ফলে অ্যামিবার দেহ যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তখন ইহার নিউক্লিয়াস দুই ভাগে

বিভক্ত হইতে থাকে। তাহার পর দেহের অন্যান্য অংশ আস্তে আস্তে বিভক্ত হওয়ার ফলে নিউক্লিয়াস সমেত দুইটি অ্যামিবার সৃষ্টি হয়।

স্পাইরোজীরা (Spirogyra)—তোমরা উদ্ভিদ-জগতের আদিজীব শৈবাল বা অ্যালজীর কথা জান। উদ্ভিদ বলিলে কাণ্ড, শিকড়, পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদির কথা মনে হয়। কিন্তু এই জাতীয় উদ্ভিদে ঐ সকল স্বতন্ত্র অংশ নাই। ইহাদের আগাগোড়াই একরকম।

এই জাতীয় সকল উদ্ভিদেই ক্লোরোফিল আছে। পুকুরের জলের রঙ সবুজ দেখিলেই এই জাতীয় শৈবাল রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। এককোষ-দেহী অতি ক্ষুদ্র অ্যালজী হইতে আরম্ভ করিয়া বহুকোষ বিশিষ্ট বৃহদাকার অ্যালজী সমুদ্রে দেখা যায়। পৃথিবীতে প্রায় ১৮,০০০ রকমের অ্যালজী আছে। অ্যালজী সবুজ ছাড়া অন্য রঙেরও হইতে পারে লোহিত সমুদ্রের জলের তামাটে রঙ উহাতে ভাসমান এই রঙের অ্যালজীর জন্য।

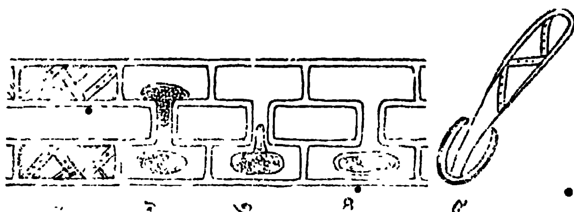


২১২নং চিত্র—স্পাইরোজীরা—১০০ গুণ বড়
১। নিউক্লিয়াস ২। নিউক্লিয়াস ধরিয়া রাখার সূত্র
৩। ক্লোরোপ্লাস্ট

স্পাইরোজীরা অ্যালজীজাতীয় উদ্ভিদ। ছবিতে দেহকোষগুলি পর পর সজ্জিত হইয়া ইহার অতি সরল ধরণের সূতার মত দেহ গঠন করিয়াছে। প্রত্যেকটি কোষে **নিউক্লিয়াস** ও **নিউক্লিয়াস ধরিয়া রাখার সূত্র** রহিয়াছে। আর ইহার ভিতরে সবুজ রঙের ফিতার মত সরু প্যাঁচানো অংশ দেখা যায়। ইহার নাম **ক্লোরোপ্লাস্ট**। প্যাঁচানো বা স্পাইরেল অংশ (Spiral) আছে বলিয়াই ইহার নাম স্পাইরোজীরা। ইহাতে ক্লোরোফিল রহিয়াছে বলিয়া ইহার রঙ সবুজ। প্রত্যেকটি কোষে বাহিরের প্রাচীর রহিয়াছে। তাহার ভিতরে আছে প্রোটোপ্লাজম। ক্লোরোফিল থাকায় ইহা জল ও বায়ু হইতে উপাদান নিয়া নিজের খাদ্য তৈয়ারি করিয়া নিতে পারে। বায়ুর অক্সিজেনের সাহায্যে ইহার কোষগুলি শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করে।

স্পাইরোজীরার বংশবৃদ্ধি দুই রকমে হইয়া থাকে। প্রথম প্রথাটি হইল অ্যামিবার মত পর পর কোষ বিভাগের ফলে। অপরটির জন্য দুই রকমের

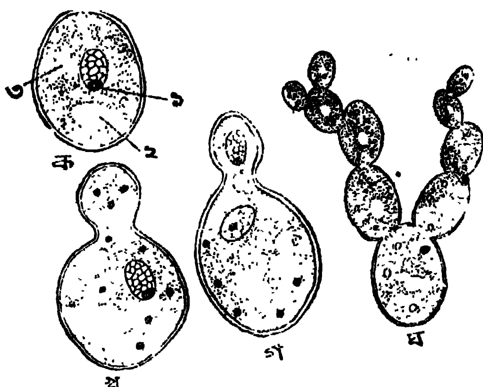
কোষের মিলন আবশ্যক। ছবিতে দেখ দুইটি স্পাইরোজীরা পাশাপাশি আসিয়াছে। ২, ৩ ও ৪-চিহ্নিত কোষের জোড়াগুলির মধ্যবর্তী প্রাচীর



২১৩নং চিত্র—দুইটি স্পাইরোজীরার মিলনে নূতন কোষের উৎপত্তি

বাহিরের দিকে বর্ধিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইয়াছে। ফলে কোষের জোড়াগুলির মধ্যে সুড়ঙ্গপথের সৃষ্টি হইয়াছে, আর সেই পথ দিয়া একটি স্পাইরোজীরার কোষ হইতে সমস্ত পদার্থ উহার সম্মুখবর্তী অপরটির কোষে প্রবেশ করিতেছে। ছবিতে ৪-চিহ্নিত স্থানে দুই কোষের পদার্থের মিলন সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং সেই মিলিত পদার্থের বাহিরের প্রাচীরও গঠিত হইয়াছে। তাহার পর ঐ মিলিত পদার্থ কোষপ্রাচীর ভেদ করিয়া বাহিরে আসে এবং প্যাচানো ক্লোরোপ্লাস্টবিশিষ্ট নূতন স্পাইরোজীরাতে পরিণত হয়।

ইস্‌ট (Yeast)—ইহা একটি এককোষ-দেহী উদ্ভিদ। ইহাতে ক্লোরোফিল না থাকায় সবুজ উদ্ভিদের মত ইহা নিজ খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না। ইস্‌টের কোষে নিউক্লিয়াস, ভ্যাকুওল ও খাদ্য-ভ্যাকুওল রহিয়াছে। আর ইহা উদ্ভিদ বলিয়া ইহার কোষের প্রাচীরও আছে।



২১৪নং চিত্র—৩০০০ গুণ বড়
(ক) ইস্‌ট (১) নিউক্লিয়াস (২) ভ্যাকুওল (৩) খাদ্য-ভ্যাকুওল
(খ), (গ), (ঘ)—বংশবৃদ্ধির বিভিন্ন অবস্থা

এই জাতীয় কতকগুলি উদ্ভিদ মানুষের অনিষ্টকারী। ইস্‌ট মানুষের কাজে সহায়তা করিয়া থাকে। ইহার সাহায্যে শর্করাজাতীয় পদার্থ

রূপান্তরিত হইয়া অ্যালকোহলে পরিণত হয়। মানুষ তাহার রক্তে ও পেশিতে যে-চিনি (গ্লোকোজ) থাকে তাহার সঙ্গে বাহিরের অক্সিজেনের মিলন ঘটাইয়া তাহা হইতে শক্তি পাইয়া থাকে। চিনির দ্রবণের মধ্যে ইস্‌ট থাকিলে বাহির হইতে অক্সিজেন পাইতে পারে না। ফলে ইস্‌ট চিনি হইতেই অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া চিনিকে অ্যালকোহল ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডে পরিবর্তিত করে। এই প্রক্রিয়ায় যে শক্তি উৎপন্ন হয় ইস্‌ট তাহা হইতে পুষ্ট হইয়া বংশবৃদ্ধি করে। ইস্‌টের এই বিশেষ ক্ষমতাকে মানুষ অ্যালকোহল তৈয়ারি করার কাজে লাগাইয়া থাকে।

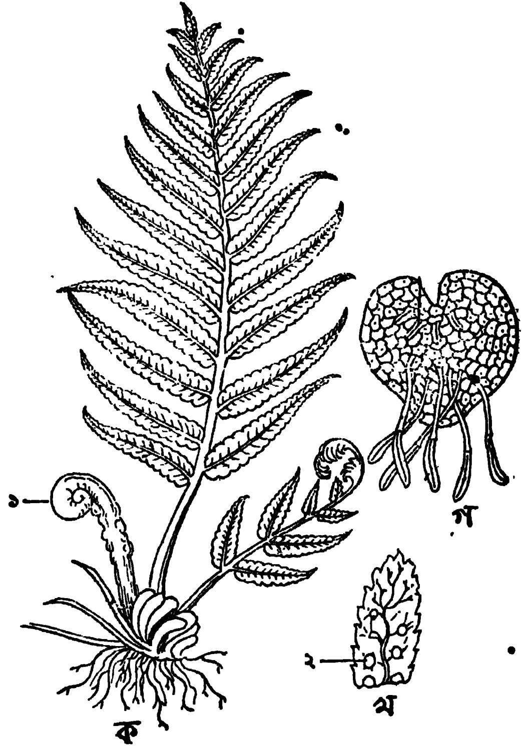
রুটি প্রস্তুতের জন্য ময়দা গাঁজাইতে ইস্‌ট ব্যবহার করা হয়। ইহা হালকা বাদামী রঙের গুঁড়া। রুটির ময়দাতে ইস্‌ট মিশাইয়া নিলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। রুটি সেকাব সময় কার্বন-ডাই-অক্সাইড রুটিকে ফুলাইয়া তোলে। ইস্‌ট হইতে যথেষ্ট ভাইটামিন পাওয়া যায়।

যথেষ্ট খাদ্য পাইলে ইহারা তাড়াতাড়ি বংশবৃদ্ধি করে। তাহাদেব শরীরের এক অংশ ফুলিয়া উঠে এবং ফোলা অংশ ধীরে ধীরে বাড়িয়া নিউক্লিয়াসসহ পৃথক্‌ হইয়া আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের ইস্‌ট সৃষ্টি করে (খ ও গ চিত্র দেখ)। যে তরল পদার্থের মধ্যে ইস্‌ট বাড়িতে থাকে তাহাতে নাড়াচাড়া না পড়িলে নবজাত ইস্‌টগুলি সম্পূর্ণ পৃথক না হইয়া এক সঙ্গেই লাগিয়া থাকে (ঘ চিত্র দেখ)। ইস্‌টের এই প্রণালীতে বংশবৃদ্ধি অনেকটা গাছে মুকুল গজাইবার মত। এজন্য এই প্রণালীকে **মুকুলবৃদ্ধি-প্রণালী** (Budding) বলে।

২

ফার্ন (Fern)

ফার্ন অপুষ্পক শ্রেণীর উদ্ভিদ। ইহা বাড়ির আশে পাশে আর্দ্র স্থানে জন্মিয়া থাকে। অপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে ইহাই সবচেয়ে উচ্চ স্তরের। সপুষ্পক উদ্ভিদের সঙ্গে ইহার এক বিষয় ছাড়া অন্য প্রায় সব বিষয়ে মিল রহিয়াছে। ইহা হইল তাহার বংশ-বিস্তার পদ্ধতি। ইহার কাণ্ড মাটির নীচ দিয়া প্রায় অনুভূমিক ভাবে বিস্তৃত হয়। সেই কাণ্ড হইতে প্যাঁচানো কোমল পাতা বাহির হয়। সেই পাতা বড় হইলে তাহার প্যাঁচ খুলিয়া যায় এবং পাতা ছড়াইয়া পড়ে।



২১০নং চিত্র—ক—ফার্ন ; (১) ঐ পাতা ; খ—পাতার উল্টাপিঠ ; (২) রেণুকোটর ; গ—প্রোথ্যালাস

বংশবিস্তার— ফার্নের যখন ফুল হয় না, তখন তাহার ফলও হয় না। তবে ইহার বংশ-বিস্তার হয় কি ভাবে ? তাহাই আলোচনা করা হইবে। একটি পাতার তলার দিকে উল্টাইয়া দেখিলে উহাতে ছোট ছোট সবুজ উঁচু জিনিস নজরে পড়িবে। এগুলিতেই ফার্নের বংশবিস্তারের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহাদের ভিতরে কোটরের মধ্যে এক প্রকার রেণু জন্মে। লক্ষ লক্ষ এই রেণু কোটরের মধ্য হইতে ভিজা মাটিতে পড়ে। ফলে এক নূতন ফার্ন বংশের

উদ্ভব হয়। এই বংশটি সত্য সত্যই নূতন। কারণ যে ফার্নের রেণু হইতে ইহার জন্ম তাহার সঙ্গে এই বংশের কোন সাদৃশ্য নাই। এই নূতন উদ্ভিদ গুলি আকৃতিতে অনেকটা ছোট পানের মত; তলার দিকে উহারা কতকগুলি শুঁড়ের সাহায্যে মাটির সহিত আবদ্ধ থাকে। ইহাদিগকে প্রোথ্যালাস (Prothallus) বলে। এই প্রোথ্যালাসের নীচের পিঠে পুং-জননযন্ত্র বা পুং-ধানী এবং স্ত্রী-জননযন্ত্র বা স্ত্রী-ধানী রহিয়াছে। বাদলা আবহাওয়ায় পুংজনন কোষ পাতার গায়ের জলের আস্তরণের মধ্য দিয়া সাঁতরাইয়া স্ত্রী-ধানীতে গিয়া ডিম্বকোষের সহিত মিলিত হয়। ইহাদের মিলনে প্রোথ্যালাসের মধ্যে যে বীজ উৎপন্ন হয় তাহা হইতে আবার সেই আগেকার ফার্নবংশের উদ্ভব হয়। ফার্নের জননব্যাপারে পর্যায়ক্রমে দুইটি ভিন্ন ধারা রহিয়াছে।

কারুকার্যময় সুন্দর পাতার জন্য নানা জাতীয় ফার্ন অনেকে মাটির টবে বাড়িতে রাখেন। ইহা ছাড়া ফার্ন আমাদের কোন কাজে লাগে না।

প্রশ্ন

১। অ্যামিবার গঠন ও জীবন-ইতিহাস চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

২। অ্যামিবার স্বাভাবিক মৃত্যু নাই—এই কথার অর্থ কি ?

৩। স্পাইরোজীরা কোন্ পর্বের জীব ? চিত্রের সাহায্যে ইহার কোষের গঠন বর্ণনা কর।

৪। স্পাইরোজীরার বংশবৃদ্ধি কি ভাবে হয় ?

৫। ইস্‌টের জীবন-ইতিহাস চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর। ইস্‌ট আমাদের কি কি কাজে লাগে ?

৬। ফার্ন কোন্ পর্বের উদ্ভিদ ? ইহার বংশবিস্তার কি ভাবে হয় ?

বিষয়গত প্রশ্ন

(নির্দেশ পূর্বের ন্যায়)

১। ঠিক উক্তি নির্বাচন

(ক) অ্যামিবা ও উচ্চস্তরের প্রাণীর বংশবৃদ্ধি একই রকমে হয়। ——

(খ) স্পাইরোজীরা ও অ্যালজী একই পর্বের উদ্ভিদ। ——

(গ) সব স্পাইরোজীরা এককোষদেহী উদ্ভিদ। ——

(ঘ) ইস্‌ট অক্সিজেন ছাড়াও বাঁচিতে পারে। ——

(ঙ) ফার্নের বংশবৃদ্ধিতে একাধিক পর্যায় রহিয়াছে। ——

২। শূন্যস্থান পূরণ

স্পাইরোজীরার কোষে——(১) আছে, ——(১)

সেজন্য খাদ্যব্যাপারে ইহা——(২)। ——(২)

ইস্‌টের দেহে——(৩) নাই ; সেজন্য ——(৩)

খাদ্যব্যাপারে ইহা——(৪) মত ——(৪)

——(৫) উপর নির্ভর করে। ——(৫)

৩। কয়েকটি উত্তরের মধ্যে ঠিক উত্তর নির্বাচন

ইস্‌ট চিনির দ্রবণে থাকিলে বাহিরের অক্সিজেন ছাড়াই সংখ্যায় দ্রুত বাড়িয়া যায়। কারণ ——

(ক) দ্রবণের মধ্যে যে বায়ু মিশ্রিত থাকে তাহাই ইস্‌ট গ্রহণ করিতে পারে।

(খ) ইস্‌ট শর্করা হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া তাহাকে অ্যালকোহল ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডে পরিবর্তিত করে।

(গ) ইস্‌টের বাহিরের বায়ু সরাসরি গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই।

অভিব্যক্তি, বংশগতি ও অভিযোজন

(Evolution, Heredity and Adaptation)

অভিব্যক্তি—বিচিত্র এই পৃথিবীর বুকে অসংখ্য জীবনের সমারোহ দেখিয়া কে না মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়! উদ্ভিদ আর প্রাণী, এই বিচিত্র জীবনের ধারক ও বাহক। সাধারণের ধারণা, এই পৃথিবীতে যে অগণিত রকমের উদ্ভিদ ও প্রাণী রহিয়াছে, বর্তমানে তাহাদিগকে যেরূপ দেখা যায় তাহাদের আবির্ভাবের সময়ও ঠিক এই আকৃতিতেই, পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ভাবে তাহারা উদ্ভূত হইয়াছিল অর্থাৎ যে আকৃতিতে তাহারা সৃষ্ট হইয়াছিল চিরকাল ধরিয়া তাহারা সেইরূপই আছে, আর থাকিবেও। কিন্তু বর্তমানে কোন জীব-বিজ্ঞানীই একথা মানিতে রাজী নন। তাঁহাদের মতে বহু কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীর সৃষ্টির পর উহাতে জীবনের চিহ্নমাত্র ছিল না। তাহার পর পৃথিবীর উপরি ভাগে বহু স্থান জুড়িয়া বিস্তীর্ণ জলরাশি এবং আরও পরে স্থানে স্থানে নূতন মাটি দেখা দিল। আর ইহাকে একটা বায়ুমণ্ডল আবৃত করিল এবং তাহার উপর আসিয়া পড়িল সূর্যকিরণ। সেই পৃথিবীতে একদা কোনও অজ্ঞাত কারণে ও প্রণালীতে সলিলগর্ভে জন্ম নিল পৃথিবীর জীব-কুলের আদি পূর্বপুরুষ, না প্রাণী, না উদ্ভিদ, এক কণিকা প্রোটোপ্লাজমের থল্‌থলে দেহ লইয়া। এই আদি জীবপঙ্কের মধ্যে প্রাণের প্রথম বিকাশ হয়। জল, জলের লবণ ও বায়ুর উপর নির্ভর করিয়া সেই আদিম জীবেরা প্রাণধারণ করিতে লাগিল। আমরা যেমন রৌদ্রবৃষ্টি আটকাইতে ছাতা ব্যবহার করি, সূর্যের প্রখর আলো হইতে চোখ বাঁচাইতে রঙিন চশমা ব্যবহার করি, সেই রকম আদি জীবদের মধ্যে কতকগুলি জীব সবুজ বর্ণের এক প্রকার পদার্থ দেহে প্রস্তুত করিয়া আবরণ পরিল এবং তাহার সাহায্যে প্রায় একই স্থানে থাকিয়া সূর্যালোকে বায়ু ও জলের উপাদান হইতে নিজেদের খাদ্য তৈয়ারি করিতে লাগিল এবং খাবার সম্বন্ধে এক রকম নিশ্চিন্ত হইল। ইহাদের আর একদল, যাহারা খাবার তৈয়ারি করার কৌশল আয়ত্ত করিতে পারিল না, গতিশীল হইয়া স্বজাতির তৈয়ারি খাদ্য খাইয়া জীবনধারণ করিতে লাগিল।

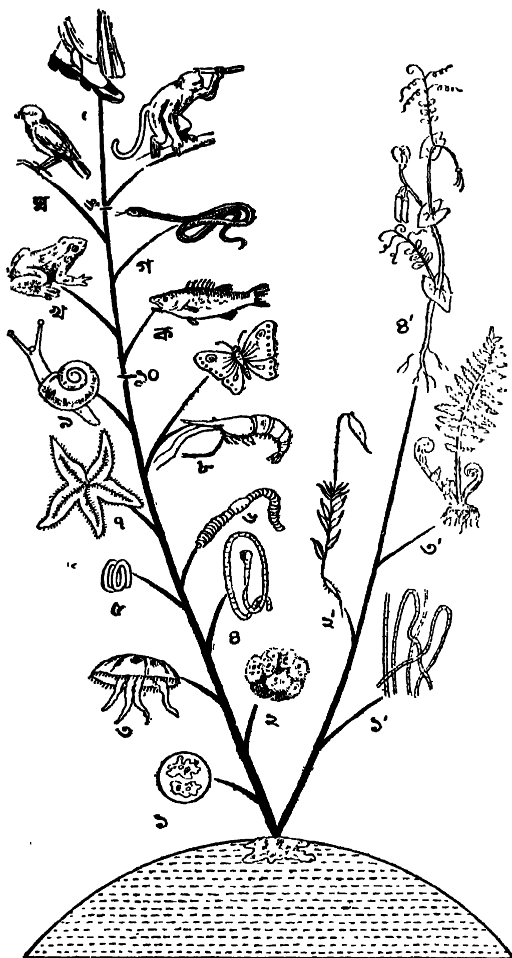
এইরূপে পৃথিবীর বক্ষে দুইটি স্বতন্ত্র জীবনধারার সূত্রপাত হইল। প্রথম প্রকার সবুজবর্ণধারী, খাদ্যে স্বাবলম্বী, স্থিতিশীল জীবশ্রেণী হইতে উদ্ভব হইল

উদ্ভিদের ; দ্বিতীয় প্রকার গতিচঞ্চল, পরজীবী জীবশ্রেণী হইতে উদ্ভব হইল প্রাণীর। তাহার পর উভয় প্রকারের জীবই নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিতে মনোনিবেশ করিল। যতই সময় যাইতে লাগিল ততই তাহারা ক্রমশ অধিকতর জটিল আকার ধারণ করিতে লাগিল। গাছপালা জল হইতে স্থলের দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাহাদের চলিবার শক্তি ধীরে ধীরে লোপ পাইল ; তাহারা অন্ধকারে মাটির ভিতর শিকড় চালাইল, আলোতে, ডাল-পালা ছড়াইয়া পাতা বাহির করিল, ফুল ফোটাইল, ফল ধরাইল, শেষে ফলের বীজের সাহায্যে এক গাছ হইতে অন্য গাছ জন্মাইতে লাগিল। তাহার পর কোটি কোটি বৎসরব্যাপী অবিরাম মন্থর ক্রমপরিবর্তনের ফলে অতি সরল ও নিম্ন স্তরের উদ্ভিদ হইতে অপেক্ষাকৃত জটিল ও উচ্চ স্তরের উদ্ভিদের উদ্ভব হইয়াছে।

অপর দিকে ইহাদের প্রাণিভাবাপন্ন জ্ঞাতি ভাইয়েরাও নির্দিষ্ট ধারায় উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল। এককোষ দেহ হইতে বহুকোষের সৃষ্টি হইল। তাহার পর প্রাণীর পরিপাক-প্রণালী জন্মাইল, সঙ্গে সঙ্গে হজমের ব্যবস্থা হইল। ক্রমে ক্রমে তাহার শরীর ও শরীরের কাজ জটিল হইতে লাগিল। ফলে সরল ও নিম্ন স্তরের জীব হইতে জটিল ও উচ্চ স্তরের জীবের উদ্ভব হইল। এইরূপে পূর্বতন জাতির ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে নব জাতির ক্রমবিকাশের নাম **অভিব্যক্তি**।

জীবন-বৃক্ষ—পৃথিবীপৃষ্ঠে এত বিভিন্ন জাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ ক্রম-পরিবর্তনের ভিতর দিয়াই সৃষ্ট হইয়াছে, কোন জীবই জড় পদার্থ হইতে নতুন করিয়া সৃষ্ট হয় নাই। এই অভিব্যক্তি একটা গাছের সঙ্গে তুলনা করিয়া বুঝানো যায়। বীজ হইতে গাছের কাণ্ড বাহির হয়। ইহাকে আমরা পৃথিবীপৃষ্ঠে আদি জীবের উৎপত্তির সহিত তুলনা করিতে পারি। কখনো কখনো কাণ্ডটি উপরে উঠিয়াই দুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই দিকে যায়। জীবের **জীবনবৃক্ষে**ও তাহাই হইল। জীবরাজ্যের এক ভাগ হইল উদ্ভিদ, আর এক ভাগ হইল প্রাণী। এইবার প্রত্যেক কাণ্ডে, একটির পর একটি শাখা বাহির হইতে লাগিল। প্রথমটিতে হইল ৪টি, দ্বিতীয়টিতে হইল ১০টি। প্রথমটির ৪টি শাখা হইল উদ্ভিদজগতের ৪টি পর্ব, দ্বিতীয় কাণ্ডের দশটি শাখা হইল প্রাণিজগতের ১০টি পর্ব। ২১৬ নং চিত্র হইতে বুঝা হইবে যে, শাখা (পর্ব) গুলি একই মূল কাণ্ড হইতে বাহির হইয়াছে এবং এই পর্বগুলিই উহাদের

সম্পর্ক। বাহির হইবার পর হইতে প্রত্যেকটির জীবনধারা অপরটি হইতে আদিম কালেই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। গাছের শাখা হইতে যেমন প্রশাখা বাহির হয় সেইরূপ পর্বগুলি হইতে আবার শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়াছে। যেমন, মেরুদণ্ডী পর্ব হইতে মাছ, উভচর, সরীসৃপ পাখী ও স্তন্যপায়ী, এই ৫টি শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। স্তন্যপায়ী শ্রেণী আবার ক্রম-বিবর্তনের ফলে কয়েকটি বর্গে বিভক্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে পরম প্রাণীরা, যেমন, বানর, বেবুন, গরিলা ও মানুষ অন্য-দের চেয়ে খুব বেশি উন্নত। আর ইহাদের মধ্যে মানুষই রহিয়াছে সর্বোচ্চ স্তরে। এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার আছে। জীবন-বৃক্ষের শাখা-প্রান্তে বর্তমানে যে সব প্রাণী রহিয়াছে তাহারই কয়েকটি ছবিতে দেখানো হইয়াছে; ইহাদের মধ্যবর্তী স্তরের অনেক



২১৬নং চিত্র—জীবন-বৃক্ষ

১। অ্যামিবা, ২। স্পঞ্জ, ৩। জেলিফিস, ৪। চ্যাপ্টা কৃমি, ৫। গোল কৃমি, ৬। কেঁচো, ৭। স্টার ফিস, ৮। চিংড়ি, প্রজাপতি, ৯। শামুক, ১০। মেরুদণ্ডী (ক) মাছ, (খ) ব্যাঙ, (গ) সাপ, (ঘ) পাখী, (ঙ) স্তন্যপায়ী—বানর, মানুষ
১´। শৈবাল, ২´। মস, ৩´। ফার্ন, ৪´। সপুষ্পক উদ্ভিদ

প্রাণী বহু পূর্বেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পাখী ও সাপ অতি প্রাচীন যুগে যে সরীসৃপ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা এখন লুপ্ত। বর্তমানে আমরা দেখিতে পাই, এমন কোনও বানর হইতে মানুষ উদ্ভূত হয় নাই; কিন্তু মানুষ, এপ ও বানরের পূর্বপুরুষ একই বানরাকৃতি জীব, যাহা বহু পূর্বেই পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

উৎপত্তির বয়স—বিজ্ঞানীদের দুঃসাহসের অন্ত নাই। নানা-রকমের জীব কে কবে পৃথিবীতে দেখা দিয়াছিল, তাহারও একটা হিসাব তাঁহারা করিয়া ফেলিয়াছেন। হিসাবটা মোটামুটি এই: পৃথিবীতে প্রথম জীব আসে প্রায় একশ কোটি বৎসর আগে। মাছ আসিয়াছে চল্লিশ কোটি বছর আগে, পাখী আসিয়াছে বার কোটি বছর আগে, আর মানুষ আসিয়াছে এই সেদিন, মাত্র আড়াই লক্ষ বছর আগে। সৃষ্টির প্রথম হইতে জীব-জগতের এই পরিবর্তন এত ধীরে ধীরে চলিয়া আসিয়াছে যে দুই-চারি হাজার বৎসরের ইতিহাসেও সে-পরিবর্তনের প্রায় কিছুই লক্ষ্য করা যায় না। তবে অভিব্যক্তিবাদ কি ভাবে সমর্থিত হইয়াছে?

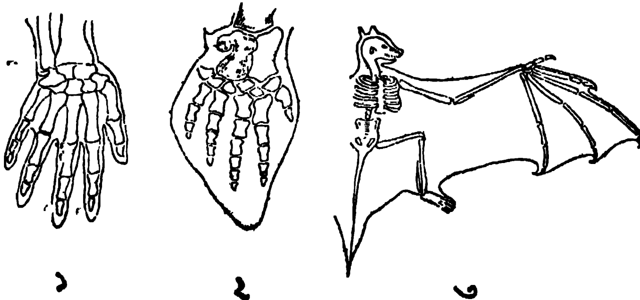
(১) ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ—যুগ যুগ ধরিয়া ভূপৃষ্ঠের শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া জলস্রোতের সহিত নিম্ন ভূমিতে গিয়া স্তরে স্তরে পালল শিলার (Sedimentary rocks) সৃষ্টি করিয়াছে। সেগুলি হইল অতীতের ইতিহাসের এক একটি পৃষ্ঠা। ঐ সকল স্তরে কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহ আটকাইয়া গেলে দেহের কঠিন অংশ তাহাতে ছাপ রাখিয়া যায় বা রূপান্তরিত অবস্থায় ঐ স্তরে থাকিয়া যায়। ঐরূপ দেহাংশ বা উহার ছাপকে জীবাশ্ম বা ফসিল (Fossil) বলে। শিলার স্তরগুলি মোটামুটি বয়স হিসাবে নীচ হইতে উপর দিকে পর পর সাজানো রহিয়াছে। ঐসব স্তরের বয়স নির্ণয়ের আরও উপায় বাহির করা হইয়াছে। বিভিন্ন স্তরে যে সব জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ঐ সব শিলাস্তরের বয়স অনুযায়ী প্রাচীন যুগের বিভিন্ন প্রাণী বা উদ্ভিদের বয়সও জানিতে পারা গিয়াছে। সবচেয়ে কম বয়সের শিলাস্তরে, যাহা সাধারণত উপরের দিকেই রহিয়াছে, স্তন্যপায়ী প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে। তাহার নীচের স্তরে স্তন্যপায়ীর চিহ্ন নাই; আছে পাখী ও সরীসৃপের জীবাশ্ম। তাহারও নীচে আরও পুরাতন স্তরে উপরিউক্ত প্রাণীর চিহ্ন নাই, রহিয়াছে মৎস্যের জীবাশ্ম। আরও পুরাতন শিলার মধ্যে খুব সরল গঠনের প্রাণীর চিহ্ন রহিয়াছে। আর সবচেয়ে পুরাতন

স্তরে কোনরূপ জীবের চিহ্নই নাই। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে সর্বপ্রথম অতি সরল গঠনের প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছিল এবং ক্রমে ক্রমে জটিলতর প্রাণীর উদ্ভব হয়। প্রত্যেকটি প্রাণীর পৃথক পৃথক সৃষ্টি হইয়াছে এমন কোন প্রমাণ যখন নাই তখন আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইব যে নিম্ন স্তরের সহজগঠন প্রাণী হইতেই উচ্চ স্তরের জটিলগঠন প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছে।

(২) ভৌগোলিক প্রমাণ—পৃথিবীপৃষ্ঠে কয়েকটি মহাদেশ সমুদ্র বা পর্বতশ্রেণী দ্বারা বিচ্ছিন্ন। অথচ কোন কোন মহাদেশের গাছপালা ও জীবজন্তুর সঙ্গে অপর একটি মহাদেশের গাছপালা ও জীবজন্তুর অদ্ভুত মিল দেখা যায়। ক্যাঙ্গারু ও ঐ জাতীয় স্তন্যপায়ী আর একটি প্রাণী অপোসম (Opossum) যথাক্রমে শুধু অস্ট্রেলিয়ায় ও দক্ষিণ আমেরিকায় দেখা যায়। ইহার একমাত্র ব্যাখ্যা এইরূপ: জীবাশ্ম হইতে দেখা গিয়াছে যে এক কালে পৃথিবীর সর্বত্র ইহাদের বাস ছিল; তখন অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে স্থলভাগের সংযোগ ছিল। তাহার পর পৃথিবীর কোন স্থানে আরও উন্নত ধরনের স্তন্যপায়ীর উদ্ভব হইল এবং তাহারা নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া ক্যাঙ্গারু ও অপোসম দিগকে নির্মূল করিয়াছিল। কেবল পারিল না, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকাতে, কারণ তাহার পূর্বেই এই দুইটি মহাদেশ পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশ হইতে সমুদ্র-সৃষ্টির ফলে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

(৩) দৈহিক গঠনগত প্রমাণ—বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর দৈহিক গঠন লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রাণী হইলেও, তাহাদের মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য আছে।

কোথাও কোথাও এই সাদৃশ্য বেশ প্রকট ভাবে বিদ্যমান, আবার কোথাও



২১৭নং চিত্র—(১) মানুষ (২) তিমি ও (৩) বাদুড়ের হাতের অস্থির গঠন

কোথাও প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে। মানুষ. কুকুর, মুরগি, টিকটিকি প্রভৃতি মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের কাঠামোর মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে; তাহা হইল একই রকমের অস্থিবিন্যাস। তাহাদের পূর্বপুরুষ যদি এক না হয় তবে তাহারা প্রায় একরূপ অস্থিবিন্যাস কোথায় পাইল? মানুষ, তিমি ও বাদুড় যথাক্রমে স্থলচর, জলচর ও খেচর। কিন্তু তাহাদের হাতের অস্থির গঠন-প্রণালী অনেকটা একই রকমের। পরিবেশ ও জীবনযাপন প্রণালীর জন্য কোন হাত লম্বা আবার কোনটা খাট হইয়াছে মাত্র। ইহাতে কোন নূতন গঠনপ্রণালী দেখা যায় না।

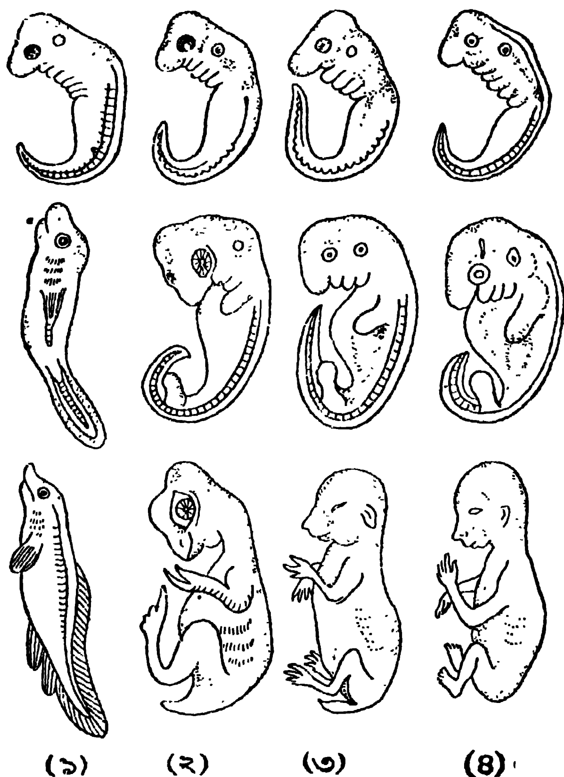
(৪) অব্যবহৃত ও অকেজো অঙ্গ (Vestigial Organ) হইতে প্রমাণ—ক্রমবিবর্তন মানিয়া নিলে প্রাণীর দেহে কোনও অঙ্গের দীর্ঘ কাল অব্যবহারের ফলে তাহা অকেজো হইয়া থাকিতে পারে। স্থলচর প্রাণী হইতে জলচর তিমির উদ্ভব হইয়াছে। স্থলচর স্তন্যপায়ীর পা রহিয়াছে। জলে বাস করিতে হইলে পায়ের প্রয়োজন হয় না। সেজন্য ব্যবহারের অভাবে তিমির পা অকেজো হইয়া রহিয়াছে।

মানুষের মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্তে অকেজো পুচ্ছাস্থি রহিয়াছে; ইহা লেজের গোড়ার মত। মানুষ যে বানরাকৃতি পূর্বপুরুষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ইহা সেদিকেই অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিতেছে। তিমি ও মানুষ যদি ক্রমবিবর্তনের ভিতর দিয়া না আসিয়া অন্য ভাবে অর্থাৎ সোজাসুজি বর্তমান যুগের তিমি ও মানুষের মতই সৃষ্ট হইত তবে তাহাদের দেহে অকেজো অঙ্গের অবস্থিতির কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না।

(৫) শ্রেণিবিভাগের অস্পষ্টতা হইতে প্রমাণ—প্লাটিপাস (Platypus) নামক অস্ট্রেলিয়ায় একটি প্রাণী আছে। ইহা সরীসৃপের মত ডিম পাড়ে, কিন্তু ইহার বাচ্চা মায়ের দুধ খায়। ইহার দেহে সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী-সুলভ ধর্মের অপূর্ব সংযোগ। ইহাকে সংযোগকারী প্রাণী বলা যায়। সরীসৃপেরা যে-অবস্থার ভিতর দিয়া স্তন্যপায়ী শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে এই প্রাণী তাহার চাক্ষুষ নিদর্শন। এইরূপ মধ্যবর্তী অবস্থার জীব পৃথিবীতে বিরল। মনে হয় অভিব্যক্তিবাদ প্রমাণ করিবার জন্যই যেন ইহারা বাঁচিয়া আছে।

(৬) ভ্রূণের সাদৃশ্য হইতে প্রমাণ—পূর্বোক্ত রকমের পুরাতন অঙ্গের চিহ্ন খুব শিশু অবস্থায় কোন কোন প্রাণীর দেহে দেখা যায়,

কিন্তু পরে তাহা আর থাকে না, যেমন, ব্যাঙের লেজ। কোন কোন মেরুদণ্ডী প্রাণী সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর হইলেও তাহাদের ভ্রূণের মাতৃগর্ভে ক্রম-বিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রথম অবস্থায় উহাদের মধ্যে যে সাদৃশ্য থাকে তাহা বিস্ময়কর। এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষণীয় মানুষের ভ্রূণের প্রথম অবস্থার লেজটি। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহাদের নিজ নিজ



২১৮নং চিত্র—ভ্রূণের ক্রমবিকাশের তিনটি অবস্থা
১। মাছ ২। মোরগ ৩। খরগোস ৪। মানুষ

বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট হইয়া পরিণামে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতির জীবসমূহের সৃষ্টি হয়। ইহা হইতে দেখা যায়, প্রত্যেক প্রাণী ভ্রূণ অবস্থায় তাহার ক্রমবিবর্তনের ধাপগুলি সংক্ষেপে একবার অতিক্রম করিয়া যায়।

অভিব্যক্তির কারণ—অভিব্যক্তি যে হইয়া আসিতেছে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল। তবে কি ভাবে অভিব্যক্তি ঘটে, ইহার

কারণ কি, এই সম্বন্ধে মতবাদ এখনও তত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয়। অভিব্যক্তি-বাদ অতি প্রাচীন। গ্রীক পণ্ডিতগণ প্রথম ইহার উল্লেখ করেন। তবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে ইহার সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক **ডারউইন** Origin of Species নামক তাহার যুগান্তকারী পুস্তকে প্রজাতির (Species) উদ্ভব সম্বন্ধে এক মতবাদ প্রচার করেন। তাঁহার মতে, জীব হইতে তাহার সন্তান সৃষ্টিকালে যদি কোথাও কোন সময়ে সামান্য পরিবর্তনের সূচনা হয় তবে উহারই সূত্র ধরিয়া পরিণামে ভিন্ন শ্রেণীর জীবের সৃষ্টি হইতে পারে, নতুবা হয়। এই পরিবর্তন বা পার্থক্যের ফলে কোন কোন জীব পরিবেশে বাঁচিয়া থাকিবার যোগ্যতা অর্জন করিবে, অন্যেরা নির্মূল হইয়া যাইবে। ইহাকে বলে **যোগ্যতমের উধ্বর্তন** (Survival of the Fittest)। যোগ্যতম বলিলে সব চেয়ে বলিষ্ঠকে বুঝায় না; যে প্রকৃতির সঙ্গে সবচেয়ে বেশি খাপ খাওয়াইয়া থাকিতে পারে তাহাকে বুঝায়। কোন জীবের পার্থক্যজনিত বৈশিষ্ট্য তাহার জীবনসংগ্রামে জয়ী হওয়ার সহায়ক হইলে তাহাই বংশানু-ক্রমে চলিয়া ঐ জীবের স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। ঐরূপ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব উপযুক্ত বলিয়া প্রকৃতি যেন তাহাকে বাছিয়া নেয়। ইহাকে বলে **প্রাকৃতিক নির্বাচন** (Natural Selection)।

অভিব্যক্তিবাদের মূল ভিত্তি হইল পরিবর্তন। এখন বিবেচ্য এই পরিবর্তনের কারণ কি, কোন্ সময়ে, কি অবস্থায় ইহার উদ্ভব হইতে পারে। প্রথমত, আবেষ্টনীর প্রভাব। মেরুমণ্ডলের প্রাণী দীর্ঘকাল গ্রীষ্মমণ্ডলে বাস করিলে তাপ, খাদ্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি তাহার দেহ ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। দ্বিতীয়ত, দৈহিক আকার ও গঠন কতক পরিমাণে আমাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষ ব্যবহারের উপরও নির্ভর করে। একজন কামারের হাতের পেশি আর একজন পালকি-বাহকের কাঁধের পেশি বিশেষ ভাবে বর্ধিত হইয়া থাকে। তৃতীয়ত, পরিবর্তন জনন-বীজের (Germ Cell) প্রোটোপ্লাসমে কোন নূতন বিশেষত্বের দরুনও উদ্ভূত হইতে পারে। পূর্বোক্ত প্রথম দুই রকমের পরিবর্তন অর্জিত (auquired), বাহির হইতে উদ্ভূত। ইহা সাধারণত বংশানুক্রমে বর্তায় না। বংশানুক্রমিক পরিবর্তন অন্তর্নিহিত এবং জীববিদ্যার দিক দিয়া ইহাই প্রকৃত পরিবর্তন। ইহার কারণ এখন দেওয়া হইবে।

বংশগতি—সন্তান পিতামাতার মত হইয়া থাকে ইহাই সাধারণের ধারণা। লোকে বলে, "কত বড় বাপের বেটা!" আবার এরূপও শোনা যায়, "কত বড় বাপ, আর ছেলেটা কি হোল!" পরের কথাটির উত্তর সহজেই মিলে। শিক্ষার অভাবে বা কুসঙ্গের ফলে উচ্চশিক্ষিত, পদস্থ লোকের ছেলেও অধঃপাতে যায়। আর এই যে পিতার গুণের সঙ্গে তুলনা করিয়া ছেলের কথা বলা হয়, ইহা হইতে বুঝা যায় লোকের বিশ্বাস যে সন্তান শুধু পিতার দোষগুণই পাইয়া থাকে; মাতার দোষগুণের সঙ্গে যেন তাহার কোন সম্বন্ধই নাই, মাতা তাহাকে গর্ভে ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আবির্ভাবের উপযুক্ত করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু এই ধারণা ভুল। সন্তান সাধারণত পিতা ও মাতা উভয়ের দোষগুণই পাইয়া থাকে। পিতামাতার দেহের গঠন, গায়ের রঙ যে ছেলেমেয়ের মধ্যে দেখা যায়, ইহা অতি সাধারণ ব্যাপার। তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও অন্যান্য দোষগুণ যে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বর্তিয়া থাকে তাহাও লক্ষণীয় বিষয়। জীবের জন্মগত বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি তাহার বংশধরদিগের মধ্যে পুরুষানুক্রমে সংক্রমিত হইয়া থাকে। ইহাকে **বংশগতি** বলে।

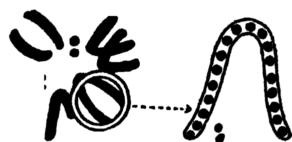
এবিষয়ে ডারউইনের ধারণা ছিল যে সন্তানের মধ্যে পিতামাতার বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ সঞ্চারিত হয়। এজন্যই সন্তানের মধ্যে পিতামাতার চেহারা ও গুণাবলীর লক্ষণ অনেক সময় দেখা যায়। মোটামুটি সন্তানের গুণাবলী পিতা ও মাতার গুণাবলীর মাঝামাঝি হইয়া থাকে। এই মতবাদ বহুপূর্বেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। কারণ খুব লম্বা পুরুষ ও বেঁটে স্ত্রীলোকের সংমিশ্রণে যদি মাঝামাঝি উচ্চতার সন্তানের উদ্ভব হইত, তবে বহু পূর্বেই পৃথিবী হইতে লম্বা লোকের চিহ্ন মুছিয়া যাইত, বংশানুক্রমে প্রতিভারও অবলুপ্তি ঘটিত। আর মিশ্রণের ফলে পৃথিবীতে পার্থক্য ও বৈচিত্র্যের অবনতি ঘটিত। ফলে অভিব্যক্তির হইত অবসান।

তাহার পর ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে **গ্রেগর মেণ্ডেল** নামক একজন অস্ট্রিয়ান ধর্মযাজক লম্বা ও বেঁটে এই দুই জাতের মটর গাছের মধ্যে সংমিশ্রণের ফলে কি হয় দেখিবার জন্য পরীক্ষা করেন। তিনি লম্বা গাছের পরাগ বেঁটে গাছের গর্ভমুণ্ডে এবং বেঁটে গাছের পরাগ লম্বা গাছের গর্ভমুণ্ডে লাগাইয়া পরাগ-সংযোগ ঘটাইলেন। ফলে দুই রকম গাছেই যে মটরশুঁটি হইল তাহা হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া গাছ জন্মাইলেন। সব গাছই লম্বা হইল। মেণ্ডেল এই লম্বা গাছগুলিকে প্রথম পুরুষের গাছ নাম দিলেন।

ইহা হইতে তিনি বংশগতির এই নিয়ম বাহির করেন: পিতামাতার মধ্যে বিপরীত গুণ থাকিলে সন্তানের মধ্যে দৃশ্যত একটা গুণ প্রকট (dominant) হইবে এবং অন্য গুণটি অপসৃত (recessive) হইয়া থাকিবে।

এবার প্রথম পুরুষের দুইটি গাছের মধ্যে পরাগ-সংযোগ করিয়া বা গাছ-গুলিতে স্বকীয় পরাগ-সংযোগ করিয়া (মটরের ফুলে পরাগ ও গর্ভকোষ দুইই আছে) আরও আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া গেল। এবারের গাছগুলিকে বলা হইল দ্বিতীয় পুরুষের গাছ। ইহাদের প্রতি চারটি গাছের মধ্যে তিনটি হইল লম্বা, আর একটি বেঁটে, অর্থাৎ লম্বা আর বেঁটে গাছের অনুপাত হইল ৩:১। এই ফল পাইয়া তিনি প্রথম পুরুষের লম্বা গাছগুলিকে মিশ্র গাছ বা বর্ণসংকর নাম দিলেন। তাঁহার মতে এদের মধ্যে লম্বা ও বেঁটে উভয়েরই গুণ ছিল। কিন্তু বেঁটে হওয়ার গুণটা লুক্কায়িত অর্থাৎ চাপা পড়িয়াছিল। দ্বিতীয় পুরুষে কোন কোন গাছের বেলায় অপসৃত অবস্থা কাটিয়া যাওয়ার ফলে আবার খাটো গাছের উদ্ভব হইল।

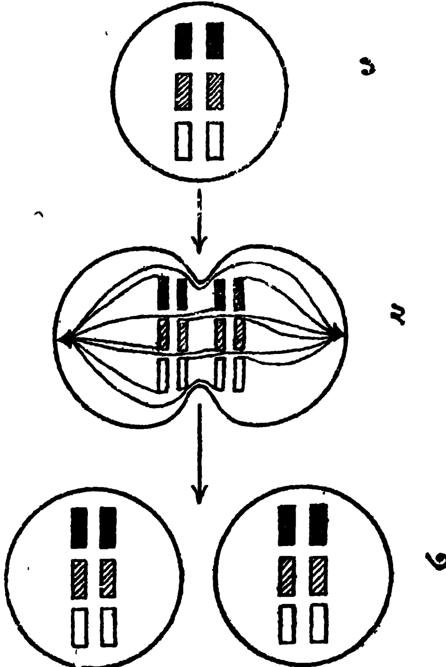
বংশগতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি—মেণ্ডেল বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে প্রত্যেক জীবের মধ্যে এমন সব পদার্থ রহিয়াছে যাহা প্রায় অপরিবর্তনীয় অবস্থায় এক পুরুষ হইতে অন্য পুরুষে চলিয়া যায়। বংশগতির এই উপাদান গুলিকে **ক্রোমোজোম** (Chromosome) নাম দেওয়া হয়। জীবকোষের মধ্যে নিউক্লিয়াস (Nucleus) হইল প্রধান অংশ। জীবের নিউক্লিয়াসে যে ক্রোম্যাটিন থাকে তাহা জীবকোষ-বিভাগের সময় জোড়ায় জোড়ায় সূতার মত দেখায়। তাহাকে ক্রোমোজোম বলে। মানুষের তুলনায় উদ্ভিদ ও অন্যান্য জীবের বেলায় ক্রোমোজোমের সংখ্যা সাধারণত কম। পরবর্তী কালে দেখা গেল ক্রোমোজোম-গুলি বংশগতির মূল উপাদান নহে। তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে বহু **জীন** (Gene)। জীনগুলিই জীবদেহের বৈশিষ্ট্যের বাহক ও ধারক। কোন জীবের বংশগত যাবতীয় ধর্ম ক্রোমোজোমের জীন কর্তৃক পিতৃমাতৃদেহ হইতে সন্তানের দেহে নীত হয়।


২১৯নং চিত্র—নিউক্লিয়াসে ৪ জোড়া ক্রোমোজোম ও ক্রোমোজোমে জীন

ক্রোমোজোম মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখা যায়; কিন্তু জীন বলিয়া

কোন পদার্থ মাইক্রোস্কোপে আজ পর্যন্তও ধরা পড়ে নাই। তবে ইহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করার ফলেই বংশগতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভবপর হইয়াছে। অদৃশ্য জীনগুলিকে ক্রোমোজোমের গায়ে অতি ক্ষুদ্র হাজার হাজার পুঁতির দানার মত বিশেষ ক্রমে সাজানো ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে। আসলে জীনগুলি ক্রোমোজোমের ক্ষুদ্রতম একক (unit), যাহাদের পরিবর্তনের ফলে জীবদেহের এক একটি বৈশিষ্ট্যের পবিবর্তন হয়।

ক্রোমোজোম সহ জীব কোষের বিভাগ—ছবিতে একটি নিম্নস্তরের জীবের কোষ বিভাগ দেখানো হইয়াছে। ফলে সমআকৃতি ও ধর্মের নূতন নূতন জীবকোষের সৃষ্টি হইতেছে। এভাবেই জীবের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই কোষবিভাগের সময় নিউক্লিয়াসটি যখন দুই ভাগে বিভক্ত হয় ক্রোমোজোমগুলিও তখন লম্বায় দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি কোষের নিউক্লিয়াসের উপাদানে পরিণত হয়।



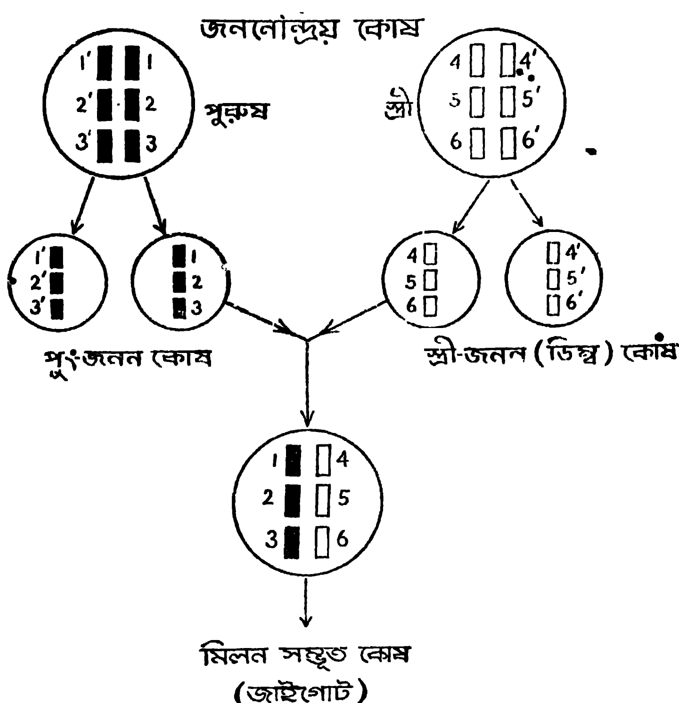
২২০নং চিত্র—ক্রোমোজোমসহ জীবকোষের বিভাগ

প্রথম ছবিতে নিউক্লিয়াসে তিন জোড়া ক্রোমোজোম রহিয়াছে। দ্বিতীয় ছবিতে যেমন নিউক্লিয়াস ভাগ হইতেছে এক একটি ক্রোমোজোমও লম্বালম্বি ভাবে বিভক্ত হইতেছে। তৃতীয় ছবিতে নিউক্লিয়াস ভাগ সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রতি নিউক্লিয়াসে মূল নিউক্লিয়াসের মত ছয়টি পূর্ণ আকারের ক্রোমোজোম তিন জোড়ায় রহিয়াছে।

নূতন জীবকোষের সৃষ্টি—সপুষ্পক উদ্ভিদের বেলায় ফুলের পরাগ কোষের (পুংজনন কোষের) সহিত ডিম্বকোষের (স্ত্রীজনন কোষের) মিলন ঘটিলে ফল উৎপন্ন হয়। একটি নিম্নস্তরের জীবের ছয়টি ক্রোমোজোম-

বিশিষ্ট পুং ও স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় কোষ হইতে কি ভাবে ক্রোমোজোম সন্তানে পরিচালিত হয় তাহাই এখন দেখা যাইবে। পুরুষ ও স্ত্রী প্রাণীর জননেন্দ্রিয়ে বিশেষ রকমের কোষ রহিয়াছে; তাহা হইতে পুং ও স্ত্রী-জননকোষের সৃষ্টি হয়। পুং ও স্ত্রী-জননকোষের মিলনে সন্তান উৎপাদিত হয়।

পুরুষ ও স্ত্রীর প্রতিটি জননেন্দ্রিয় কোষ হইতে দুইটি করিয়া জননকোষের সৃষ্টি হয়। জননেন্দ্রিয় কোষে ৬টি করিয়া ক্রোমোজোম রহিয়াছে। সাধারণ



২২১নং চিত্র—জীবকোষের সৃষ্টি

জীবকোষের বিভাগের ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমগুলি লম্বালম্বি বিভক্ত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনটি করিয়া অবিভক্ত ক্রোমোজোম প্রতি জননকোষে যায়। তাহার পর একটি একটি করিয়া পুং ও স্ত্রী জননকোষ মিলিত হয়। ইহাকে গর্ভাধান (Fertilisation) বলে। ঐ মিলনসম্ভূত কোষে (Fertilised egg cell), যাহাকে জাইগোট (Zygote) বলে, সাধারণ জীবকোষের মত ছয়টি ক্রোমোজোমই থাকে।

অতঃপর মিলনসম্ভূত কোষ সাধারণ কোষের ন্যায় সমসংখ্যক ক্রোমোজোম নিয়া বিভক্ত হইয়া ভ্রূণরূপে বড় হইতে থাকে। এভাবে সন্তান পিতা ও মাতা হইতে সমসংখ্যক ক্রোমোজোম ও তৎসঙ্গে জীন পাইয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায় তাহার মধ্যে পিতা ও মাতার কতকগুলি গুণ থাকিবে। একটি জননেন্দ্রিয় কোষ বিভক্ত হওয়ার ফলে দুইটি জনন কোষে যে ৩টি-৩টি করিয়া ক্রোমোজোম আসিয়াছে তাহাদের জোট (Combination) বিভিন্ন রকমের হইতে পারে। ছবিতে দুইটি পুংজনন কোষে ১—২—৩ ও ১′—২′—৩′ সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট ক্রোমোজোম রহিয়াছে; কিন্তু তাহারা ১—২′—৩ ও ১′—২—৩′, ১—২—৩′ ও ১′—২′—৩ এইরূপ নানা প্রকারের জোটেও থাকিতে পারে। তিনটি করিয়া একত্রে থাকিয়া ২টি দল মোট $২^{৩}$ বা ৮ প্রকারে থাকিতে পারে। মানুষের পুংজননকোষে থাকে ২৪টি ক্রোমোজোম। শুধু ক্রোমোজোমের জোটের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে $২^{২৪}$ বা প্রায় ১৭,০০০,০০০ ভাবে দুইটি কোষের মধ্যে জোট বাঁধিয়া ইহাদের থাকার ফলে তত রকমের পুংজননকোষের সৃষ্টি হইতে পারে। এইরূপ বিভিন্ন রকমের স্ত্রীজননকোষের সৃষ্টিরও সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই দুই রকমের জননকোষ মিলিত হইয়া আরও অনেক বেশি রকমের জাইগোট সৃষ্টি করিতে পারে। তাহার পর যখন ভাবা যায় যে প্রত্যেক ক্রোমোজোমে অনেক অজানা সংখ্যক জীন রহিয়াছে, তখনই বুঝা যায় কেন অবিকল একরূপ দুইটি মনুষ্য-সৃষ্টি সম্ভাবনার প্রায় বাহিরে।

সন্তানের দেহের সমস্ত জীনই পিতামাতা হইতে আসে। সেইজন্য পিতামাতা এবং সন্তানের মধ্যে কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু তাহার জীনগুলির মিশ্রণ পিতামাতার জীনগুলির চেয়ে ভিন্ন। প্রত্যেক ব্যক্তির দেহে জীনের মিশ্রণ একান্ত ভাবে তাহারই। কাজেই তাহার বংশগতিও একান্ত ভাবে তাহারই নিজস্ব ধর্ম।

জীন ও অভিব্যক্তি—বৈজ্ঞানিকেরা পূর্বে মনে করিতেন যে জীনগুলির সম্পূর্ণ রূপ অপরিবর্তনীয়। কিন্তু বর্তমানে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে জীনগুলির স্বাভাবিক ভাবেই পরিবর্তন হইতে পারে, যাহাকে বলা যায় **বিপরিণতি (Mutation)**। এই বিপরিণতি প্রায় দশ লক্ষ কোষের মধ্যে মাত্র এক বার ঘটিয়া থাকে। ইহার অর্থ এই, একটি জীবের জীবনে বিপরিণতি খুবই বিরল। তবে একটি প্রজাপতির (Species) জীবনকাল পাঁচ লক্ষ বৎসর

পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে এবং এই সময়ের মধ্যে শত শত কোটি জীব জন্ম লাভ করিয়া সন্তান উৎপাদন করিয়া থাকে। একটি জীবের দেহে হাজার হাজার জীন রহিয়াছে। কাজেই একটি প্রজাতির জীবনে কোটি কোটি বার বিপরিণতি ঘটিবে। কয়েক বার বিপরিণতি ঘটিলেই এক প্রজাতি হইতে অন্য প্রজাতির উদ্ভব সম্ভবপর। বিপরিণতি বংশানুক্রমে পরিচালিত হয়। অভিব্যক্তির কারণ এখানে পাওয়া গেল।

অভিযোজন (Adaptation)—তোমরা পূর্বে জানিয়াছ পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে জীবদেহে কতকগুলি পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে খাদ্যসংগ্রহ করিতে হয় এবং শত্রুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে হয়। এজন্য প্রত্যেক জীবের দেহেই খাদ্যসংগ্রহ করিবার ও আত্মরক্ষা করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রাকৃতিক নিয়মে আপনা হইতে গড়িয়া উঠে। জীবনরক্ষার্থে জীব যে সকল উপায় অবলম্বন করে বা সামঞ্জস্য বিধান করে, তাহাকে **অভিযোজন** বলে।

উদ্ভিদের অভিযোজন—পর্বতের উপর অথবা মরুভূমিতে যে সকল গাছ জন্মে, তাহাদের অতি সামান্য জল পাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়। বৃষ্টির জলই ইহাদের একমাত্র সম্বল। এজন্য ইহাদের শাখামূলগুলি অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া যথাসাধ্য জল সংগ্রহ করে।

মরুভূমির উদ্ভিদগণ মূল অনেক নীচে পর্যন্ত চালাইয়া জল সংগ্রহের চেষ্টা করে। যে সামান্য জল ইহারা সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা দেহের বিভিন্ন অংশে কাণ্ডের মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। সেজন্য ইহাদের পাতা ও কাণ্ড প্রায়ই স্থূল হয়।

জলজ উদ্ভিদের মধ্যে যে সকল পাতা জলের মধ্যে থাকে তাহাদের মধ্যে রন্ধ্র (Stoma) থাকে না, কারণ বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকিলে ঐ রন্ধ্রপথ দিয়া কোন কাজ হইতে পারে না। পদ্ম, শালুক প্রভৃতি যে সব উদ্ভিদের পাতা জলের উপর ভাসে সেই সকল পাতা আয়তনে বেশ বড় হয় এবং স্টোমা পাতার উপর পিঠে থাকে।

সুন্দর বনের যে সব অঞ্চলে গাছের নীচে লোনা জল থাকে সে সব স্থানে ফল গাছ হইতে মাটিতে পড়িলে লোনা জলে নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য ম্যানগ্রোভ নামক এক প্রকার গাছে ফল থাকিতে থাকিতে ইহার অভ্যন্তরস্থ বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়া ছোট উদ্ভিদে পরিণত হয়। এই ছোট উদ্ভিদের

মূল লম্বা ও সূচল। যথা সময়ে এই ছোট উদ্ভিদ গাছ হইতে নীচে পড়িয়া কাঁদায় পুঁতিয়া যায় এবং বড় হইতে থাকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় কিরূপে উদ্ভিদের অঙ্গের পরিবর্তন হয়, এই গাছ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রাণীর অভিযোজন—যে সব প্রাণী শীতপ্রধান দেশে বাস করে, তাহাদের দেহ ঘন লোমে ঢাকা থাকে। সাধারণ ভল্লুকের গায়ের লোম কালো। মেরুপ্রদেশের ভল্লুকের গায়ের লোম সাদা। ইহার ফলে বরফের সঙ্গে ইহার গায়ের রঙ প্রায় মিলিয়া যায় বলিয়া শিকারীরা সহজে উহাকে দেখিতে পারে না, আর এ অবস্থায় ভল্লুকেরও শিকার ধরিবার সুবিধা হয়।

জিরাফ প্রধানত গাছের পাতা খাইয়া জীবনধারণ করে; তাই তাহার গলাটা খুব লম্বা। উট মরুভূমিতে চলার জন্য বিশেষ উপযোগী। জল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য তাহার দেহের ভিতর বিশেষ ব্যবস্থা আছে। মরুভূমির বালির উপর দিয়া চলার জন্য তাহার পা চেপ্টা। বালুকা-ঝড়ের হাত হইতে রক্ষার জন্য ইহার নাসারন্ধ্র মাথার উপরের দিকে, আর তাহার বিশেষ ঢাকনা রহিয়াছে।

স্তন্যপায়ীদের মধ্যে বাদুড়ের অভিযোজন খুবই অদ্ভুত। এদের হাত ডানায় রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহারা পা দিয়া গাছের ডালে ঝুলে বলিয়া ইহাদের পায়ে নখ আছে।

প্রাণীদের অভিযোজনের আর এক দিক হইল পরিবেশের রঙের আশ্রয় নেওয়া। সবুজ রঙের এক প্রকার ছোট সাপ ও টিয়াপাখীকে গাছের সবুজ-পাতার মধ্যে সহজে দেখা যায় না। ধানের ক্ষেতে সবুজ গঙ্গাফড়িংকেও দেখিতে পাওয়া কঠিন।

কীট পতঙ্গের মধ্যে অভিযোজনের বহু উদাহরণ রহিয়াছে। কোন পতঙ্গ পাতার আকার, কেহ বা ডালের আকার ধারণ করিয়া নিজেকে বাঁচায়।

প্রশ্ন

১। অভিব্যক্তি কাহাকে বলে? উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতে অভিব্যক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। অভিব্যক্তিবাদের সমর্থনে যে সব প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে সংক্ষেপে তাহাদের আলোচনা কর।

৩। ক্রোমোজোম ও জীন কাহাকে বলে। ইহাদের কাজ কি?

৪। বংশগতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্বন্ধে যাহা জান বল।

৫। অভিব্যক্তি কেন, কি ভাবে হয় আলোচনা কর।

৬। অভিযোজন কাহাকে বলে? উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতে অভিযোজনের দৃষ্টান্ত দাও।

কয়েকটি সাধারণ রোগ

১

রোগ-প্রতিরোধের সাধারণ উপায়

রোগের জীবাণু—জীবের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধিবলেই সে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। কিন্তু এক শ্রেণীর জীবের সঙ্গে এখনও মানুষের যুদ্ধ চলিয়াছে। এই যুদ্ধে মানুষ জয়ের পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইতে পারে নাই। এই সব শত্রুরা হইল জীবাণু। মাইক্রোস্কোপে ইহাদের অনেকে ধরা পড়ে, সকলে পড়ে না। ইহাদের শক্তি হইল ইহাদের অগণিত সংখ্যায়। অ্যামিবা, ইস্ট প্রভৃতি এক এক শ্রেণীর জীবাণু। আরও বহুশ্রেণীর জীবাণু রহিয়াছে। অনুকূল অবস্থায় একটা জীবাণু ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে চব্বিশ ঘণ্টায় প্রায় দেড় কোটি জীবাণুতে গিয়া দাঁড়ায়। সব জীবাণুই যে মানুষের অনিষ্টকারী তাহা নয়। তোমরা জানিয়াছ নানা প্রকারের জীবাণু বায়ু হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। ইস্ট মানুষের নানা কাজে লাগে। তবে অনেক রকমের দুষ্ট জীবাণুও আছে। ইহারা মানুষের অদৃশ্য শত্রু। আমরা যে-সব রোগে ভুগি অনেক ক্ষেত্রে তাহা জীবাণুরা আমাদের দেহে প্রবেশ করিয়া ঘটাইয়া থাকে। ইহাদের প্রবেশ পথ বিভিন্ন। যক্ষ্মা ও ইনফ্লুয়েঞ্জার জীবাণু বায়ুর সঙ্গে শ্বাসপথ দিয়া দেহের ভিতরে প্রবেশ করে। কলেরা, টাইফয়েড ও আমাশয়ের জীবাণু খাবারের মধ্য দিয়া ঢোকে, আর ম্যালেরিয়া ও প্লেগের জীবাণু কীটের দংশনের ফলে চর্মের ভিতর দিয়া আসিয়া রক্তে মিশে। যে সব জীবাণু মানবদেহে আসিয়া জাঁকিয়া বসিল, তাহারা দেহকে নানা রকমে আক্রমণ করিয়া দেহতন্তু ধ্বংস করে। ইহারা আবার এমন সব বিষ প্রস্তুত করে যাহা দেহতন্তুর পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। রোগ-জীবাণুদের মধ্যে এই তিন শ্রেণী আমাদের আলোচনার মধ্যে আসিবে।

(১) **ব্যাকটিরিয়া** (Bacteria)—ইহারা আদি পর্বের ছত্রক জাতীয় উদ্ভিদ। সূক্ষ্ম শরীর নিয়া ইহারা জল, স্থল ও বায়ুতে সর্বত্র রহিয়াছে। উদ্ভিদশ্রেণিভুক্ত হইলেও ইহাদের দেহে ক্লোরোফিল বা সবুজ

কণা নাই। তাই তাহারা সূর্যকিরণে নিজ খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদিগকে প্রাণীর ন্যায় অন্যের তৈয়ারি খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়। মানুষের দেহের ভিতরে রহিয়াছে তাহাদের অফুরন্ত খাদ্যভাণ্ডার। সেজন্যই সেখানে ইহারা অ্যামিবার ন্যায় দেহ বিভক্ত করিয়া অতি দ্রুত বংশবিস্তার করিতে পারে। সরু কাঠির আকৃতির ব্যাকটিরিয়াকে **ব্যাসিলস** (Bacillus) বলে। বিভিন্ন জাতির ব্যাসিলস হইতে **টাইফয়েড, আমাশয়, যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া ও হুপিং কাশ** রোগ জন্মে। ব্যাকটিরিয়া স্টীমের উষ্ণতায় বাঁচে না। সেজন্য কোন জিনিস স্টীমে আধ ঘণ্টা রাখিলে জিনিসটি জীবাণুশূন্য হয়।

(২) **প্রোটোজোয়া (পরজীবী)** (Parasitic Protozoa) —ইহারা আদি পর্বের প্রাণী। ইহারা মানুষের বা অন্যান্য জীবের শরীরে আশ্রয় নিয়া তাহাদের মহা অনিষ্ট সাধন করে। কয়েক জাতির অ্যামিবা ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে। পরজীবী প্রোটোজোয়া হইতে **আমাশয়, ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের** সৃষ্টি হয়।

(৩) **ভাইরাস** (Virus)—ইহারা আকারে ব্যাকটিরিয়া ও প্রটোজোয়া অপেক্ষা অনেক ছোট। ইহাদের প্রায় অধিকাংশই সাধারণ মাইক্রোস্কোপ দিয়া দেখা যায় না। ইলেকট্রন-মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের পর নানা শ্রেণীর ভাইরাসের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। অন্য জীবের কোষের ভিতরে ইহাদের দ্রুত বংশবৃদ্ধি হয়। এই হিসাবে ইহারা পরজীবী। ভাইরাস হইতে **সাধারণ সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম ও বসন্ত** রোগের সৃষ্টি হয়।

জীবাণুগুলি এত ক্ষুদ্র যে ইহাদের আকার মিলিমিটারেও প্রকাশ করা যায় না। এক মিলিমিটারের এক হাজার ভাগকে **মাইক্রোন** (Micron) বলে অর্থাৎ এক মাইক্রোন $\frac{১}{১০০০}$ মিলিমিটার। মাইক্রোন হইল জীবাণু মাপার একক। ব্যাকটিরিয়া গুলি ১'৫ হইতে ৩ মাইক্রোন পর্যন্ত হইয়া থাকে। প্রটোজোয়া আকারে বড়, ৩ হইতে ৩০ মাইক্রোন পর্যন্ত হয়। মাইক্রোস্কোপের বিবর্ধন-ক্ষমতা যদি ৫০০ হয় তবে একটি জীবাণু কত বড় দেখা যাইতে পারে এখন সহজেই বলিতে পার। একটি ভাইরাস আকারে এক মাইক্রোনের প্রায় একশ ভাগ। কাজেই সাধারণ মাইক্রোস্কোপে ইহা দেখা যায় না

রোগ-প্রতিরোধের সাধারণ উপায়—বিভিন্ন রকমের জীবাণু রোগের কারণ ইহা তোমরা জানিলে। তবে মানুষ এই জীবাণুর রাজ্যে কি করিয়া বাঁচিয়া আছে? তোমরা পূর্বেই জানিয়াছ, আমাদের রক্তের একটা স্বাভাবিক প্রতিরোধ-ক্ষমতা আছে। তাহা আসে শ্বেতকণিকা ও রক্তরসের উপাদান হইতে। দেহের এই প্রতিরোধ-শক্তির বলেই মানুষ জীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত করিতেছে। দুর্বল দেহে প্রতিরোধ-শক্তি কমিয়া যায়, আর পরিবেশে রোগের প্রাবল্য ঘটিলে আক্রমণকারী রোগ-জীবাণুরা দলে ভারী হইয়া উঠে। এসব ক্ষেত্রে দেহের প্রতিরোধ-শক্তি বৃদ্ধি করিয়া রোগ-প্রতিরোধ করিতে হয়। কিন্তু কোন কোন রোগের বেলায় অন্য উপায়ও অবলম্বন করিতে হয়। রোগ-প্রতিরোধের সাধারণ উপায় গুলি এখন বলা হইবে।

(১) **টিকা** (Vaccine)—১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জেনেভার অধিবাসী **এডওয়ার্ড জেনার** লক্ষ্য করিলেন যে গোয়ালিনীদের হাতে বসন্তের দুই একটি গুটি হয়, যাহাকে তাহারা গো-বসন্ত বলে। এই গো-বসন্তের আক্রমণ মানুষের পক্ষে খুব মৃদু বলিয়া ঐ গুটি আর তাহাদের দেহে ছড়াইয়া পড়ে না। জেনার ইহাও লক্ষ্য করিলেন যে যাহাদের একবার গো-বসন্ত হইয়াছে তাহাদের আর বসন্ত হয় না। শেষে তিনি দেখাইলেন গো-বসন্তের **টিকা** নিলেও বসন্ত হয় না। পরবর্তী কালে এই টিকা নেওয়ার প্রথা নানা দেশে প্রচলিত হইল। ফলে বসন্ত রোগে মৃত্যু পৃথিবীতে খুবই কমিয়া গেল। এই ব্যাপারের মধ্যে বিজ্ঞানের যে মূল কথাটি ছিল তখনও তাহা জানা যায় নাই। সে কথাটা প্রথম জানাইলেন ফরাসী বিজ্ঞানী **লুই পাস্তুর**।

লুই পাস্তুর মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে বিশ বৎসর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে অদৃশ্য জীবাণু-রাজ্যের সন্ধান পাইলেন। তখন হাজার হাজার ভেড়া অ্যানথ্রাক্স রোগে মারা যাইত। মাইক্রোস্কোপে ঐ রোগগ্রস্ত জন্তুর রক্তে এক রকমের জীবাণু দেখা গেল। পাস্তুর বলিলেন ঐ জীবাণু হইতেই অ্যানথ্রাক্স রোগ হয়। পরে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইহাও দেখাইলেন যে ঐ রোগের জীবাণু হইতে টিকা তৈয়ারি করিয়া ভেড়ার গায়ে দিলে ঐ ভেড়ার আর অ্যানথ্রাক্স রোগ হয় না। পরবর্তী কালে অন্যান্য বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন এবং টিকা প্রস্তুত করিয়া ঐ সকল রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেন।

কোন রোগের টিকা হইল সেই রোগের মৃত বা ক্ষীণশক্তিসম্পন্ন জীবাণু দেহের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া। এই টিকা আমাদের রক্তের রোগ-প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধির ব্যাপারে সাহায্য করে। মৃত অথবা ক্ষীণশক্তি-সম্পন্ন জীবাণু দেহের ভিতরে প্রবেশ করিলে তাহাদিগকে বাধা দেওয়ার জন্য দেহের ভিতর জীবাণু-প্রতিরোধক পদার্থ উৎপন্ন হয়। ইহাকে বলা হয় **প্রতিবিষ** (Antitoxin)। পরে ঐ রোগের তীব্র জীবাণু দেহে প্রবেশ করিলে রক্তের স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তি এবং কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন প্রতিবিষের প্রতিরোধ-শক্তি, উভয়ে মিলিয়া আক্রমণকারী জীবাণুদের পরাস্ত করিয়া ফেলিতে পারে। বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড ও যক্ষ্মা রোগের টিকা বাহির হইয়াছে।

(২) **সিরাম** (Serum)—কোন জন্তুর, যেমন ঘোড়ার দেহে রোগ জীবাণু প্রবেশ করাইয়া দিলে তাহার রক্তে ঐ রোগ প্রতিরোধ করিবার প্রতিবিষ উৎপন্ন হয়। তাহার পর রক্তের তরল অংশ বা সিরাম প্রতিবিষসহ পৃথক করিয়া লওয়া হয়। ইহাকে রোগ-প্রতিরোধক **সিরাম** বলে। ব্যাসিলারি আমাশয়, ডিপথেরিয়া, ধনুষ্টঙ্কার রোগের এবং সাপের বিষের প্রতিরোধক সিরাম প্রস্তুত করা হয়।

(৩) **রাসায়নিক দ্রব্য**—টিকা ও সিরাম দিয়া অনেক ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাস-জাতীয় জীবাণু দমন করা যায়। কিন্তু প্রোটোজোয়ার বেলায় ইহারা কাজ করে না। ইহাদের জন্য রোগ হইলে ঔষধ হিসাবে এমন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করিতে হয় যাহা প্রোটোজোয়া ধ্বংস করিতে পারে, অথচ দেহতন্তুর কোন ক্ষতি করে না। কুইনিন, মেপাক্রিন, প্যালুড্রিন প্রভৃতি রাসায়নিক ম্যালেরিয়ার প্রোটোজোয়া নষ্ট করে। এমেটিন নামক ঔষধ আমাশয় রোগের প্রোটোজোয়া নষ্ট করিতে পারে।

রাসায়নিক ঔষধের মধ্যে বর্তমান কালে **সালফার-ঘটিত ঔষধ** (যাহাকে সালফোনমাইড, সংক্ষেপে সালফা-ড্রাগ বলে) বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। সালফা-গুয়ানিডিন আমাশয় রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

আজকাল **জীবাণু-বিরোধক** (Antibiotics) ঔষধের খুব বেশি প্রচলন হইয়াছে। ইহার আবিষ্কার এক স্মরণীয় ঘটনা। ১৯২৮ সালে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক **আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং** ব্যাকটিরিয়ার বৃদ্ধি নিয়া পরীক্ষা করার সময় লক্ষ্য করিলেন যে পরীক্ষা-পাত্রের এক স্থানে এক জাতীয় ছত্রক পড়ার ফলে উহার চারি পাশে ঐ ব্যাক্টিরিয়া আর বাড়িতে পারে নাই।

ইহা হইতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে ঐ ছত্রাক হইতে এমন পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে যাহা পাত্রের ব্যাকটিরিয়ার বংশবৃদ্ধি বন্ধ করিয়া দিতে পারে। সেই উৎপন্ন রাসায়নিক পদার্থ হইল **পেনিসিলিন** (Penicillin)। এই পদার্থ জীবাণু-বিরোধক বলিয়া ইহাকে **অ্যান্টিবায়োটিক** বলে। ইহার পর রোগজীবাণু-নাশক অব্যর্থ ঔষধ হিসাবে ইহার ব্যবহার আরম্ভ হয়। বর্তমান কালে নানা রোগজীবাণু হইতে উৎপন্ন রোগের চিকিৎসায় পেনিসিলিনের আর প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ইহার আবিষ্কার বিস্ময়কর। পরবর্তী কালে আরও জীবাণু-বিরোধক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে **স্ট্রেপটোমাইসিন** যক্ষ্মারোগে বিশেষ ফলপ্রদ। আর **ক্লোরো-মাইসেটিন** টাইফয়েডের অমোঘ ঔষধ।

(৪) **পরিবেশে জীবাণু-প্রতিরোধ**—মুক্ত বায়ু ও সূর্যকিরণ জীবাণু-বৃদ্ধির সহায়ক নহে। ফুটানো জলে, বিশেষ ভাবে স্টীমে অনেক জীবাণু নষ্ট হয়। ইহা ছাড়া বহু রাসায়নিক পদার্থ যেমন কার্বলিক অ্যাসিড দ্রবণ, ফিনাইল, পটাশ-পারমাঙ্গানেট, লাইজল, ব্লিচিং পাউডার, ফর্মালিন প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া পরিবেশে রোগজীবাণু যথেষ্ট পরিমাণে নষ্ট করা যায়।

২

রোগ-সংক্রমণ ও প্রতিকার

যে সব রোগ এক জনের হইলে বাড়ীতে অন্য লোকের মধ্যে, সময় সময় প্রতিবেশীদের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়ে তাহাদিগকে **সংক্রামক রোগ** বলে।

রোগের সংক্রমণ হয় জীবাণু দ্বারা। রোগজীবাণুগুলি রুগ্ন ব্যক্তি হইতে সুস্থ ব্যক্তিতে (১) **বায়ুর সাহায্যে**, (২) **জলের সাহায্যে**, (৩) **কীট-পতঙ্গের সাহায্যে** এবং (৪) **সাক্ষাৎ সংস্রব বা স্পর্শ দ্বারা** পরিবাহিত হয়। নিম্নে কয়েকটি সাধারণ রোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে বলা হইবে।

(১) **বায়ুবাহিত রোগ ঃ সাধারণ সর্দি**—ইহা শ্বাস-যন্ত্রের উপরের অংশের একটি ব্যাধি। ইহার ফলে শ্বাসনালীর ও নাসাপথের

কোমল ত্বকের প্রদাহ হয়। নাক, চোখ দিয়া জলপড়া, হাঁচি, কাশি, মাথাধরা ও সামান্য জ্বর এই রোগের লক্ষণ। বায়ুর সঙ্গে ভাইরাস শ্বাসপথ দিয়া প্রবেশ করিয়া এই রোগের সৃষ্টি করে। ইহা এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয়। সর্দির প্রকোপ সাধারণত তিন-চার দিনেই কমিয়া যায়।

সর্দি হইলে দেহ খানিক দুর্বল হয়। তখন অন্য যে কোন রোগের জীবাণু দেহে সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা বাড়িয়া যায়। ঘন ঘন সর্দি হইলে দেহের প্রতিরোধশক্তি কমিয়াছে বুঝিতে হইবে। এই রূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হইবে।

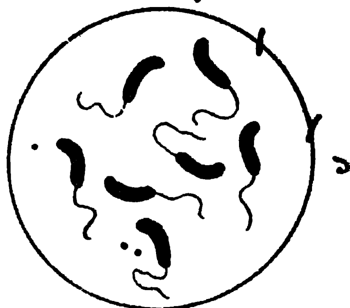
সর্দি হইলে ঠাণ্ডা বা গরম লাগানো ঠিক নয়। মুক্ত বায়ুতে যথেষ্ট বিশ্রাম করা উচিত। আর ঈষদুষ্ণ তরল পানীয় গ্রহণ করিলে নাসাপথ দিয়া জলের সঙ্গে রোগজীবাণু অনেক পরিমাণে বাহির হইয়া যায়। যাহাদের প্রায়ই সর্দি-কাশি হয় তাহাদের ঐ রোগের জীবাণু হইতে প্রস্তুত টিকার সাহায্যে প্রতিরোধশক্তি বাড়ানো যাইতে পারে। সংক্রামিত ব্যক্তি কার্যস্থলে গেলে সেখানে অন্য লোকের সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য সর্দি হইলে বাড়িতে বিশ্রাম করা উচিত।

ইনফ্লুয়েঞ্জা—ইহা শ্বাসযন্ত্র-সম্পর্কিত একটি সংক্রামক ব্যাধি। ভাইরাস ইহার সৃষ্টি করিয়া থাকে। দুই শ্রেণীর ভাইরাস হইতে সাধারণত দুই রকমের ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়া থাকে। এই রোগে সর্দি কাশি দেখা দেয়। রোগীর মাথায় ও হাত পায়ের গ্রন্থিতে বেদনা হয়। তারপর বেশ জ্বর দেখা দেয়। এই রোগে অনেক সময় নার্ভতন্ত্র আক্রান্ত হয়। ফলে রোগী খুব দুর্বল হইয়া পড়ে। সাধারণত জ্বর তিন চার দিন থাকে।

রোগীর হাঁচি, কাশি ও থুথুর ভিতর দিয়া রোগের বিস্তার হয়। এজন্য রোগীর পৃথক ভাবে থাকা উচিত। রোগীর হাত ও বাসনপত্র জীবাণুনাশক পদার্থ দিয়া ধোওয়া উচিত। লক্ষণ দেখিয়া এই রোগের ঔষধ দেওয়া হয়। এই ব্যাধির ভাইরাস হইতে টিকা প্রস্তুত করিয়া তাহার ব্যবহারে সুফল পাওয়া গিয়াছে। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতবর্ষে ইনফ্লুয়েঞ্জার মহামারিতে অনেক লক্ষ লোক মারা গিয়াছিল। ১৯৫৭ সালেও ইনফ্লুয়েঞ্জার ব্যাপক আক্রমণ দেখা দিয়াছিল।

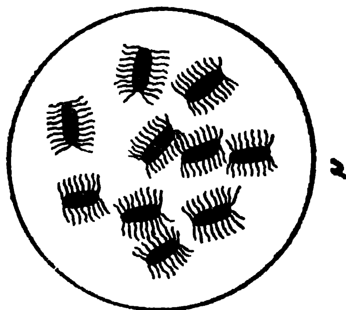
(২) জলবাহিত রোগ ঃ কলেরা—ইহা অতি মারাত্মক

সংক্রামক রোগ। মাইক্রোস্কোপে ইহার জীবাণু দেখিতে (,) চিহ্নের মত দেখায় বলিয়া ইহাকে কমা-ব্যাসিলস বলা হয়। এই জীবাণু জল ও খাদ্যের সঙ্গে উদরে প্রবেশ করিয়া সেখান হইতে অন্ত্র আক্রমণ করে। ফলে রোগের সৃষ্টি হয়। এই রোগে বমি, জ্বর এবং চাউলধোওয়া জলের মত প্রচুর দাস্ত হয়। প্রস্রাব বন্ধ হইয়া কয়েক ঘণ্টা পরে অবসাদ উপস্থিত হয়। কলেরা রোগীর মল ও বমির সহিত জীবাণু নির্গত হয়। উহারা জলের সঙ্গে মিশিয়া সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করিলে এই রোগের সংক্রমণ হইতে পারে। কলেরা রোগীর মলে মাছি বসিয়া যদি ঐ মাছি আবার খাদ্যের উপর বসে, তাহা হইলে ঐ দূষিত খাদ্যদ্বারাও রোগের বিস্তার হইতে পারে।



২২২নং চিত্র—কলেরার ব্যাসিলস
(৪০০০ গুণ)

কলেরা রোগীর মল ও বমি লাইজল, আইজল, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি দ্বারা জীবাণুমুক্ত করিয়া তবে নর্দমায় ফেলিতে হইবে। কলেরার প্রাদুর্ভাবের সময় জল ভাল রূপে ফুটাইয়া পান করা উচিত; আর খাবার জিনিস সর্বদা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। কলেরার প্রতিষেধক টিকা নিলে এই রোগের হাত হইতে পাঁচ-ছয় মাসের জন্য অব্যাহতি পাওয়া যায়।



২২৩নং চিত্র—টাইফয়েড ব্যাসিলস
(৪০০০ গুণ)

কলেরা রোগীর দেহ হইতে মল ও বমির সহিত জলীয় পদার্থ প্রচুর পরিমাণে বাহির হইয়া যায়। সেজন্য চিকিৎসকগণ রোগীর শরীরে ক্ষার ও লবণমিশ্রিত লবণ (Alkaline Saline Solution) প্রবেশ করাইয়া দিয়া রক্ত তরল অবস্থায় রাখিতে চেষ্টা করেন।

টাইফয়েড—ইহা প্রধানত অন্ত্রের ব্যাধি। ইহার জীবাণু জল বা দুধের সঙ্গে দেহে প্রবেশ করে। ইহার লক্ষণ একটানা জ্বর ও প্রথম অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য; কখনও পরে পেটের অসুখ দেখা দেয়। অনেক সময়

জীবাণুর আক্রমণে অন্ত্রে স্থানে স্থানে ক্ষত হইবার ফলে মলের সঙ্গে রক্ত বাহির হয়।

রোগীর মলমূত্র দ্বারা খাদ্য ও পানীয় যাহাতে দূষিত না হয় সেরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যথা সময়ে চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া ভাল রূপ শুশ্রূষা করিলে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই রোগীকে আরোগ্য করা যায়। ক্লোরোমাইসেটিন নামক অ্যান্টিবাওটিক ঔষধের সাহায্যে এই রোগ আয়ত্তে আনা যায়। টাইফয়েডের টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

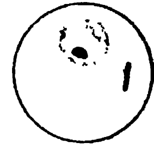
আমাশয়—ইহা একটি অন্ত্রের ব্যাধি। ইহা খাদ্য ও পানীয়ের সাহায্যে সংক্রামিত হয়। এই রোগে পুনঃ পুনঃ সামান্য মলের সঙ্গে শ্লেষ্মা, রক্ত প্রভৃতি বাহির হয়। ইহাতে প্রায়ই খুব পেট কামড়ায় এবং আনুষঙ্গিক জ্বর থাকে। আমাদের দেশে সাধারণত দুই প্রকারের আমাশয় দেখা যায়: (১) **অ্যামিবা দ্বারা উৎপন্ন আমাশয়,** (২) **ব্যাসিলস দ্বারা উৎপন্ন আমাশয়।** এই দ্বিতীয় শ্রেণীর আমাশয়ে রক্তপাত বেশি হয় এবং ইহা মারাত্মক। ইহাই আমাদের দেশে বেশি হয়। মাইক্রোস্কোপে ইহার জীবাণু টাইফয়েডের জীবাণু হইতে ভিন্ন বলিয়া ধরা যায় না।

অ্যামিবা দ্বারা উৎপন্ন আমাশয়ের বেলায় এমেটিন নামক ঔষধের ও ব্যাসিলস দ্বারা উৎপন্ন আমাশয়ের বেলায় সিরাম ইনজেকসন বহুকাল যাবত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সালফা-ড্রাগ দ্বারা চিকিৎসা করিয়া ব্যাসিলস হইতে উৎপন্ন আমাশয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়।

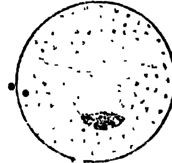
(৩) কীটপতঙ্গবাহিত রোগ: ম্যালেরিয়া—ইনফ্লুয়েঞ্জা ও কলেরা রোগের জীবাণু যেমন রুগ্ন ব্যক্তি হইতে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে বায়ু ও জলের সহিত প্রবেশ করিয়া থাকে ম্যালেরিয়ার জীবাণু সেই ভাবে প্রবেশ করিতে পারে না। অপর একটি প্রাণীর অর্থাৎ এনোফিলিস স্ত্রী-মশার সাহায্যে ইহা রুগ্ন ব্যক্তি হইতে সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে। এই পরজীবীরা (Parasite) মানুষের রক্তে বাস করে এবং সেখানে তাহাদের বংশ বিস্তার করে। ইহারা অ্যামিবার মত একটি আদ্যপ্রাণী।

সামান্য একটু রক্ত লইয়া মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে রক্তের লাল কণিকার মধ্যে এই পরজীবীর পরিবর্তন-চক্র দেখা যায়। ২২৪ নং চিত্রে (১) অবস্থায় দেখ এনোফিলিস স্ত্রী-মশা মানুষকে কামড়াইবার ফলে রক্তের লাল কণিকার ভিতর পরজীবীটি আংটির আকারে রহিয়াছে। (২) অবস্থায়

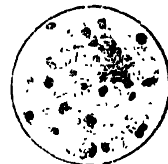
রক্তের লাল কণিকার উপাদান খাইয়া উহা আয়তনে বড় হইয়াছে এবং লাল কণিকাটিও সেই সঙ্গে আকারে বড় হইয়া গিয়াছে। (৩) অবস্থায় পরজীবীটি নিউক্লিয়াসসহ প্রায় ২০টি ক্ষুদ্র পরজীবীতে বিভক্ত হইয়াছে। এবার তাহাদের প্রত্যেকটি রক্তের এক একটি নূতন কণিকার ভিতর প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বের মত রক্তের উপাদান খাইয়া বংশ বৃদ্ধি করে। মশকীর কামড়ের পর যখন পরজীবীগুলি সংখ্যায় খুব বাড়িয়া রক্তের লাল কণিকা নষ্ট করিয়া বাহিরে আসে, তখন কম্প দিয়া জ্বর হয়। পরজীবীরা নানা জাতীয়। বিভিন্ন জাতীয় পরজীবীদের এই পরিবর্তন-চক্র সম্পন্ন হইতে ২৪ হইতে ৭২ ঘণ্টা সময় লাগে। কোন কোন পরজীবীর আক্রমণে ২৪ ঘণ্টা পর পর অর্থাৎ প্রত্যহ, কাহারও আক্রমণে ৪৮ ঘণ্টা অন্তর অর্থাৎ একদিন পর পর, আবার কাহারও আক্রমণে ৭২ ঘণ্টা অন্তর অর্থাৎ দুইদিন পর পর জ্বর আসে। ছবিতে যে পরজীবীটি দেখিতেছ তাহার পরিবর্তন চক্র ৪৮ ঘণ্টায় সম্পন্ন হয়। ছবিতে (৪) অবস্থায় যে পরজীবীটি রহিয়াছে তাহা আর মানুষের রক্তে বিভক্ত না হইয়া মশা মানুষকে কামড়াইবার সময় মশার দেহে প্রবেশ করে। এই জাতীয় পরজীবীর মধ্যে আবার পুরুষ ও স্ত্রী রহিয়াছে। মশার দেহে ইহাদের মিলনে নূতন পরজীবীর উৎপত্তি হয়। সেখানে তাহারা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইয়া সুতার ন্যায় অসংখ্য পরজীবীতে পরিণত হয়। মশকী সুস্থ মানুষকে কামড়াইবার ফলে উহারা তাহার দেহে প্রবেশ করে এবং পূর্বের ন্যায় লাল কণিকাগুলিকে আবার আক্রমণ করে।

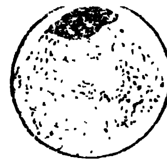


১



২





৪

২২৪নং চিত্র—রক্তের লোহিত কণিকার ম্যালেরিয়া-পরজীবীর পরিবর্তন-চক্র
(১) আংটির আকার (২৫৭০ গুণ বড়)
(২) আয়তন-বৃদ্ধি
(৩) বিভাজন
(৪) মশকীর দেহে প্রবেশের পূর্বের অবস্থা

ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হইলে মশার বিনাশ সাধন করিতে হয়। তোমরা জান স্ত্রী-মশা বদ্ধ জলে ডিম পাড়ে। তাহার শূককীট

ও মূককীট অবস্থা জলেই অতিবাহিত হয়। কেরোসিন বা অন্য খনিজ তৈলে কীটনাশক ডি. ডি. টি. চূর্ণ দ্রবিত করিয়া তাহা মশার জন্মস্থান গুলিতে ছিটাইয়া দিলে মশার বংশ অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়।

কুইনাইন ম্যালেরিয়ার একটি ফলপ্রদ ঔষধ। ইহা ছাড়া প্যালুড্রিন, ম্যাপাক্রিন নামক ঔষধও ম্যালেরিয়া রোগীকে আরোগ্য করার জন্য ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে ম্যালেরিয়া আমাদের দেশে বিলুপ্তির পথে। উপরে বর্ণিত ব্যবস্থা অবলম্বন করায়ই দেশ হইতে ম্যালেরিয়া-দূরীকরণে এতটা সাফল্য লাভ হইয়াছে।

প্লেগ—ইহা একটি অতি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। ইহার জীবাণু ব্যাকটিরিয়া জাতীয়। কোন স্থানে মানুষের মধ্যে প্লেগ দেখা দিবার পূর্বে ঐ স্থানের ইঁদুর গুলি এই রোগে আক্রান্ত হয়। ইঁদুরের গায়ে একপ্রকার এঁটেলু থাকে। ঐ এঁটেলু রোগগ্রস্ত ইঁদুরের রক্তপান করিয়া পরে যদি কোন মানুষকে কামড়ায় তবে ঐ মানুষের মধ্যে রোগ সংক্রামিত হয়। প্লেগের আক্রমণে মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা ও কোমরে বেদনা হয়। বগল ও কুঁচকির গ্রন্থি ফুলিয়া উঠে। প্লেগের টিকা নিলে ইহার আক্রমণ হইতে কতক পরিমাণে রক্ষা পাওয়া যায়। ইঁদুর ধ্বংস করাই এই রোগের বিস্তার বন্ধ করার প্রধান উপায়।

(৪) ছোঁয়াচে রোগ : দাদ—ছত্রকজাতীয় একপ্রকার কীট দ্বারা এই রোগ সংক্রামিত হয়। গায়ের উপরের ত্বকে এবং তাহার নীচের স্তরে ইহারা বাসা বাঁধে। এই চর্মরোগ হইতে রক্ষা পাওয়ার প্রধান উপায় হইল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা। যাহাদের দাদ হইয়াছে তাহাদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে না আসিলে এবং তাহাদের গামছা, জামা-কাপড় ইত্যাদি ব্যবহার না করিলে এই চর্মরোগের বিস্তার বন্ধ হয়। নানা রকমের মলম দাদে আক্রান্ত স্থানে প্রয়োগ করিয়া ফল পাওয়া যায়। অ্যান্টিবাওটিক ঔষধও ইহাতে বেশ কাজ করে।

খোস—ইহা অতিশয় সংক্রামক। অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় বহু লোক একসঙ্গে বাস করিলে এই রোগ সহজেই বিস্তৃত হয়। এই রোগের খুব ছোট পোকা আছে। এই কীট চর্মের নীচে ছোট সুড়ঙ্গের মত গর্ত করিয়া ঐ সুড়ঙ্গের প্রান্তে ডিম পাড়ে। ডিম হইতে নূতন খোসকীটের জন্ম হয় এবং তাহারা চর্মকে আক্রমণ করে। তখন চর্মের উপর ফোস্কা

দেখা দেয় এবং ইহা চুলকায়। সে অবস্থায় নখ দিয়া আঁচড়াইবার ফলে ছোট ছোট ঘায়ের সৃষ্টি হয়। ইহা সাধারণত হাত ও পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে, কব্জিতে, কোমর, উরু প্রভৃতি স্থানে বেশি হইয়া থাকে।

এই রোগ সারাইবার জন্য গরম জল ও কার্বলিক সাবান দিয়া ফোস্কা, ঘা প্রভৃতি প্রতিদিন পরিষ্কার করিতে হয়। তাহার পর ঐসব স্থানে গন্ধক-ঘটিত মলম ক্রমাগত অন্তত তিন দিন লাগাইতে হইবে।

প্রশ্ন

১। সংক্রামক রোগ কাহাকে বলে? তুমি যে যে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগী দেখিয়াছ তাহাদের অন্তত তিন জনের সংক্রমণ কি ভাবে হইয়াছিল বল।

২। বিভিন্ন শ্রেণীর রোগজীবাণু কি কি? ইহারা উদ্ভিদ না প্রাণী?

৩। দেহের রোগ-প্রতিরোধ শক্তি বলিলে কি বুঝায়? কি কি উপায়ে প্রতিরোধ-শক্তি বৃদ্ধি করা যায়?

৪। কি কি অবস্থার উপর এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে রোগের সংক্রমণ নির্ভর করে?

৫। বিভিন্ন রোগজীবাণু কি কি উপায়ে দেহে প্রবেশ করে?

৬। বায়ুবাহিত সংক্রামক রোগ নিবারণের সাধারণ উপায়গুলি দৃষ্টান্ত দ্বারা উল্লেখ কর।

৭। জলবাহিত রোগ কি কি এবং তাহা নিবারণের উপায় কি?

৮। কীট দ্বারা যে সব রোগের সৃষ্টি হয় তাহার প্রতিরোধ ও চিকিৎসা কি ভাবে হইতে পারে?

৯। রুগ্ন ব্যক্তির সহিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংস্রবে যে যে রোগ সংক্রামিত হয় সেইগুলি হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় কি?

১০। এই রোগগুলির সংক্রমণ, লক্ষণ, চিকিৎসা ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ:

(১) কলেরা, (২) টাইফয়েড, (৩) আমাশয় ও (৪) ম্যালেরিয়া

বিষয়গত প্রশ্ন

(নির্দেশ পূর্বের মত)

১। ঠিক উক্তি নির্বাচন

(ক) কীটবাহিত ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু প্রাণী।

(খ) কীটবাহিত প্লেগ রোগের জীবাণু প্রাণী।

(গ) প্রতিষেধক টিকা নিয়া ম্যালেরিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

(ঘ) টিকা দিলে রক্তের শ্বেত কণিকার প্রতিরোধ-শক্তি বাড়িয়া যায়।

(ঙ) অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ রাসায়নিক দ্রব্য।

২। শূন্যস্থান পূরণ

বর্তমানে——(১) রোগের আক্রমণ খুবই ——(১)
——(২) গিয়াছে। ইহার মূলে রহিয়াছে ——(২)
——(৩)র সাহায্যে ——(৩)
রোগজীবাণু বহনকারী——(৪) বিনাশ ——(৪)
এবং——(৫) নাশক ঔষধের ব্যাপক প্রয়োগ ——(৫)

৩। কয়েকটি উত্তরের মধ্যে ঠিক উত্তর নির্বাচন

বর্তমানে সংক্রামক রোগের প্রাবল্য বেশ কমিয়া গিয়াছে। কারণ

(১) লোকের স্বাভাবিক রোগপ্রতিরোধ-শক্তির বৃদ্ধি।

(২) টিকা ও সিরামের ব্যাপক প্রয়োগ।

(৩) বিশুদ্ধ জল, অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ ও ডি. ডি. টি.র বহুল পরিমাণে ব্যবহার।

(৪) লোকের উন্নত ধরনের জীবনযাপন।